বা
বা মু ক
ক

ইছলামে দারিদ্রতা

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

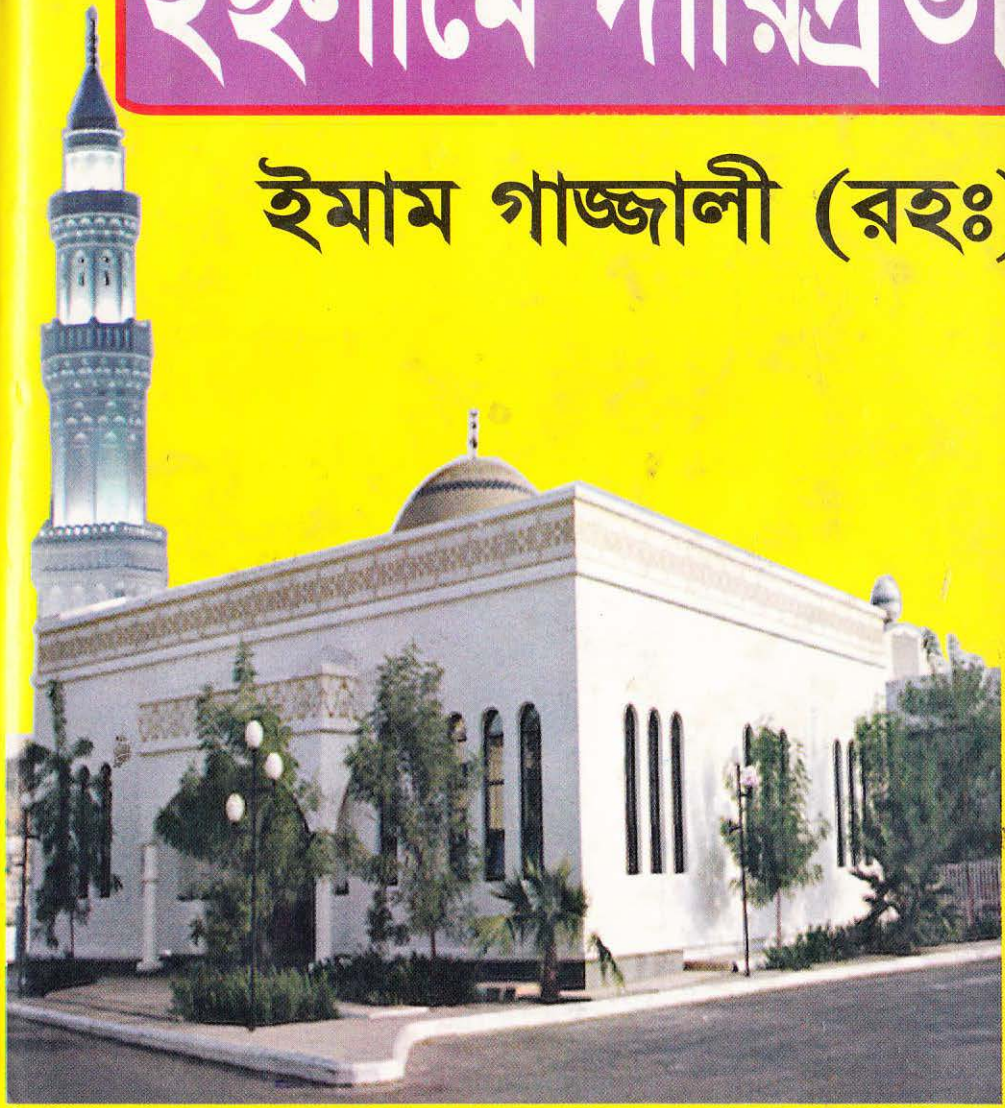

মুজাহিদ প্রকাশনী

ইছলামে দারিদ্রতা

মূল

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

ভাষান্তরে
প্রফেসর মোঃ আশরাফ উজ্জামান
অধ্যক্ষ
নলী পাতাকাটা সিকদার রুস্তম আজাদ
ইসলামী কমপ্লেক্স, বরগুনা।
এবং
সহকারী অধ্যাপক
মঠবাড়িয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
ও
মিঠাখালী সিনিয়র মাদ্রাসা
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

মুজাহিদ প্রকাশনী

https://kitabbhubon.com

প্রকাশক ঃ
মুজাহিদ প্রকাশনী
বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি

সর্বস্বত্ব ঃ বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং

হাদিয়া : ১২০.০০ (একশত বিশ টাকা) মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

মুজাহিদ প্রকাশনী
বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি
আল-মদিনা প্লাজা
৫/১/৩ সিমসন রোড, সদরঘাট
ঢাকা-১১০০। ফোনঃ ৭১১ ৪০ ৪০

বর্ণবিন্যাস ঃ
মুজাহিদ কম্পিউটার

https://kitabbhubon.com

আমাদের প্রাণপ্রিয় শায়েখ ও মুর্শিদ পীরে মোকাম্মাল হযরতুল আল্লাম আমীরুল মুজাহিদীন আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ছৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম, পীর ছাহেব, চরমোনাই-এর

দোয়া ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত তা'রীফ ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, অসংখ্য দরূদ ও ছালাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও তাঁর আহলে বাইতদের উপর বর্ষিত হউক।

আমার স্নেহ-ভাজন দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম প্রফেসর মোঃ আশরাফ উজ্জামান ছাহেব **'ইছলামে দারিদ্রতা'** নামক কিতাব খানা অনুবাদ করেছেন। অত্র কিতাব খানা দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এই কিতাব খানা পাঠ করলে দারিদ্রতার ফযিলত, দরিদ্র ব্যক্তির পদ মর্যাদা, পরকালে দরিদ্র ব্যক্তিদের অবস্থান এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্মান করায় কি লাভ এবং দুনিয়ায় অর্থের লোভ না করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অত্র কিতাব খানা পাঠ করলে নাফছানিয়াতকে দমন করে নেক জিন্দেগী গঠনের আশা করা যায়।

আমি দোয়া করি আল্লাহ পাক কিতাব খানা কবুল করুণ এবং পাঠক, লিখক ও সহযোগীদেরকে উত্তম জাযা, ইছলাহে বাতেন হাছিল করার তাওফিক দান করুণ এবং আল্লাহ পাকের নেক বান্দা হিসাবে কবুল করুণ।

আল্লাহুম্মা আমীন।

(ছৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম)
পীর ছাহেব, চরমোনাই, বরিশাল।

https://kitabbhubon.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। ছালাত ও ছালাম তাঁর হাবিব মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও তাঁর ছাহাবা বর্গের উপর। ইছলামের আকিদাহ বিশ্বাসের পর নৈতিকতা, সমাজসেবা ও পরোপকার এবং অসহায়, গীরব ও দুঃস্থ মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা রছূলের আদর্শ। ধনী গরীব আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে নিঃস্ব ও সম্পদহীন করে রাখেন। ইছালামে ধন-সম্পদ উপার্জনে নিষেধ নেই। আল্লাহর বিধানকে মেনে যত ইচ্ছা তত সম্পদ উপার্জন করতে পারে। তবে সম্পদের মধ্যে যার যে অধিকার আছে সে অধিকার রক্ষা করতে হবে। দুনিয়াতে যার যত ধন সম্পদ বেশী কিয়ামতের দিন তার হিসাব-নিকাশও ততো বেশী। সম্পদ যার কম হিসেব-নিকাশও তার কম। দুনিয়াটা মুছাফিরখানা অর্থাৎ ক্ষনস্থায়ী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ না হওয়াই ভাল। দুনিয়া হতে যিনি খালি হাতে পরলোকগমন করবে তার কবর জীবন ও কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ সহজ হবে। জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে না। ধনবান লোকেরা হিসাব-নিকাশের জটিলতায় পড়ে যাবে। দরিদ্র লোকেরা সম্পদশালী লোকদের ৫০০ (পাঁচশত) বছর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই ইছলাম দারিদ্রতাকেই পছন্দ করে। মহানবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম স্বেচ্ছায় দারিদ্রতা অবলম্বন করেছেন। তাই আমরা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর এহ্ইয়া-উল-উলুমুদ্দীন ও কিমিয়ায়ে ছায়াদাৎ গ্রন্থ হতে হুবহু উপাদান সংগ্রহ করে ***'ইছলামে দারিদ্রতা'*** নামক কিতাবখানা প্রণয়ন করেছি। উক্ত কিতাব দ্বারা বাঙ্গালী পাঠক সমাজ সামান্য উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে। অত্র কিতাবখানা প্রনয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেল মোঃ রফিক উদ্দিন আহমাদ, অফিস ম্যানেজার মোঃ শাহজাহান ফকির ও হিসাব রক্ষক-কাম-অফিস সহকারী তাজউদ্দীন আহমাদ সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাদেরকে উত্তম যাযা দান করুন। অত্র কিতাবের মধ্যে মুদ্রনজনিত কোন ত্রুটি হলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্কারে সংশোধন করে দিব। ইনশাআল্লাহ। আমীন

মোঃ আশরাফ উজ্জামান
বরগুনা

https://kitabbhubon.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। দুনিয়ার পরিচয়	৭
২। দুনিয়ার স্বরূপ ও তার ছলনা	১১
৩। দুনিয়ার চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপাদান	১৭
৪। পার্থিব ভোগ্য বস্তুর প্রকারভেদ	১৮
৫। দারিদ্রতা ও সংসার বৈরাগ্যের পরিচয়	১৯
৬। দারিদ্রতার শ্রেণী বিভাগ	২২
৭। তুষ্ট দরিদ্র্যের ফযীলত	২৮
৮। তুষ্ট দরিদ্র ও শোকরকারী ধনী লোকের মধ্যে পার্থক্য	৩০
৯। প্রকৃত তুষ্ট দরিদ্র ত্রিবিধ সৌভাগের অধিকারী	৩৩
১০। অভাবের সময় দরিদ্র লোকের প্রতিপাল্য কর্তব্যসমূহ	৩৭
১১। দান গ্রহণের নিয়ম	৩৯
১২। বিনা প্রয়োজনে কারও নিকট চেয়ে লওয়া হারাম	৪৩
১৩। কি পরিমাণ দ্রব্যের মালিক থাকলে ভিক্ষা চাওয়া নিষিদ্ধ	৪৬
১৪। অবস্থা ভেদে দরিদ্রের শ্রেণীবিভাগ	৪৭
১৫। উচ্চ পর্যায়ের দরিদ্র লোকের দৃষ্টান্ত এবং তাদের কারামত	৪৮
১৬। সংসার বৈরাগ্যের পরিচয় এবং তার ফযীলত	৫০
১৭। প্রকৃত 'যুহদ' অর্থাৎ বৈরাগ্যের পরিচয়	৫৩
১৮। 'যুহদ' অর্থাৎ সংসার বৈরাগ্যের ফযীলত	৫৭
১৯। মধ্যম ও উন্নত শ্রেণীর বৈরাগ্যের তারতম্য	৬৪
২০। আকাঙ্খিত দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ	৬৬
২১। পরিত্যাজ্য বস্তুর প্রকারভেদে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ	৬৭
২২। সংসার বিরাগীদের পক্ষে সংসারের যে সমস্ত দ্রব্যে পরিতৃপ্ত থাকা উচিত তৎসমূদয়ের বিস্তৃত বিবরণ	৬৯
২৩। বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় আলোচনার উপসংহার	৮৪
২৪। তাওয়াক্কুল	৮৬
২৫। তাওয়াক্কুলের ফযীলত	৮৭
২৬। তাওয়াক্কুলের ভিত্তি, তাওহীদ বিশ্বাসের পরিচয়	৯০
২৭। তাওহীদের চারটি স্তর	৯০
২৮। তৃতীয় স্তরের তাওহীদ জ্ঞানই তাওয়াক্কুলের বুনিয়াদ	৯৭
২৯। কোন সৃষ্ট পদার্থই স্বাধীন ক্ষমতায় কোন কাজ করতে পারে না	৯৮
৩০। স্বাধীন ক্ষমতায় মানুষ কোন কাজই করতে পারে না	৯৯
৩১। মানবের কার্যাবলী তিন প্রকার	৯৯

https://kitabbhubon.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩২। স্বাধীন ক্ষমতা বিহীন মানুষ পাপ পুণ্যের শাস্তি বা পুরস্কার কেন পাবে ?	১০৫
৩৩। সংসারে পয়গম্বর প্রেরণ এবং শরীঅত প্রচারের উদ্দেশ্য	১০৮
৩৪। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য অদৃষ্ট লিপিতে আদিকালে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলে পরিশ্রমের ফল কি ?	১০৯
৩৫। তাওয়াক্কুলের ভিত্তি দ্বিতীয় প্রকারের বিশ্বাস	১১২
৩৬। মুতাওয়াক্কিলের শ্রেণী বিভাগ	১১৭
৩৭। তিন শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলের তুলনা	১১৯
৩৮। উন্নত পর্যায়ের মুতাওক্কিলের বিবরণ	১২০
৩৯। তাওয়াক্কুল কার্যকরী করার প্রণালী	১২১
৪০। উপার্জনে তাওয়াক্কুল কার্যকরী করার প্রণালী	১২২
৪১। উপার্জন কার্যে তাওয়াক্কুলকারীর শ্রেণী বিভাগ	১২৮
৪২। শিল্প বাণিজ্য থেকে বিরত থাকা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়	১৩০
৪৩। রিযিক দেওয়া বা না দেওয়া আল্লাহর মঙ্গল বিধান, এরূপ মনোভাব জন্মাবার উপায়	১৩৩
৪৪। কল্পনাতীত স্থান থেকেও আল্লাহ রিযিক দান করে থাকেন	১৩৫
৪৫। পোষ্যবর্গ বিশিষ্ট লোকের তাওয়াক্কুলের বিবরণ	১৩৭
৪৬। মানুষকে জীবিকা প্রদানের কৌশল	১৩৮
৪৭। সাধক দরবেশগণের প্রতিপালনের ভার অপরে নিবে কেন ?	১৪১
৪৮। বিশ্বরাজ্য প্রতিপালন ও ব্যাপক জীবিকা বণ্টন ব্যাপারে বন্দোবস্ত কৌশল উপলব্ধি করলেই তাওয়াক্কুল আপনা আপনি এসে যায়	১৪২
৪৯। পরিবারবিহীন একাকী লোকের সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল	১৪৫
৫০। পরিবার বিশিষ্ট লোকের সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল	১৪৬
৫১। গৃহ-সামগ্রী অপহরণের ব্যাপারে গৃহস্বামীর কর্তব্য ও তাওয়াক্কুল	১৫০
৫২। গৃহ-সামগ্রী অপহৃত তাওয়াক্কুলকারীর প্রতিপাল্য ছয়টি নিয়ম	১৫২
৫৩। রোগের চিকিৎসা, উপস্থিত বিপদ বিদূরণ প্রচেষ্টা ও তাওয়াক্কুল	১৫৮
৫৪। ওষুধ ব্যবহারের পোষকতায় হাদীছের বাণী	১৫৯
৫৫। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওষুধ ব্যবহার	১৬০
৫৬। রোগে ওষুধ সেবন সম্বন্ধে পূর্ব যুগের আম্বিয়ায়ে কেরাম বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী	১৬১
৫৭। রোগে 'দাগ' লওয়া অনুচিত কেন ?	১৬২
৫৮। রোগের অবস্থা বিশেষে ওষুধ ব্যবহার না করা উত্তম, সুন্নৎ বিরোধী নয়	১৬৩
৫৯। ওষুধের প্রতি ঔদাসীন্যের ৬টি কারণ	১৬৪
৬০। মহামারীর স্থান থেকে পলায়ন বা তথায় গমন করা অনুচিত	১৬৯
৬১। দুই কারণে মহামারী স্থান থেকে সুস্থ লোকের পলায়ন নিষিদ্ধ	১৭০
৬২। রোগাক্রমণের কথা প্রকাশ করা কখন সঙ্গত	১৭১
৬৩। রোগের কথা প্রকাশ করা কখন নিষিদ্ধ	১৭২

https://kitabbhubon.com

ইছলামে দারিদ্রতা

দুনিয়ার পরিচয়

দুনিয়া কি ? প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, ধর্মপথের মাঝে মাঝে অবস্থিত কতিপয় পান্থশালার মধ্যে দুনিয়াও একটি পান্থশালা বা মুছাফিরখানা বিশেষ। কিংবা আল্লাহতা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছবার অভিলাষী পথিকদের একটা পথ। কিংবা তত্ত্বজ্ঞানরূপ মরু সাহারা অতিক্রমে আকাঙ্ক্ষী যাত্রীদের পথের সম্বল খরিদ করবার জন্য তারই পার্শ্বস্থ সুসজ্জিত একটা বাজার। মানুষের মৃত্যুর পূর্ববর্তী নিকটস্থ অবস্থাটিকে দুনিয়া এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাকে আখেরাত বা পরলোক বলে। পরলোকের পাথেয় সংগ্রহের জন্যই দুনিয়ার প্রয়োজন। কেননা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতা'আলা মানুষকে আদি সৃষ্টিকালে নিতান্ত অপূর্ণ অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু পূর্ণতা লাভ করতে পারে, এমন যোগ্যতা এদের আছে। বিশ্বপ্রভু আল্লাহতা'আলার রাজত্বের ছবি নিজেদের হৃদয়পটে এরা এমনভাবে অঙ্কিত করার যোগ্যতা রাখে যে, পরিণামে তারা সে মহান আল্লাহতা'আলার দরবারে পৌঁছবার উপযোগী হতে পারে এবং তাঁর দরবারে প্রবেশের পথ পেতে পারে। সেথায় পৌঁছে তারা তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য দর্শনোপযোগী প্রিয় মহাপুরুষদের স্থান লাভ করতে পারে। এ অবস্থা প্রাপ্তিই তাদের সৌভাগ্যের চরম সীমা এবং এই তাদের জন্য বেহেশত। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতা'আলা মানুষকে এ অবস্থা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যে পর্যন্ত মানুষের চোখ না খুলবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্তা'আলার অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধান পাবে, সে পর্যন্ত তারা আল্লাহতা'আলার সৌন্দর্য সন্দর্শনে বঞ্চিত থাকবে। দর্শনেই পরিচয় লাভ হয়। আল্লাহতা'আলার বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করতে পারলেই তাঁর অপার মহিমা এবং অনন্ত সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের ইন্দ্রিয় জ্ঞানই সে সমস্ত বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ চিনবার প্রধান উপায়। আবার পানি ও মৃত্তিকার সংমিশ্রণে গঠিত এ দেহ পিঞ্জর ব্যতীত ইন্দ্রিয়গুলোর অবস্থিতি অসম্ভব। এ কারণেই মানুষ পানি ও মৃত্তিকাময় এ জড়জগতে এসে পড়েছে। উদ্দেশ্য এখান থেকে তারা পরলোকের পাথেয়

https://kitabbhubon.com

সংগ্রহ করবে। আর আত্ম-পরিচয় ও বর্হিজগতের জ্ঞান-এ উভয়বিধ জ্ঞানের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান বা আল্লাহতা'আলার পরিচয় লাভ করতে পারবে। আত্মপরিচয় এবং আল্লাহতা'আলার পরিচয় মানুষ সাধারণতঃ দু'উপায়ে লাভ করতে পারে। এ ইন্দ্রিয়গুলো যতদিন মানুষের সাথে বিদ্যমান থেকে সংবাদ সংগ্রহের কার্য করতে থাকে, এরূপ বলা যায় যে, ততদিন মানুষ দুনিয়াতে আছে। অতঃপর মানবাত্মা ইন্দ্রিয়গুলোকে বিদায় দিয়ে নিজের স্বাভাবিক গুণ প্রাপ্ত হয়। তখন বলা যায় যে, মানুষের পরলোক প্রাপ্তি হল। উপরোক্ত এ কথাগুলোই ইহলোক ও পরলোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য।

১. ইহলোকে মানুষের কি কি আবশ্যক ঃ ইহলোকে মানুষ দ্বিবিধ বিষয়ের মুখাপেক্ষী। প্রথমতঃ আত্মার ধ্বংসাত্মক কারণসমূহ থেকে রক্ষিত থাকা এবং আত্মার পূর্ণতা ও পরিপুষ্টি সাধনের উপায় নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়ত, শরীরকে ধ্বংসাত্মক কারণসমূহ থেকে রক্ষা করা এবং শরীরের খাদ্য সংগ্রহ করা।

প্রথমত, আল্লাহতা'আলার পরিচয় লাভ এবং তাঁর মহব্বতই আত্মার খাদ্য। কেননা যে বস্তু প্রকৃতিগত আকাঙ্খা অনুযায়ী হয় তাকেই আহার বলা হয়। আল্লাহতা'আলা ব্যতীত অন্য বিষয়ের প্রণয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকা আত্মার পক্ষে ধ্বংসের কারণ হয়। শরীর ধ্বংসশীল কিন্তু আত্মার ধ্বংস নেই। শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ কেবল আত্মার জন্যই আবশ্যকীয় হয়ে থাকে।

আত্মার জন্যই শরীরের প্রয়োজন। এ কথাটি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাচ্ছি। শরীরকে আত্মার একটি বাহন বলা যায়। কা'বা শরীফে যেতে হলে যেমন উটরূপ বাহনের আবশ্যক হয় তদ্রূপ আত্মার গন্তব্যস্থান পরলোকে যাবার নিমিত্ত ও দেহ হল আত্মার জন্য একটি বাহন। হাজীর জন্যই উটের আবশ্যক হয়ে থাকে। উটের জন্য হাজী নয়। কা'বা শরীফে পৌঁছতে না পারা পর্যন্ত পথ অতিক্রমের সুবিধার জন্য উটের প্রতিপালন ও পরিপোষন করা হাজীর কর্তব্য হয়ে পড়ে। উটের এ পরিচর্যা প্রয়োজন পরিমাণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পরিমানের বেশি উটের প্রতিপালন হওয়া উচিত নয়। যদি হাজী দিবারাত কেবল উঠের আহার যোগাতে এবং সাজ-সজ্জায়ই রত থাকে, তবে সাথের কাফেলা তাকে ফেলে চলে যাবে। তখন সে সাথীহীন অবস্থায় বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

https://kitabbhubon.com

অনুরূপভাবে মানুষ যদি ইহলোকে দিনরাত কেবল শরীরের আহার সংগ্রহ, বাসস্থান নির্মাণে, বেশ-ভূষার আয়োজন ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত থাকে, তবে সে স্বীয় পারলৌকিক সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

দ্বিতীয়, দুনিয়াতে মানুষ নিজের দেহ রক্ষার্থে ত্রিবিধ দ্রব্যের মুখাপেক্ষী থাকে। (ক) আহার্য দ্রব্য, (খ) পরিধেয় বস্ত্র, (গ) শীত, গ্রীষ্ম ও অন্যান্য বিপদ থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে বাসস্থান। পৃথিবীতে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এ ত্রিবিধ বস্তু ভিন্ন মানুষের আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এ তিনটি দ্রব্যই দুনিয়ার মূল।

তত্ত্ব-দর্শন বা আল্লাহতা'আলা সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভকে আত্মার আহার বলা হয়েছে। তা যত অধিক পরিমাণে লাভ করা যায় আত্মার পক্ষে ততই মঙ্গল। পক্ষান্তরে শরীরের আহার–খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিক আহার করলে পীড়াগ্রস্ত হয়ে বিনাশপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা মানবের মধ্যে আকাঙ্খা বা কামনারূপ রিপু প্রদান করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার, পরিচ্ছদ এবং বাসস্থান পাবার জন্য এ কামনা রিপু মানুষকে উৎসাহিত করবে। ফলে দেহরূপ বাহন বিনষ্ট হতে পারবে কিন্তু মন এরূপ প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে যে, সর্বদা সে নিজের সীমা অতিক্রম করতে চায়। তাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই বুদ্ধির সৃষ্টি হয়েছে। কামনা বা আকাঙ্খার সীমা নির্ধারণ করে দিবার জন্যই আল্লাহতা'আলা ইহজগতে পয়গম্বরগণের মধ্যস্থতায় ধর্ম বিধানসমূহ প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষের মধ্যে কামনা রিপু ও সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর প্রয়োজনীয় সময়ে তার সাথে বুদ্ধি যোগ করে দিয়েছেন। কামনা প্রবৃত্তি মানবদেহের মধ্যে বুদ্ধির পূর্বে সন্নিহিত হয় বলে পূর্বাহ্নে বলবান হয়ে পড়ে। ফলে সে বুদ্ধি ও ধর্মবিধানের অবাধ্য হয়ে মানুষকে আজীবন খাদ্য সামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বাসগৃহের অনুসন্ধানে সর্বান্তকরণে নিযুক্ত রাখে। কাজেই মানুষ নিজকে ভুলে যায়। আহার, পোষাক ও বাসস্থানের প্রয়োজন কেন ? তার ইহলোকে আসার কারণ কি ? আত্মার খোরাক পরলোকের সম্বল সবকিছুই তখন মানুষ ভুলে যায়। এ বিবরণ থেকে ইহলোকের অর্থ এবং আবশ্যকতা কিয়ৎপরিমাণ বুঝা গেল। এখন ইহলোকের শাখা-প্রশাখা এবং তাতে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রণালী অবগত হওয়া আবশ্যক।

২. পার্থিব পদার্থের শ্রেণীভেদ ঃ দুনিয়া বা ইহলোকের মর্ম মনোযোগের সাথে বুঝবার চেষ্টা করলে জানতে পারবে যে, তিন শ্রেণীর

https://kitabbhubon.com

পদার্থ ইহলোকের অন্তর্গত। প্রথমত, উপাদান পদার্থ। তা ভূমির সাথে জড়িত। যেমন– উদ্ভিদ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, খনিজ পদার্থ। যেমন, তাম্র, পিতল, লৌহ প্রভৃতি। তৃতীয়ত, জীব জন্তু। উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থে– শস্য, বাসগৃহ ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থ থেকে বাসন-কোষণ ও অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হয়। বাহন ও খাদ্যের জন্য জীবজন্তুর প্রয়োজন। মানব শুধু ইহলোকিক উপার্জনে ব্যস্ত।

মানুষ নিজের দেহ এবং অন্তরকে সতত উপরোক্ত তিন শ্রেণীর দ্রব্য সংগ্রহেই নিযুক্ত রাখে। মনকে এ সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহের কামনায় এবং হস্ত পদকে সেগুলোর নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত রাখে। এসমস্ত ইহলৌকিক পদার্থের সংগ্রহে মনকে মশগুল রাখলে মনে লোভ, কার্পণ্য, শত্রুতা প্রভৃতি নিকৃষ্টভাবের উদয় হয় এবং পরবর্তীকালে তাই আত্মার বিনাশ প্রাপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পার্থিব কার্যে লিপ্ত রাখলে সঙ্গে সঙ্গে মনও সে সে কার্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষ নিজকে ভুলে কেবল জাগতিক কার্যের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ে।

ইহলৌকিক কার্যে ক্রমোন্নতি ঃ আহার, পোশাক বাসস্থান যেমন-সংসারের মূল, তদ্রূপ কৃষিকার্য,বয়ন, সূত্রধরের কাজ পার্থিব সকল ব্যবসায়ের মূল। অপরাপর সমস্ত ব্যবসা এ তিন ব্যবসায়ের শাখা-প্রশাখা। কতগুলো শাখা ব্যবসা মূল ব্যবসাগুলোর উপাদান জুগিয়ে দেয়। যেমন– ধুনকর ও সূত্রধরগণ তাঁতীর প্রয়োজনীয় সূতা সংগ্রহ করে দেয়। দরজী আবার তাঁতীর পরবর্তী কর্ম সমাধা করে থাকে। এসমস্ত ব্যবসায়ীর জন্য লোহা, কাঠ ও চামড়ার তৈরি অস্ত্র ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন হওয়ায় কর্মকার, করাতি এবং চর্মকারের ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়েছে। কেননা কোন ব্যবসায়ীই নিজ নিজ ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য একাকী সম্পন্ন করতে পারে না। এ কারণেই ইহলোকের প্রত্যেকটি মানুষ একে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পরস্পর জড়িত হয়ে পড়েছে। দরজী কর্মকারও তাঁতীর সাহায্য করে, আবার কর্মকার এ দু'জনকে সাহায্য করে। এরূপে একে অন্যের সাহায্য করে থাকে। এতে সমাজ বন্ধনের উদ্ভব হয়েছে। এরই কারণে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা জন্মেছে। একে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে অনিচ্ছুক। আবার একজন অন্যজনের কিছু আত্মসাতের চেষ্টায় রত। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিন প্রকার কার্যের উৎপত্তি হয়েছে। যথা–

https://kitabbhubon.com

১. শাসন কার্য। ২. বিচার কার্য। ৩. আইন ব্যবসা। মানুষকে শাসন প্রণালী ও রাজকার্য পরিচালনার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য আইন ব্যবসার প্রয়োজন। এ তিনটি কার্যে হস্তপদের ব্যবহার না থাকলেও এদেরকে "ব্যবসা" নামে অভিহিত করা যায়। এ কারণে পৃথিবীতে 'ব্যবসার' কার্য অসংখ্য উৎপত্তি হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষ এ সমস্ত ব্যবসার মধ্যে নিজেদেরকে একেবারে নিমগ্ন করে রেখেছে।

দুনিয়ার স্বরূপ ও তার ছলনা

দুনিয়ার এ বহুবিধ ব্যবসায়ের মূল শুধু আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান। মূল কার্য এ তিনটির অধিক নয়। সংসারের সমস্ত ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য– এ তিনটির সংস্থান করা। আবার এতিনটির সংস্থান একমাত্র শরীর রক্ষার উদ্দেশ্যে। শরীর রক্ষা কেবল আত্মার বাহনের জন্য। আবার আত্মার অবস্থিতি কেবল আল্লাহতা'আলার মহব্বতের জন্য। এসমস্ত কথা মানুষ একেবারেই ভুলে গিয়েছে। যেমন– হাজী কা'বা শরীফের কথা এবং হজ্জ যাত্রার উদ্দেশ্য ও নিজের অবস্থা ভুলে কেবল উটের সেবার ও সাজ-সজ্জায় মশগুল থেকে আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে রইল, তদ্রূপ মানুষ দেহরূপ বাহনের সেবায় ও সাজ-সজ্জায় দিবারাত নিজকে নিযুক্ত রেখে আল্লাহ্তা'আলা থেকে দূরে সরে পড়েছে। দুনিয়ার অর্থ এটাই। যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করে পরলোকে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত না থাকে, পরলোক যার লক্ষ্যস্থল না হয় এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে অতিরিক্ত মাত্রায় লিপ্ত হয়, সে ব্যক্তি দুনিয়া বা সংসারের মর্ম বুঝতে পারেনি। এ মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেই হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া হারুত ও মারুত অপেক্ষাও বড় যাদুকর। একে ভয় কর ও বর্জন কর।

৩. দুনিয়ার ছলনার কতিপয় দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়ার মোহমায়ার অন্ত নেই। এর ছল-চাতুরী অবগত হওয়া এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এর ছলনা সর্বসাধারণকে বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যক। আট প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা এর মোহের কথা সকলকে বুঝিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ প্রিয় পাঠক ! দুনিয়া তোমার নিকট নিজের অবস্থা এমনভাবে প্রকাশ করছে যে, দুনিয়া চিরকাল তোমার সাথে থাকবে বলে তুমি ধারণা করছ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। দুনিয়া পলকে পলকে

https://kitabbhubon.com

তোমা থেকে সরে পড়ছে এবং এমন ধীরে ধীরে পলায়ন্ করছে যে, তুমি টেরও পাচ্ছ না। দুনিয়ার অবস্থা ছায়ার ন্যায়। ছায়ার প্রতি দৃষ্টি করলে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে স্থির বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তা তোমা থেকে সরে পড়ছে, তোমার আয়ুও প্রতি মুহূর্তে তোমা থেকে সরে যাচ্ছে, তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে তোমার আয়ূ কমে যাচ্ছে। তোমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে অথচ তুমি তার কিছুই টের পাচ্ছ না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ কুহকিনী দুনিয়া নানা বর্ণের বিচিত্র বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে সর্বদা তোমাকে এই জানাতে চেষ্টা করে যে, "সে তোমার প্রেয়সী এবং তুমি তার প্রেমিক। কখনও তোমাকে প্রতারণা করবে না। সর্বদা তোমার মনের মতন হয়ে তোমার প্রণয়ে আবদ্ধ থাকবে। কখনও অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে না, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তোমাকে ধোকা দিয়ে সে বহুবার তোমার শত্রুর অঙ্গশায়িনী হয়েছে। এ দুনিয়া বারবিলাসিনী দুশ্চরিত্রা নারীর ন্যায়। পুরুষদেরকে নিজ কুহলে ভুলিয়ে আপন গৃহে নিয়ে যায়। পরে তাদেরকে জীবনে বিনাশ করে ফেলে। হযরত ঈসা আলাইহিস্সালাম মানস-চোখে দুনিয়াকে একটি বৃদ্ধা রমনীর মত দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কয়জন স্বামীর অঙ্গশায়িনী হয়েছ ? সে উত্তর করল ঃ অসংখ্য অগণিত। পূনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সে সমস্ত স্বামী মরে গিয়েছে না তারা একে একে তোমাকে তালাক দিয়েছে ? দুনিয়া জবাব দিল-আমি সকলকে জীবনে বিনাশ করেছি। এতে তিনি বিস্মিত হয়ে উক্তি করলেন, এ সমস্ত লোক সকলেই কি বোকা ? এ কুলটা ব্যাভিচারিনী দুনিয়া অন্যের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছে, তা দেখেও আবার তারই প্রেমে আত্মহারা হয়েছে। কোনই লজ্জাবোধ করছে না। মায়াবিনী দুনিয়ার মায়াজাল থেকে আল্লাহতা'আলা রক্ষা করুন। আমীন!

তৃতীয় দৃষ্টান্ত ঃ মায়াবিনী দুনিয়া নানাবিধ সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তার বহিরাবরণ খুবই সুন্দর মনমুগ্ধকর রূপে দেখায় এবং অন্তর্নিহিত নানা প্রকার বিপদ এবং ক্লেশকে লুক্কায়িত রাখে। হতবুদ্ধি লোকেরা তার বাহ্যিক ও কৃত্রিম সাজ-সজ্জায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ দুনিয়াকে একটি কুৎসিত বৃদ্ধা ঘোমটাবরণে নিজেরকদাকার মুখমন্ডল আবৃত রেখে বাহ্য শরীরকে বহু মূল্যবান বিচিত্র বেশভূষা ও অলঙ্কার দ্বারা সর্বদা সজ্জিত রাখে। মানুষ দূর থেকে তার বেশভূষার চাকচিক্য দর্শন করে তার প্রতি আসক্ত ও

https://kitabbhubon.com

বিমোহিত হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন তার ঘোমটার আবরণ উন্মুক্ত করে গভীরভাবে তার প্রতি দৃষ্টি করে, তখন তার বীভৎস আকৃতির প্রতি দারুন ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং নিজের দুর্গতির কথা স্মরণ করে সে বিশেষ লজ্জিত হয়। হাদীছ শরীফে আছে, ফেরেশতাগণ ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়াকে এক কদাকৃতি বৃদ্ধার মূর্তিতে উপস্থিত করবেন। বার্ধক্য হেতু তার চোখদ্বয় সবুজ বর্ণে পরিণত হবে। বৃহৎ দন্তগুলো মুখের বহির্ভাগে ঝুলে পড়বে। এ বীভৎসা আকৃতি দর্শনে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে। সকলে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করবে এমন কুৎসিত কদাকার নারী কে ? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলবেন। এ নারী দুনিয়া এর জন্য মানুষ হিংসা ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে পরস্পর কলহ বিবাদ এবং রক্তারক্তি করেছিল। আত্মীয়তার মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিল। সর্বান্ত করণে তার প্রতি অনুরক্ত ও মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। অতঃপর যখন দুনিয়াকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখন দুনিয়া ফরিয়াদ করবে। "হে প্রভু! যারা আমার বন্ধু ছিল তারা কোথায় ? তখন আল্লাহতা'আলা আদেশ করবেন– সংসারাসক্ত লোকদেরকে তার সাথে দোযখে নিক্ষেপ কর।"

চতুর্থ দৃষ্টান্ত ঃ কেউ হিসেব করে দেখলে বুঝতে পারে যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে দীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পর মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে। অতএব মানব সৃষ্টির আদিম সময়ে দীর্ঘকাল যাবৎ দুনিয়ার অস্তিত্ব ছিল না, আবার শেষের দিকেও অনন্তকাল পর্যন্ত দুনিয়ার অস্তিত্ব থাকবে না; সুতরাং বুঝতে হবে যে, দুনিয়ার স্থিতি পথিকের পথের ন্যায়। পাথিক যেমন পথের কোন একস্থান থেকে যাত্রা করে গন্তব্য স্থানে গিয়ে গমনে ক্ষান্ত দেয় মানুষও তেমনি অনাদিকালের কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কিছুকাল জীবিত থেকে মারা যায়। অতঃপর মৃত্যুর পরেও অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে। অনাদি ও অনন্তকালের মাঝখানে মানব জীবন আদি-অন্ত বিশিষ্ট সামান্য কাল মাত্র। এর প্রারম্ভ দোল্না বা সূতিকাগৃহ এবং শেষ সীমা 'কবর'। গণনা করে দেখলে এ আয়ুষ্কালের মাঝে মাঝে কয়েকটি বিশ্রামাগার পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি বৎসর যেন এক দিনের গন্তব্যস্থান। প্রতিটি মাস এক একটি ক্রোশ। প্রতিটি দিন এক একটি মাইল এবং প্রতিটি নিঃশ্বাসকে এক একটি পদক্ষেপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পথিক অবিরত চলে যেতেছে। কারও পথ এক যোজন কারও কম। দুনিয়া

https://kitabbhubon.com

অবিশ্রান্ত গতিতে সরছে অথচ মানুষ মনে করে, তারা দুনিয়ার উপর স্থিরভাবে বসে আছে। চিরকাল এভাবেই থাকবে। এ ধারণায় তারা জগতে এমন বড় বড় কাজে হাত দেয়, যা সম্পন্ন করতে দশ বছর সময় লাগবে অথচ দশ দিনের মধ্যে তার আয়ুষ্কাল শেষ হতে পারে।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত ঃ পাঠক ! জেনে রেখ এবং বিশ্বাস কর যে, দুনিয়ার মানুষ ইহকালের আপাততঃ মধুর সুখ শান্তিতে নিমগ্ন হয়ে তৎকারণ পরলোকে বহু শাস্তি, কষ্ট ও অপমান ভোগ করবে। এর দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যেমন কোন ব্যক্তি সুপক্ক ঘৃতাক্ত ও সুমিষ্ট উপদেয় খাদ্য এমনভাবে উদর পুরে ভক্ষণ করল যে, পরিণামে তার উদরে কঠিন পীড়ার সৃষ্টি হল। ভেদ বমি হতে লাগল। খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদ জনিত সুখতো আহারের সময়ই অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু তা থেকে উদ্ভূত ক্লেশ, যন্ত্রনা ও লজ্জা বহুক্ষণ পর্যন্ত থেকে যায়। খাদ্য দ্রব্য যত উত্তম ও সুখাদ্য হয় তার মল তত অধিক দুর্গন্ধময় হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে দুনিয়ার সুখ-শান্তি যার নিকট যত মধুর হয়, পরকালে তার নিকট তত কষ্টকর এবং অপমানজনক হয়ে থাকে। মৃত্যুর সময়েই এ সত্য প্রকাশিত হতে থাকে। সংসারে যে ব্যক্তি অপরিমিত অর্থ উপার্জন করে ধনবান হয় সে ব্যক্তি প্রমোদ উদ্যানে বীরঙ্গনা পরিবেষ্টিত হয়ে দাসদাসীর পরিচর্যায় সুস্বাদু ও পরমোত্তেজক পানাহারে মহা আমোদের সাথে কালক্ষেপন করে এবং ধন-রত্নে স্বীয় ধনভান্ডার পরিপূর্ণ দেখে মনের আনন্দে অহঙ্কার করে বেড়ায়। মৃত্যুকালে সেই ধনভাণ্ডার এবং রত্নরাশি ছেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যাতনা ভোগ করতে হয়। অতএব দুনিয়ায় যার ধনরত্ন যত অধিক থাকে মৃত্যুকালে তাকে তত অধিক বিয়োগ-যাতনা ভোগ করতে হয়। এ যাতনা মৃত্যুতেও অবসান হয় না; বরং মৃত্যুর পরেই তা অধিকতর তীব্র হয়ে থাকে। কেননা সর্বপ্রকার বস্তুর প্রতি অনুরাগ আত্মার একটি আকর্ষণ বিশেষ। মানুষের মৃত্যুর পরেও আত্মা অমরই থেকে যায়। সুতরাং সে অনুরাগও বিদ্যমান থাকে এবং তদ্দরুন বিচ্ছেদ যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকে।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়ার প্রতিটি কার্য প্রথমত, অতি ক্ষুদ্র ও সহজ বলে মনে হয়। ধারনা করে অল্পক্ষনের মধ্যেই তা সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্ত বিকপক্ষে কার্যে লিপ্ত হলে তা থেকে আরও বহু কার্যের উদ্ভব হতে থাকে। কাজেই ঐ সকল কার্যসমাধা করতে করতে সারা জীবনই কেটে যায়।

https://kitabbhubon.com

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন– দুনিয়ার অনুসন্ধান তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির সমুদ্র থেকে জল পান করার ন্যায়। কেননা তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি সমুদ্রের লোনা পানি যতই পান করে তার পিপাসা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেরূপ এ পৃথিবীর অনুসন্ধানে যে ব্যক্তি যতই সফলতা লাভ করে তার অনুসন্ধানচ্ছো ততই বেড়ে চলে, কখনও নিবৃত্ত হয় না। হযরত রছূলুল্লাহত ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– জলমগ্ন হলে যেমন কারও শরীর না ভিজে উপায় নেই তদ্রূপ দুনিয়ার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে কেউই তাতে আসক্ত না হয়ে পারে না।

সপ্তম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়াকে অতিথিশালা এবং এতে আগত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রিত অতিথির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি কোন গৃহস্বামীর এমন অভ্যাস থাকে যে, তিনি সর্বদা অতিথি সেবার জন্য নিজের একখানাগৃহকে মনোরম সজ্জায় সাজিয়ে রেখেছেন। নিমন্ত্রিত অতিথিকে এনে সমাদরের সাথে সেখানে স্থান দিয়ে থাকেন, নানাপ্রকারের সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী এনে তাদের সম্মুখে স্থাপন করেন। পরম সুন্দর ধুপদানিতে চন্দ্রন লোবানাদি সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালিয়ে তাদের সমাদরের আয়োজন করেন। অতিথি উপাদেয় পান ভোজন এবং সুগন্ধি সেবনে মুগ্ধ হয়ে যায়। একদল নিমন্ত্রিত মেহ্মান কিছুকাল ইত্যাকার আদর আপ্যায়ন উপভোগ করে স্ব-স্ব গন্তব্য পথে চলে যায়। আবার তাদের স্থানে অন্য দল এসে উপস্থিত হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর কিছু বুদ্ধি এবং গৃহস্বামী সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তিনি ধুপদানে সুগন্ধি দ্রব্য নিক্ষেপ করত ঃ যদৃচ্ছা উপভোগ করন, পরে স্বর্ণের ধুপদানি পরিত্যাগ করে গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করেন। পক্ষান্তরে নির্বোধ মেহমানরা ধারনা করে স্বর্ণপাত্র রূপার ধুপদানি সুগন্ধি দ্রব্যাদি গৃহস্বামী আমাকে দান করেছেন। আমি সমস্ত নিয়ে যাব। এ ধারণা সে সমস্ত দ্রব্য পুটলী বেঁধে নেবার সময় অন্য কেউ কেড়ে নিলে সে ব্যক্তি নিতান্ত দুঃখিত ও মনক্ষুন্ন হয়ে চীৎকার করতে থাকে। অতএব দুনিয়া যেন একটি পান্থশালা। পরলোক যাত্রী পথিকদের মঙ্গলের জন্য তা উৎসর্গিত হয়েছে। পথিকদের উচিত তা থেকে কেবল নিজ নিজ পথের সম্বল গ্রহণ করে লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়া। অন্য কোন দ্রব্য গ্রহনের লোভ করলেই মূল লক্ষ্য পণ্ড হবে।

অষ্টম দৃষ্টান্ত ঃ দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার কাজে মগ্ন হয়ে পরকালকে ভুলে বসে। এদের অবস্থা একদল নৌকারোহী যাত্রী সদৃশ। যাত্রীদল

https://kitabbhubon.com

নৌকায় আরোহন করে কোন এক দিকে যাত্রা করল। পথিমধ্যে কোন দ্বীপের সঙ্গে গিয়ে লাগল। মাঝি ঘোষনা করল ঃ অধিক বিলম্ব করা চলবে না। শরীর ধৌত করা ভিন্ন অন্য কোন কাজের অবকাশ পাওয়া যাবে না। নৌকা শীঘ্রই ছেড়ে দেয়া হবে। মাঝির ঘোষণা সত্ত্বেও নির্বোধ যাত্রীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বুদ্ধিমান যাত্রীরা তাড়াতাড়ি মলমূত্র ত্যাগান্তে পাক ছাফ হয়ে এসে নৌকায় আরোহন করল। যখন নৌকার বহু যাত্রী তীরে থেকে যাওয়ায় নৌকার মধ্যে স্থানের অভাব ছিল না। প্রত্যেকে নিজের জন্য আরামদায়ক স্থান বেছে নিল। যে সকল নির্বোধ যাত্রী দ্বীপস্থ পুষ্পরাশি পক্ষীকুলের সুমিষ্ট গান, বিচিত্র জন্তু, মনোহর মনিমানিক্য ও চকচকে প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি নানাপ্রকার তামাশা দেখবার জন্য তীরে ভ্রমণ করে সময় কাটাচ্ছে, নৌকা ছাড়ার প্রাক্কালে তাড়াতাড়ি নৌকায় এসে দেখতে পেল, নৌকার সুবিধাজনক ও আরাম-প্রদ স্থানগুলো পূর্বে প্রত্যাবর্তনকারী যাত্রীরা দখল করেছে। সুতরাং তারা সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় স্থানে জড়সড় অবস্থায় বসে কষ্ট ভোগ করতে লাগল। এদের মধ্যে কতিপয় লোক কেবল দ্বীপের তামাশা দেখেই ক্ষান্ত হয় নি। তথা থেকে ভাল কিছু প্রস্তর খন্ডও কুড়িয়ে এনেছিল, অথচ তা নৌকায় রাখার স্থান পেল না। তখন তাদের অসুবিধা চরমে পৌঁছল। স্থানাভাবে প্রস্তরখন্ডগুলো নৌকায় রাখতে না পেরে তা নিজ নিজ মাথার উপর রেখে সংকীর্ণ স্থানে মহা অসুবিধায় বসে রইল। দু'দিন পরে দেখতে পেল, সে চক্‌চকে প্রস্তরখন্ডগুলো কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে এবং তা থেকে সুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। তখন সে সুর্গন্ধময় প্রস্তর বাইরে ফেলবার স্থান না পেয়ে দারুন লজ্জায় মস্ত ক অবনত করল। সেই পূঁতিগন্ধময় প্রস্তরের বোঝা নিজ নিজ স্কন্ধের উপর স্থাপন করে কষ্ট ভোগ করতে লাগল। এদের আর একদল লোক দ্বীপের শোভা দর্শনে এতই আত্মহারা হয়েছিল যে, সেখানে বিভোর হয়ে পড়ে রইল। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল। তারা মাঝির ঘোষণায় কর্ণপাত না করায় তীরেই রয়ে গেল। ফলে তাদের কতকলোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে তথায় প্রাণ ত্যাগ করল। আর কতক লোককে হিংস্র জন্তু উদরসাৎ করল।

প্রথম শ্রেণীর উক্ত যাত্রীদেরকে পরহেযগার মুছলমানের সাথে এবং সর্বশেষের লোকদেরকে কাফিরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ শেষোক্ত লোকেরা নিজকে পরকালকে এবং আল্লাহকে ভুলে সম্পূর্ণরূপে

https://kitabbhubon.com

সংসার মোহে মত্ত হয়ে গিয়েছিল। এরা ইহকালকে পরকাল অপেক্ষা অধিক লোভনীয় মনে করত, এদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'আলা বলেন–

إِسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ-

অর্থাৎ তারা ইহলৌকিক জীবনকে পারলৌকিক জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবেসেছিল। (পারা -১৩ ঃ সূরা নাহ্‌ল রুকু –১৪) মধ্যবতী দু'দল পাপী মু'মিনের তুল্য। তাদের আসল ঈমান অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু সংসার-মোহ বর্জন করতে পারেনি। এক দল আনন্দ উপভোগ করে পরিশেষে কষ্টে পড়েছেন অপর দল আমোদ উপভোগের পর কতগুলো অকর্মণ্য পদার্থ অর্থাৎ পাপকর্ম সংগ্রহ করে তার দুর্গন্ধময় ভারা নিজ স্কন্ধে বহন করে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।

দুনিয়ার চিরস্থায়ী মঙ্গলের উপাদান

প্রিয় পাঠক! সংসারে অনিষ্টকর পদার্থের কথা যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনে কর না যে, দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থই মন্দ এবং ক্ষতিকর। বরং দুনিয়ার এমন কতগুলো বস্তু আছে যা বস্তুত ঃ পারলৌকিক পদার্থ। যেমন– সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম। এগুলো দুনিয়ার অন্তর্গত হলেও তা দুনিয়ার পদার্থের মধ্যে পরিগণিত নয়। এ দুটি বস্তু মানবাত্মার সাথে পরকাল পর্যন্ত যাবে।

সৎজ্ঞান প্রকাশ্যত ঃ সম্পূর্ণরূপে আত্মার সঙ্গেই থাকবে। সৎকর্ম বা নেক কাজ যদিও বাহ্যত ঃ আত্মার সাথে থাকবেনা, কিন্তু এর ফল ও প্রভাব সদাসর্বদা আত্মার সাথেই থেকে যাবে।

নেক কাজের প্রভাব দ্বিবিধ ঃ (ক) আত্মা-রত্নের পরিশুদ্ধি ও উজ্জলতা বৃদ্ধি করা। পাপ কর্ম বর্জনের ফলেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে। (খ) আল্লাহতা'আলার যিকির এর প্রতি প্রবল আকাঙ্খা বৃদ্ধি করা। তা এবাদতের কারণে উৎপন্ন হয়। সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম বা নেক কাজ "আল বাকিয়াতুচ্ছালে হাত" বা চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক কার্যাবলী বলে পরিগণিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা বলেন–

وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ-

"আর চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক কর্মসমূহ তোমার প্রভুর নিকট অতি উৎকৃষ্ট।" (পারা- ১৫, সূরা-কাহাফ ঃ রুকু–৬)

https://kitabbhubon.com

পার্থিব ভোগ্য বস্তুর প্রকারভেদ

১. সৎজ্ঞান অনুরাগ, ২. প্রার্থনায় তৃপ্তি এবং ৩. আল্লাহতা'আলার যিক্‌রে প্রবল আসক্তি। এ ত্রিবিধ বিষয় সংসারের যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু। দুনিয়ার মধ্যে হলেও এ বিষয়গুলো দুনিয়ার মধ্যস্থিত পদার্থরাশির অন্তর্গত নয়। এ জন্যই বলা হয়েছে-দুনিয়ার ভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সমস্ত বস্তু খারাপ নয়। এমন কি, যে সমস্ত ভোগের বস্তু ধ্বংসাশীল, স্থায়ী থাকে না, তাদের মধ্যেও সবগুলোও খারাপ নয়; বরং কতগুলো ভালও আছে। পৃথিবীর ভোগ্য বস্তুসমূহকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়– ১. দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, মৃত্যুর সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু দুনিয়ায় অবস্থান কালে জ্ঞান ও সৎকর্মে সাহায্য করে। আবার মুছলমানের বংশ বৃদ্ধি করে বলে পারলৌকিক কাজেরও সহায়তা করে। এ শ্রেণীর পার্থিব কাজ মন্দ নয়। যেমন– বিবাহ, পানাহার, পোশাক ও বাসস্থান। এ সকল বস্তু প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করে তৃপ্ত থাকে এবং হৃষ্টচিত্তে এবাদতের সুযোগ লাভের আশায় ব্যবহার করে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত বলে গণ্য হয় না। ২. দুনিয়ার কাজেরই অন্তর্গত যে সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য, ধর্মলাভ বা খোদাভীতি নয়, বরং তার ফলে মোহের উৎপত্তি হয়ে মনকে দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত করে তোলে এবং পরলোকের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দেয়, এ জাতীয় কাজ নিতান্ত জঘন্য। এ মর্মেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّمَلْعُوْنٌ مَّافِيْهَا اِلَّاذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ

"দুনিয়া অভিশপ্ত স্থান। আল্লাহতা'আলার যিক্‌র এবং তার সাহায্যকারী বিষয়সমূহ ব্যতীত যা কিছু দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে-তাও ধিক্কারপ্রাপ্ত ও অভিশপ্ত।" দুনিয়ার অর্থ কি এবং দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? এ দু'প্রশ্নের উত্তর বুঝাতো যতটুকু লিখতে হল, ততটুকুই যথেষ্ট।

দারিদ্রতা ও বৈরাগ্য ঃ প্রিয় পাঠক ! অন্তরের সাথে বিশ্বাস রেখ, নিম্নে বর্ণিত চারটি বিষয়ের উপর মূলত ঃ ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। ১. আত্ম-প্রবৃত্তি ; ২. আল্লাহ্ ; ৩. ইহকাল ; ৪. পরকাল। এচারটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্ ও পরকাল এ দু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং অপর দু'টিকে

https://kitabbhubon.com

পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অর্থাৎ খোদা-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিজকে ভুলে যাবে এবং পরকালের সৌভাগ্য লাভের জন্য সংসারের ভোগ-বিলাস ও মোহ-মায়া ত্যাগ করবে। নিজের দিকে থেকে লক্ষ্য ও দৃষ্টি ফিরিয়ে আল্লাহতা'আলার দিকে স্থাপন করবে। সংসারের মুখে পদাঘাত করে দূরে ফেলে দিয়ে পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভের প্রতি ধামমান হবে। এরূপ ক্ষমতা লাভের সূচনা ভয়, ছবর ও তওবা থেকেই সূচিত হয়ে থাকে। সংসারাসক্তি সে ক্ষমতার বিনাশ সাধন করে থাকে। উক্ত ধ্বংসাত্মক সংসারশক্তি দমনের উপায় নিম্নরূপ। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ পূর্বক সংসারের সাথে শত্রুতা স্থাপন এবং তার সাথে সর্ববিধ সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা উপরোক্ত বিনাশক শক্তির কবল থেকে পরিত্রাণ লাভে উপায়। এখন আমরা সে পরিত্রাণকারী গুণাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করব। দারিদ্রতা এবং সংসার বৈরাগ্য উক্ত পবিত্রতা গুণের অন্তর্গত। অতএব সর্বপ্রথম দারিদ্রতা এবং বৈরাগ্যের পরিচয় ও ফযীলত সম্বন্ধে উল্লেখ করা উচিত।

দারিদ্রতা ও সংসার বৈরাগ্যের পরিচয়

প্রিয় পাঠক! অবগত হও। যার অধিকারে স্বীয় অভাব মোচনের পরিমাণ অর্থ সম্পদ নেই এবং তৎপরিমাণ অর্থ উপার্জনের ক্ষমতাও তার নেই, এরূপ লোককে দরিদ্র বলা হয়। মানুষের সর্বপ্রথম অভাব ছিল পৃথিবীতে আসার। পৃথিবীতে যখন সে ভূমিষ্ট হল, তখন অভাব পড়ল তাঁর বেঁচে থাকার। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হল ধন-সম্পদ ও আহার্য এবং পানীয় দ্রব্যের। এতদসঙ্গে আরও নানাবিধ বস্তুর অভাব এবং আবশ্যকতা এসে দেখা দিল। বস্তুতঃ এতদসমূদয় বস্তুর কোনটিই মানবের ক্ষমতা বা আয়ত্তে নেই। অথচ মানুষ এর কোনটির অভাব থেকেই মুক্ত নয়।

দারিদ্রতার আরও ব্যাপক অর্থ ঃ দারিদ্রতার ব্যাপক অর্থ বুঝতে হলে অগ্রে ধনী কাকে বলে তা বুঝতে হবে। যার কোন কিছুর অভাব নেই, যিনি কোন বিষয়েই কারও মুখাপেক্ষী নন-তাকেই প্রকৃত ধনী বলা যায়। একমাত্র সর্বাধিপতি আল্লাহতা'আলা ব্যতীত এমন ধনী আর কেউই নন। মানব, দানব, ফেরেশতা, শয়তান বা যা কিছু সৃষ্ট জগতে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব তাদের নিজ ক্ষমতায় হয়নি। তা তাদের

https://kitabbhubon.com

আয়াত্তেও নয়। সুতরাং এরা সকলে পরমুখাপেক্ষী ও দরিদ্র। এ মর্মেই আল্লাহতা'আলা বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ-

অর্থাৎ "আল্লাহতা'আলাই একমাত্র ধনী আর তোমরা সবে দরিদ্র (পারা ২৬ এবং সূরা মুহাম্মাদ ঃ রুকু ৪)

হযরত ঈসা নবী আলইহিস সালাম ফকীর فقير শব্দের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

اَصْبَحْتُ مُرْ تَهِنَا بِعَمَلِىْ وَالْاَمْرُ بَيْدِ غَيْرِىْ فَلَا فَقِيْرَ اَفْقَرُ مِنِّىْ-

অর্থাৎ 'আমি আমার কাজের দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি অথচ আমার কাজের চাবিকাঠি অপরের হাতে রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার চেয়ে অধিকতর নিঃসহায় ফকীর আর কেউই নেই। আল্লাহতা'আলা ও এ মর্মে বলেছেন ঃ

وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُوْ الرَّحْمَةِ- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ-

"আপনার প্রভু ধনী দয়ালু। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে (পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে) সরিয়ে দিয়ে তোমাদের পরে যা ইচ্ছে সৃজন করতে পারেন। (কিন্তু দয়ালু বলে তোমাদের প্রতি তত নিষ্ঠুর আচরণ করেন না।) আয়াতটিতে غنى অর্থাৎ ধনীর ভাবার্থ এটাই করা হয়েছে যে, যিনি ইচ্ছে করলে পৃথিবীস্থ সমস্ত কিছুই ধ্বংস করে দিয়ে তদস্থলে যা ইচ্ছে তা-ই সৃজন করতে পারেন। (পারা ৮ সূরা আনআমঃ রুকু-১৬) এতে বুঝা যাচ্ছে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন যাবতীয় সৃষ্টি পদার্থই ফকীর। ছূফীদের পরিভাষায় 'ফকীর' অর্থাৎ দারিদ্রতার অর্থ ঃ "তাছাওউফ্" শাস্ত্রের পরিভাষায় যে ব্যক্তি সর্বদা নিজকে সর্ববিধ বিষয়ে অক্ষম ও অভাবগ্রস্থ মনে করে এবং এরূপ অবস্থা তার হৃদয়ে সর্বদা প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে যে, সে উত্তমরূপে বুঝতে পারে, ইহকালে

https://kitabbhubon.com

কিংবা পরকালে কোন কিছুর ওপরই আমার অধিকার নেই এবং কোন পদার্থের ওপর আমার ইচ্ছাধীন কোন ক্ষমতা নেই। আদি সৃষ্টিকালেও যেমন আমার কোন ক্ষমতা ছিল না। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপ আমার কোন প্রকারের ক্ষমতা নেই এবং থাকবে না। এরূপ ব্যক্তিকে সুফীগণ ফকীর বলে থাকেন। ছূফীগণ কর্তৃক বর্ণিত 'ফকীর' শব্দের এরূপ অর্থ শ্রবনে মুর্খ লোকেরা বলতে পারে। সর্বধিক ক্ষমতা গুণ ও বস্তু থেকে শুন্য হওয়াকে যখন দারিদ্রতা বলা হয়, তখন ফকীর হতে হলে এবাদৎ এবং ছওয়াব শুন্যও হতে হবে। কেননা এবাদৎ করলেই এবাদৎকারীর নামে পুণ্য (ছওয়াব) সঞ্চিত হয়ে থাকে। অতএব তার অধিকারে একটি বিষয় এসেছে বলে তাকে আর ফকীর বলা যাবে না। কোন ঈমানদার লোক এমন উক্তি করতে পারে না। বে-ঈমান লোকের অন্তরে শয়তান এরূপ বিধর্ম ও কুফরীর বীজ বপন করে থাকে। যে সমস্ত মুর্খ অর্বাচীন নিজেদেরকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে, তদেরকেই শয়তান এরূপে পথভ্রষ্ট করে থাকে। উত্তম অর্থবিশিষ্ট শব্দের মধ্যে এরূপ কদর্যের রং চড়িয়ে দিয়ে নির্বোধ লোকদেরকে বিভ্রান্তি ও প্রতারিত করে থাকে। আর নির্বোধেরা এরূপ কুটিল অর্থ বের করতে পারাকে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রসূত বলে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করতে থাকে। এরূপ ধোকায় পড়ে পরিশোষে এ সমস্ত নির্বোধেরা এরূপ জঘন্য উক্তি করতে থাকে যে, 'যে জন আল্লাহকে পেয়েছে সে সব কিছুরই অধিকারী হয়েছে। অতএব আল্লাহকে প্রাপ্ত হয়ে কিরূপে ফকীর হওয়া যায় ? ফকীর হতে হলে আল্লাহ্তা'আলাকে বর্জন করা উচিত।" এ সবতো গেল নির্বোধও অর্বাচীনদের উক্তি। প্রকৃতপক্ষে ফকীর তাকেই বলা যায়, যে ব্যক্তি অবিরত আল্লাহতা'আলার এবদতে নিমগ্ন থাকে। এ মর্মে পয়গাম্বর হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন – এবাদতের ওপর এবাদৎ আমার নিজস্ব জিনিস নয়। এবাদতে আমার কোন আধিপত্যও নেই। তা আমার ইচ্ছা এবং ক্ষমতার অধীনও নয়; বরং এবাদতের দায়ে আমি স্বয়ং মা'বূদের নিকট আবদ্ধ রয়েছি।

যা হোক, সূফীগণের পরিভাষায় যেরূপ লোককে ফকীর বলা হয় সেরূপ ফকীরের ব্যাখ্যা করাও এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আবার, সর্বপ্রথমে প্রকৃত ফকীর শব্দের যে ব্যাখ্যা করে এসেছি যে, একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ ধনী নয়, মানুষ সর্ববিষয়ে সর্বতোভাবে ফকীর।

https://kitabbhubon.com

সেরূপ ব্যাখ্যা করাও এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং ধন-সম্পত্তির দিক দিয়ে মানুষের যে দারিদ্রতা ও নিঃস্বতা ঘটে এস্থলে আমরা কেবল সে দারিদ্রতা বর্ণনা করব।

দারিদ্রতার শ্রেণী বিভাগ

মানুষ পার্থিব জীবনে লক্ষ লক্ষ অভাবের সম্মুখীন হচ্ছে, ধনের অভাবও তন্মধ্যে একটি। অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর অভাব যেমন দারিদ্রতা, ধনের অভাবও তেমনই 'দারিদ্রতা। আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু ধনের অভাব সম্বন্ধীয় দারিদ্রতা বিষয়ে কিছু বর্ণনা করা।

প্রিয় পাঠক ! জেনে লও, দু'কারণে মানুষের নিকট ধন থাকে না ১. হয়ত ইচ্ছে করে মানুষ ধন পরিত্যাগ করে থাকে এরূপ ব্যক্তিকে সংসারবিরাগী বলে। ২. অথবা ধন হস্তগতই হয় না, এরূপ লোককে ফকীর অর্থাৎ দরিদ্র বলে। মোট কথা, ধনের অভাবী লোককে দরিদ্র বলে। নির্ধন দরিদ্র লোককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ১. যার ধন নেই কিন্তু ধন লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে, তাকে লোভী দরিদ্র বলে। ২. যে দরিদ্র রিক্ত হস্ত, কিন্তু ধন লাভের স্পৃহাকে সে সম্পূর্ণরূপে দমন করে ফেলেছে, কেউ দান করলেও গ্রহণ করে না। ধন হাতে রাখাকে সে অন্তরের সাথে ঘৃণা করে, এরূপ ব্যক্তিকে সংসার বিরাগী বলে। (৩) যে দরিদ্র লোক ধনোপার্জনের জন্য চেষ্টা করে না, কিন্তু বিনা চেষ্টায় হাতে আসলে তা ফেলে দেয় না। কেউ দান করলে গ্রহণ করে, না দিলেও সন্তুষ্ট থাকে। এরূপ লোককে আপন অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট দরিদ্র বলে। এস্থলে আমরা সর্বপ্রথম দারিদ্র্যতা বা ফকীরের ফযীলত বর্ণনা করব। অতঃপর সংসার বৈরাগ্য এর ফযীলত বর্ণনা করব। দারিদ্রতার ফযীলত অগ্রে বর্ণনা করার কারণ এই যে, যে কোন শ্রেণীর দারিদ্রতা হোক না কেন কেউই দারিদ্রতার সুফল থেকে বঞ্চিত হবে না। লোভী দরিদ্রও শত চেষ্টা করেও যদি ধন লাভে বঞ্চিত থাকে, সে দারিদ্র্যতার ফযীলত প্রাপ্ত হবে। দারিদ্রতার ফযীলত সম্পর্কে হাদীছের বাণী ঃ

প্রিয় পাঠক! অবগত হও, আল্লাহতা'আলা বলেছেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ

https://kitabbhubon.com

(পারা ২৮ ঃ সূরা- হাশর ঃ রুকু ১) আল্লাহতা'আলার নিকট ফকীরদের মর্যাদা এত উচ্চ যে, তিনি এ আয়াতে ফকীদেরকে মুহাজিরগণের অগ্রবর্তী করেছেন। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি বহু পরিজন বর্গ নিয়ে সৎভাবে জীবন যাপন করছে আল্লাহতা'আলা তাকে ভালরাসেন।"

একদা হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাঃ) কে বলেছেন, "হে বিলাল! তুমি চেষ্টা কর যেন ইহলোক থেকে দরিদ্রাবস্থায় যেতে পার। ধনী অবস্থায় যেতে চেষ্টা কর না।"

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র লোক সর্বাপেক্ষা উত্তম। দুর্বল লোক সকলের আগে বেহেশ্‌ত প্রবেশ পূর্বক বিচরণ করতে থাকবে।" হযরত রছূলে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "আমার প্রিয় দুটি পেশা আছে, যে ব্যক্তি উক্ত পেশাদ্বয়কে ভালবাসে সে যেন আমাকেই ভালবাসে। আমার সে পেশা দু'টির একটি "দারিদ্রতা" অপরটি "জিহাদ" অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ"

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, একদিন জিবরাঈল (আঃ) হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইয়া রছূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌তা'আলা আপনাকে ছালাম জানাচ্ছেন এবং আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে আল্লাহতা'আলা ভূপৃষ্ঠের সমস্ত পাহাড়-পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে আপনাকে দান করতে পারেন। আপনি ঐ সমূদয়কে যথায় ইচ্ছে সম্মুখে উপস্থিত পেতে পারেন।" এতদশ্রবনে হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন, "হে জিবরাঈল (আঃ)। আমি তা পেতে চাই না। এ পৃথিবী গৃহহীনদের জন্য গৃহ এবং ধর্মহীনদের জন্য ধন। এ জগতে ধন সঞ্চয় করা নির্বোধ লোকের কাজ। হুযুরের মুখে এরূপ উত্তর শ্রবণে জিবরাঈলে (আঃ) বললেন–

ثَبَّتَكَ اللّٰهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

"আল্লাহতা'আলা আপনাকে এ সুদৃঢ় মনোভাবের ওপর অটল রাখুন।" একদিন হযরত ঈসা নবী (আঃ) একজন নিদ্রিত লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করা কালে নিদ্রিত লোকটিকে বললেন, "ওঠ'

https://kitabbhubon.com

আল্লাহতা'আলাকে স্মরণ কর।" লোকটি জাগ্রত হয়ে নিবেদন করল, " হে ঈসা (আঃ) আপনি আমার নিকট থেকে আর কি আশা করেন ? আমিতো দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে গুমাচ্ছি"। ঈসা (আঃ) বললেন, "ভ্রাতঃ ! তবে শয়ন কর এবং তৃপ্তির সাথে ঘুমাও।"

একদিন হযরত মুছা (আঃ) কোন পথ দিয়ে যাবার কালে পথিপার্শ্বে এক ব্যক্তিকে দেখলেন একখানা ইটের ওপর মস্তক স্থাপন করে জমীনের ওপর শুয়ে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন রয়েছে। তার শরীরের একখানা কম্বল ব্যতীত আর কোন বস্ত্র নেই। হযরত মূছা (আঃ) আল্লাহতা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, "ইয়া আল্লাহ ! এ লোকটির জীবন কেন এমন দুরাবস্থার মধ্যে বিনষ্ট হচ্ছে। তার তো কিছুই নেই।" প্রত্যাদেশ হল, 'হে মূছা। তুমি কি জান না যে, যার প্রতি আমার হৃদয় আকর্ষন অধিক হয়, আমি তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও সুখ-শান্তি থেকে দূরে রেখে থাকি।"

হযরত আবু 'রাফে' (রাঃ) বলেছেন, 'একদিন মহানবী হযরত রাছুলে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহে অতিথি এসেছিলেন তখন তাঁর গৃহে খাদ্যসম্ভার কিছুই ছিল না। নিকটস্থ এক ইহুদীর দোকান থেকে কিছু আটা বাকি মূল্যে খরিদ করে আনার জন্য হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছিলেন আমি ইহুদী দোকানদারের নিকট গিয়ে হুযুরের জন্য বাকি মূল্যে কিছু আটা চাইলে সে তাতে সম্মত হল না, শপথ করে বলল, আমি ধারে আটা দেব না। আমি ফিরে এসে হুযুরের সমীপে সমস্ত কথা নিবেদন করলে তিনি বললেন, "আমি আছমানের মধ্যে 'আমীন' বলে খ্যাত এবং জমীনের মধ্যেও 'আমীন' বলে পরিচিত। ইহুদী লোকটি ধার দিলে অবশ্যই আমি তা পরিশোধ করতাম। এখন যাও, আমার এ বর্মটি তাঁর নিকট বন্ধক রেখে আটা নিয়ে এস। আমি হুযুরের পবিত্র বর্মটি তার আদেশানুযায়ী ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে আটা নিয়ে আসলাম। তৎক্ষনাৎ হুযুরের মনস্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا- لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ- وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى-

https://kitabbhubon.com

হে মুহাম্মদ ! ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনি সে সমস্ত ধন-দৌলতের দিকে তাকাবেন না। যা আমি তাদেরকে দান করেছি। পার্থিব জীবনের শোভা সৌন্দর্যের জন্য। আমি তাদেরকে তাতে ফাঁসিয়ে রাখব। (পরকালে তারা হবে রিক্ত হস্ত।) আপনার জন্য আপনার প্রভু যে রিযক নির্ধারিত রেখেছেন, তা সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী। (পারা ১৬, সূরা তোয়াহা রুকু ৮) সারমর্ম এই যে, হে মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি দুনিয়া এবং দুনিয়াদারগণের প্রতি কটাক্ষ্যপাত করবেন না। এ পার্থিব সম্পদ তাদের জন্য বিপদের কারণ হবে। আল্লাহতা'আলার নিকট আপনার জন্য যা কিছু সঞ্চিত রয়েছে তা অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। হযরত কা'আবুল আহ্বার (রাঃ) বলেছেন, "হযরত মূছা (আঃ) এর প্রতি ওহী আসল, 'হে মূছা! যখন তুমি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়, তখন বলো–

مَرْحَبًا لِّشِعَارِ الصَّالِحِيْنَ

অর্থাৎ 'হে পুণ্যবান লোকদের অঙ্গে রাখা জামা ! তোমাকে ধন্যবাদ।" হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে বেহেশ্‌ত দেখান হয়েছিল, দেখলাম বেহেশ্‌তবাসীদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর লোক।

তিনি আরও বলেছেন, "আমি বেহেশ্‌তে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব অল্প দেখে জিজ্ঞেস করলাম, স্ত্রীলোকেরা কোথায় ?" উত্তর আসল–

شَغَلَهُنَّ الْاَحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ-

"দুটি রঙ্গীন পদার্থ অর্থাৎ স্বর্ণ এবং যা'ফরান তাদেরকে বেহেশ্‌ত থেকে বঞ্চিত রেখেছে।"

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কোন এক পয়গম্বর (আঃ) নদীর তীর দিয়ে অতিক্রমকালে দেখতে পেলেন, এক ধীবর আল্লাহতা'আলার নাম নিয়ে জাল ফেলছে অথচ জালে একটি মাছও আসছে না। কিন্তু আর একজন ধীবর শয়তানের নাম নিয়ে জাল ফেলছে এবং প্রচুর মাছ আসছে। উক্ত পয়গাম্বর (আঃ) আল্লাহ্‌তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! এ সবইতো তোমার হুকুমে হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে কি রহস্য আছে ? বুঝতে পারি না। আল্লাহতা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে আদেশ করলেন। উক্ত

https://kitabbhubon.com

ধীবরদ্বয়ের স্থান যথাক্রমে বেহেশ্‌তে ও দোযখে এ পয়গম্বরকে দেখিয়ে দাও।" পরগম্বর (আঃ) প্রথম ধীবরের স্থান বেহেশতে এবং দ্বিতীয় ধীবরের স্থান দোযখে দেখে নিবেদন করলেন "হে খোদা! তাদের পরিনাম দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হলাম।

হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ধনেশ্বর্যের কারণে পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ছুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) সকলের শেষে বেহেশতে যাবেন। আর ছাহাবীদের মধ্যে ধনবান হওয়ার কারণে সকলের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ।"

হযরত ঈছা (আঃ) বলেছেন, "ধনবান লোকের পক্ষে বেহেশতে প্রবেশ করা খুব কঠিন হবে।" হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌তা'আলা যখন মানুষকে অতি মাত্রায় ভালবাসেন, তখন তাদের ওপর নানাবিধ আপদ-বিপদ চাপিয়েছেন। আর যাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় অত্যন্ত ভালবাসেন তাদেরকে اقتنا একতেনা করেন। ছাহাবীগণ 'একতেনা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, কারও ধনসম্পদ সমূলে বিনষ্ট করে দেয়া এবং পরিজনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলাকে 'একতেনা' বলা হয়।

হযরত মূছা নবী (আঃ) আল্লাহতা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন, "ইয়া আল্লাহ ! মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপনার প্রিয় ? আমি তাকে ভালবাসব।" উত্তর আসল, 'যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধর্মহীন সে আমার প্রিয় বন্ধু।" নবীকুল শিরোমনি হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সকলকে মহাবিচারালয়ে উপস্থিত করা হলে মানুষ একে অন্যের নিকট ত্রুটি স্বীকার পূর্বক যেরূপ নম্রতার সাথে কথাবার্তা বলবে, আল্লাহ্‌তা'আলা দরিদ্র লোকদেরকে সম্বোধন করে তদ্রূপ নম্রতার সাথে সান্তনা প্রদান করে বলবেন, "হে আমার প্রিয় বান্দাগণ! আমি যে তোমাদেরকে পৃথিবীতে ধনহীন এবং অপদস্ত করার জন্য নিধন করেছিলাম। বরং এ জন্য তোমাদেরকে নিধন করেছিলাম যে, পরলোকে তোমাদেরকে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত এবং মহা গৌরবে গৌরবান্বিত করব। এখন তোমরা এ জনতার সারিসমূহের মধ্যে প্রবেশ কর। এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে তোমাদেরকে আমার খুশীর জন্য কোন দিন এক লোকমা অন্ন কিংবা একখানি বস্ত্র দান করেছিল তাদেরকে টেনে

https://kitabbhubon.com

নিয়ে এস। তাদেরকে আজ আমি তোমাদের হস্তে সমর্পণ করলাম। সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, দারুন উত্তাপে মানুষ ঘর্মসমুদ্রের মধ্যে ডুবে থাকবে। তখন দরিদ্রগণ জনতার সারিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের প্রতি অনুগ্রহকারীদেরকে হস্ত ধারণপূর্বক টেনে বেহেশতে নিয়ে যাবে।" হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা দরিদ্র লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর এবং তাদের প্রতি সাধ্যানুযায়ী অনুগ্রহ ও উপকার কর। পরকালের পথে তারা তোমাদের জন্য সংগৃহীত ধন এবং প্রধান সম্বল।" উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, "ইয়া রছূলুল্লাহ ! তারা আমাদের জন্য কি প্রকার ধন ?" হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ক্বিয়ামতের দিন দরিদ্রদের প্রতি আদেশ করা হবে যে, যারা পৃথিবীতে তোমাদেরকে এক লোকমা অন্ন, এক ঢোক পানি কিংবা এক খন্ডবস্ত্র দান করেছে আজ তোমরা তাদের হাত ধরে টেনে বেহেশতে চলে যাও।" আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু বলেন, "হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সময়ে মানুষ ধন-সম্পদ সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করবে, দালান-কোঠা ইমারৎ নির্মাণে উৎসাহিত থাকবে এবং দরিদ্রদেরকে দেখলে শত্রুর ন্যায় মনে করবে, তখন আল্লাহতা'আলা জন সমাজে চার প্রকারের 'বালা' (আপদ-বিপদ) প্রেরণ করবেন– ১. দুর্ভিক্ষ, ২. রাজশক্তির অত্যাচার, ৩. বিচারকগণের পক্ষপাতমূলক আচরণ, ৪. কাফের এবং শত্রুদের দৌরাত্ম।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দরিদ্র লোককে দারিদ্রতার জন্য হীন ও তুচ্ছ মনে করে এবং ধনী হওয়ার কারণে কোন ব্যক্তিকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত মনে করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্তা'আলার লা'নৎ (অভিশাপ) গ্রস্ত। বুযুর্গগন বলেছেন, "ধনী ও আমীর লোকেরা হযরত ছুফিয়ান ছওরীর দরবারে যেমন লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হত তেমন লাঞ্ছনা তারা আর কোথাও ভোগ করতে না। তিনি ধনবান আমীর লোকদেরকে সম্মুখের সারিতে স্থান দিতেন না। তারা পেছনের সারিতেই বসে থাকত। পক্ষান্তরে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে তিনি অতি আদরের সাথে নিজের আশে পাশে বসাতেন। মহাত্মা লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "বৎস ! স্মরণ রেখ ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র লোক দেখলে কখনও ঘৃণা করো না। একথা কখনও ভুলো না যে, তুমি এবং দরিদ্র লোক একই খোদার বান্দা।"

https://kitabbhubon.com

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে-মাআয বলেছেন, "মানুষ দারিদ্রতা ও অভাবকে যেমন ভয় করে, যদি দোযখকে তারা তেমন ভয় করত, তবে দারিদ্রতা এবং দোযখ উভয় থেকেই তারা নির্ভয় হতে পারত। আর তারা দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করে থাকে, যদি বেহেশত প্রাপ্তির জন্য তদ্রূপ পরিশ্রম করত, তবে তারা দুনিয়া ও বেহেশ্‌ত উভয়ই লাভ করত। আর তারা বাইরে মানুষকে যেরূপ ভয় করে, যদি অন্তরে আল্লাহতা'আলাকে তদ্রূপ ভয় করত, তবে উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হতে পারত।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রাহেমাহুল্লাহর সম্মুখে এক ব্যক্তি দশ সহস্র দেরহাম (রৌপ্য-মুদ্রা) স্থাপন পূর্বক তা গ্রহণের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। সে ব্যক্তি বারবার বিশেষভাবে অনুরোধ করতে আরম্ভ করলে তিনি বললেন, "ভাই! তোমার কি এ ইচ্ছা যে, আমি তোমার মুদ্রাগুলো গ্রহণ করতে আমার নাম দরিদ্রদের তালিকা থেকে কেটে লই ? এ আমি কখনই করতে পারব না।" হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেছিলেন, "যদি তুমি ক্বিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে থাকতে বাসনা রাখ তবে দরিদ্রদের ন্যায় জীবনযাপন করতে থাক। আমীর লোকের আচরণ এবং তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা থেকে দূরে সরে থাক। পরিধেয় বস্ত্রে গ্রন্থি লাগাবার উপায় থাকা পর্যন্ত গ্রন্থি লাগিয়ে পরিধান কর। তালি লাগিয়ে পরিধান করা ব্যতীত কোন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিও না।"

তুষ্ট দরিদ্র্যের ফযীলত

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহতা'আলা যাকে ইছলাম ধর্মের সুপথ প্রদর্শন করেছেন, অভাব মোচনের উপযোগী পরিমাণ ধন তাকে দান করেছেন এবং তাতেই পরিতুষ্ট ও সন্তুষ্ট রয়েছে এমন ব্যক্তিই প্রকৃত সৌভাগ্যবান। হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "হে দরিদ্রগণ! সর্বান্তকরণে স্বীয় অভার ও দারিদ্রতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারলে তোমরা দারিদ্রতার জন্য অশেষ ছওয়াব লাভ করতে পারবে, অন্যথায় ছওয়াব পাবে না। এ হাদীছে

https://kitabbhubon.com

একথার প্রতি প্রকাশ্য ইঙ্গিত রয়েছে যে, লোভী দরিদ্র লোক দারিদ্রতার ছওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু অন্যান্য হাদীছ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, লোভী দরিদ্রেরাও দারিদ্রতার ছওয়াব পাবে।"

রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "প্রত্যেক বস্তু লাভ করতে হলে তার জন্য একটি চাবি অর্থাৎ উপায়ের প্রয়োজন হয়। সহিষ্ণু দরিদ্রকে ভালবাসা বেহেশতের চাবি। কেননা ক্বিয়ামতের দিন এরা আল্লাহতা'আলার একান্ত নিকটবর্তী হবে।"

হুযুরের আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "নিজের অধিকারে সামান্য যা কিছু আছে, তাতেই যে দরিদ্র সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহতা'আলা যখন যে পরিমাণ জীবিকা দান করেন তা পেয়েই যে দরিদ্র পরিতৃপ্ত থাকে, আল্লাহতা'আলা তাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।"

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "ক্বিয়ামতের দিন আমীর, গরীব সকলেই এ বলে অনুতাপ করবে যে, হায়! কি ভাল হত যদি আমরা পৃথিবীতে কেবল জীবন রক্ষার পরিমিত ধন ভিন্ন অতিরিক্ত কিছুই না পেতাম। তবে আজ আমরা দারিদ্রতার ফযীলত প্রাপ্ত হতাম।"

আল্লাহতা'আলা হযরত ইসমাইল (আঃ) এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন, "হে ইসমাঈল ! ভগ্নহৃদয় মানুষের নিকট আমাকে অন্বেষণ কর।" ইসমাইল (আঃ) নিবেদন করলেন, "ইয়া আল্লাহ ! তদ্রূপ লোক কারা ?" উত্তর আসল, "যারা সৎপ্রকৃতির দরিদ্র।" অর্থাৎ যে সমস্ত দরিদ্র লোক নিজের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। হুযুরের আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহতা'আলা ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, দেখত আমার বিশেষ প্রিয় বান্দারা কোথায় ?" ফিরিশ্তাগণ নিবেদন করবে, "ইয়া আল্লাহ ! কারা আপনার প্রিয় বান্দা ?" উত্তর আসবে, "তারা মুসলামান দরিদ্র লোক। যা কিছু পৃথিবীতে আমি তাদেরকে দান করেছি তাতেই তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিল। তাদের সকলকেই বেহেশতে নিয়ে যাও।" আদেশ পাওয়া মাত্র ফিরিশতাগণ তাদেরকে সর্বাগ্রে বেহেশ্তে নিয়ে যাবে। এদিকে আর সকল লোক হিসেব-নিকেশের দায়ে আবদ্ধ থাকবে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন, "পার্থিব ধন সম্পদের উন্নতি দেখে যে ব্যক্তি সন্তুষ্টও আনন্দিত হয় এবং প্রতি মুহূর্তে আয়ু ক্ষয় হয়ে

https://kitabbhubon.com

যাচ্ছে দেখে চিন্তিত ও দুঃখিত না হয়। তার বুদ্ধি বিকৃত হয়েছে বলতে হবে। হায় আফসুস ! সে এতটুকু কথা বুঝে না ? এর মধ্যে কি মঙ্গল থাকতে পারে যে, পার্থিব ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আয়ু প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে।

হযরত আমের ইবনে আবদে কায়স ভাল তরকারীর অভাবে শাক দিয়ে রুটি ভক্ষণ করছিলেন। এক ব্যক্তি হঠাৎ তথায় এসে উপস্থিত হল এবং তাঁকে সামান্য শাক-রুটি পরম তৃপ্তি সহকারে ভোজন করতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "হে আমের ! তুমি পৃথিবীতে এ তুচ্ছ খাদ্যে পরিতৃপ্ত আছ ?" তিনি উত্তর করলেন, "আমি এমন অনেক লোকের বিষয় অবগত আছি, যারা এ অপেক্ষাও অধিক তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট খাদ্যে সন্তুষ্ট আছে।" আগন্তুক লোকটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, তেমন লোক আবার কে ? তিনি উত্তর করলেন, "যারা পরকালের পরিবর্তে দুনিয়া গ্রহণ করেছে, তারা আমার এ সামান্য খাদ্য অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট এবং জগণ্য পদার্থে পরিতৃপ্ত হয়েছে।"

হযরত আবুযার (রাঃ) লোকজনের সঙ্গে বসে ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে বললেন, "তুমি এখানে বসে নিশ্চিত মনে আলাপ করছ ? খোদার কসম, ঘরে খাবার কিছুই নেই। সংগ্রহ করবারও কোন উপায় নেই।" তিনি বললেন, "হে রমনী। ছবর কর, আমাদের সম্মুখে এমন একটি দুর্গম ঘাটি রয়েছে, তা অতিক্রম করতে হলে বোঝাবিশিষ্ট লোক ব্যতীত সে সুর্গম ঘাটি আর কেউই অতিক্রম করতে পারবে না। পতির এ কথা শ্রবনে সৌভাগ্যবতী রমনী সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরে গেল।

তুষ্ট দরিদ্র ও শোকরকারী ধনী লোকের মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় পাঠক ! জেনে রেখ, স্বীয় দরিদ্র অবস্থার ওপর ধৈর্য্যধারনকারী এবং তুষ্ট দরিদ্র লোক আর ধন সম্পদের উপযুক্ত শোকর আদায়কারী ধনী লোক এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তির মর্যাদা অধিক তৎসম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু নির্ভুল সিদ্ধান্ত এই যে, ধৈর্য্যাবলম্বী ও পরিতৃপ্ত দরিদ্রলোকই শ্রেষ্ঠ। তুষ্ট দরিদ্র লোকের ফযীলত সম্বন্ধে যে সমস্ত হাদীছ উপরে বর্ণিত হয়েছে তা থেকেই এ সিদ্ধান্তর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও যদি তুমি শোককারী ধনীলোকের উপর, তুষ্ট

https://kitabbhubon.com

দরিদ্র ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য জানতে চাও, তবে বুঝে লও-প্রকৃত ব্যাপার এ যে, যে বস্তু মানুষকে আল্লাহতা'আলার স্মরণ ও মহব্বত থেকে বিরত রাখে তা নিকৃষ্ট ও জঘন্য। কোন কোন সময় দারিদ্রতা কারও পক্ষে অসহনীয় হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও মহব্বতের পথে বিষম বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। আবার ধন দৌলতও অনেকের পক্ষে উক্ত পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলকথা, অভাব মোচনের পরিমিত ধন একেবারে ধনশুন্যতা অপেক্ষা উত্তম। উক্ত পরিমান ধন কখনও দুনিয়া বলে গণ্য হয় না ; বরং সে পরিমাণ ধনকে পরলোকের পাথেয় বলে বিবেচনা করা হয়। এ কারণেই হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহতা'আলার দরবারে প্রার্থনা করতেন, "ইয়া আল্লাহ্ ! আমার বংশধরবর্গ এবং উম্মতদেরকে অভাব মোচনের পরিমাণ অন্ন-বস্ত্র দান কর।" প্রচুর ধনের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা অভাব মোচনের পরিমাণ ধন হাতে থাকাই শ্রেয়। একথার সত্যতা তখনই উপলব্ধি হবে-যখন ধনী দরিদ্র উভয়ের অবস্থা সন্তুষ্ট কিংবা লোভের ব্যাপারে সমান হবে।

কেননা দরিদ্র ও ধনী উভয়েই যদি লোভী হয়, অর্থাৎ ধর্নোপার্জনে ব্যস্ত থাকে তবে উভয়ের মনই ধনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং উভয়ের হৃদয়ই ধনের মধ্যে সমভাবে নিবদ্ধ থাকে; সুতরাং ধনাসক্তি উভয়েরই সমান। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন ধন লাভে বঞ্চিতে হয়, তখন মানবসুলভ দুর্বলতা বশতঃ তার উদ্যম ভেঙ্গে যায়। ধনোপার্জনে যে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তা সমস্ত নিষ্ফল হওয়ার কারণে হতাশ হৃদয়ে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। বস্তুত ঃ মুছলমানের অন্তরে সংসারের প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তি যত হ্রাস পায় আল্লাহতা'আলার প্রতি মহব্বতও সে হৃদয়ে তত বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র লোক পুনঃ পুনঃ ধনলাভে অকৃতকার্য হতে থাকলে সংসারকে কারাগার সদৃশ কষ্টকর স্থান বলে মনে করে এবং এখান থেকে পারলোক গমন করতে স্বভাবত ঃ তার ইচ্ছে না হলেও দুনিয়া ত্যাগ করবার সময় তার কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে তার মন দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে বরং আল্লাহ তা'আলার প্রতিই ঝুকে পড়বে। পক্ষান্তরের যে সমস্ত আমীর লোক পুনঃ পুনঃ ধনোপার্জনে লাভবান হয়ে এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস উপভোগ করে সংসারের প্রতি অনুরক্ত ও আসক্ত হয়ে পড়েছে, মৃত্যু এসে দ্বারে দন্ডায়মান হলে সংসার ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে মহা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

https://kitabbhubon.com

সুতরাং লোভী দরিদ্রদের এবং লোভী ধনী ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হলে পড়ে, বরং উভয়ের এবাদৎ এবং প্রার্থনার মধ্যে বিশেষ ব্যবধান হয়ে যায়। দরিদ্র লোক এবাদত ও মুনাজাতে যে মিষ্ট স্বাদ উপভোগ করে থাকে ধনী লোকের যেকের, এবাদত ও প্রার্থনা কেবল জিহ্বার অগ্রভাগে এবং অন্তরের বহির্ভাগ থেকে উদয় হয়ে থাকে। মানুষের হৃদয় যে পর্যন্ত আপদ-বিপদের ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ না হয় এবং দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধিভূত না হয় তৎপর্যন্ত সে অন্তরে এবাদত যেকের এবং প্রার্থনার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে না।

এরূপ ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই যদি নিজ নিজ অবস্থার ওপর সমভাবে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে পারে তথাপি উপরোক্ত কারণে দরিদ্র ব্যক্তির অবস্থা ধনী ব্যক্তির অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনোপার্জনের জন্য লোভী হয় এবং ধনী ব্যক্তি উপার্জিত ধনের ওপর পরিতুষ্ট থেকে আল্লাহতা'আলার শোকর গুযারী করে, অর্থাৎ কোন প্রকারে উক্ত ধন সম্পদ তার হস্তচ্যুত হলে সে তাতে বিচলিত বা দুঃখিত না হয়ে পূর্ববৎ আল্লাহতা'আলার শোকর গুযারী করতে থাকে এবং কৃতজ্ঞতা ও পরিতৃপ্তির প্রভাবে তার অন্তর পরিশুদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। ধনের কারণে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আসক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে না। আর এদিকে লোভী দরিদ্রের হৃদয় ধনের লোভে আবদ্ধ হয়ে দূষিত হতে থাকে বটে, কিন্তু নিস্ফল পরিশ্রম ও অর্থাভাব জনিত দুঃখ-কষ্ট ও মানসিক চিন্তা তার হৃদয়কে উক্ত অপবিত্রতা ও দোষ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে থাকে। সুতরাং এতদুভয়ের বাহ্যিক অবস্থা প্রায়ই সমান বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার কতদূর নিকটবর্তী বা দূরবর্তী তা বিচার হবে-দুনিয়ার প্রতি তাদের মহব্বত বা ঘৃণার পরিমাণ দ্বারা। সংসারের প্রতি যার ঘৃণা যত অধিক সে আল্লাহতা'আলার তত নিকটবর্তী। আর সংসারের প্রতি যার অনুরাগ বা আসক্তি যত প্রবল সে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার থেকে তত দূরবর্তী বলে নির্ধারিত হয়। ধনী লোকের হৃদয় যদি ধনাশক্তি বা সংসারাসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকে, ধনের প্রাচুর্য বা অভাব উভয়ই যদি তার নিকট সমান বলে মনে হয়, ধন সম্পদের চিন্তা থেকে তার অন্তর সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, যা কিছু অধিকারে আছে তাতে কেবল মানব জাতির অভাব মোচন করাই উদ্দেশ্য হয়, যেমন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) এর অবস্থা

https://kitabbhubon.com

ছিল। কথিত আছে, একদনি তিনি লক্ষ দেরহাম (রৌপ্য-মুদ্রা) গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। নিজে সেদিন রোজা রেখে ছিলেন, একটি দেরহামও নিজের কাছে রাখেন নি, যদ্বারা কিছু মাংস বা অন্যবিধ কোন খাদ্য দ্রব্য খরিদপূর্বক ইফতার করতে পারতেন। তবে এরূপ ধনী লোকের অবস্থা ও মর্যাদা অবশ্যই লোভী দরিদ্রের অবস্থা অপেক্ষা খুবই উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ হবে। ধনী লোকের হৃদয় তত উন্নত অবস্থায় না পৌঁছিয়ে শুধু ধনের জন্য আল্লাহতা'আলার শোকর করেই ক্ষান্ত হয়, তবে তার অন্তরের ধনাসক্তি জনিত যে ক্ষতি হয়েছিল– এতদ্বারা সে ক্ষতি পূরণ হতে পারে। অপর দিকে লোভী দরিদ্র ব্যক্তির মনে ধনোপার্জনের আকাঙ্খা থেকে যে ক্ষতি উৎপন্ন হয়েছিল তা নিস্ফল পরিশ্রম ও ধনহীনতার দুঃখ-কষ্টের আগুনে পুড়ে পরিষ্কার হওয়া যায়। তখন লোভী দরিদ্রও শোকর গুযার ধনীর মানসিক অবস্থা সমান সমান হয়ে যায়। কিন্তু ধনীর ওপর এক দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে যায় যে, ধন প্রাপ্ত হবে তা দ্বারা ছদকা খয়রাত করা, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোকের সাহায্য করা তাদের কর্তব্য হয়। পক্ষান্তরে দরিদ্রের ওপর তদ্রূপ কোন কর্তব্যই থাকে না। সুতরাং লোভী দরিদ্রের অবস্থা তুষ্ট ও শোকরকারী ধনীর অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রকৃত তুষ্ট দরিদ্র ত্রিবিধ সৌভাগের অধিকারী

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, একদা দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকেরা হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে অভিযোগ পেশ করবার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করল। প্রতিনিধি লোকটি তাদের পক্ষ থেকে হুযুরের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে নিবেদন করল, "ইয়া রছূলাল্লাহ ! ধনী লোকেরাই তো ইহকাল ও পরকালের সমস্ত নেকী লুটে নিচ্ছে। তারা গরীব-দুঃখীদেরকে ছদকা খয়রাত দান করে, যাকাত প্রদান করে, হজ্জ করে, ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। আমরা নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত বলে এ সমস্ত পুণ্য কাজের কিছুই করতে পারছিনা।" হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্রগণের প্রতিনিধিকে পরম সমাদরে সম্মানিত করে বললেন–

مَرْ حَبًا بِكَ وَبِمَنْ جِئْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ

https://kitabbhubon.com

'তোমাকে স্বাগতম এবং তুমি যাদের পক্ষ হতে এসেছ তাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি।" তুমি যাদের নিকট থেকে এসেছ আমি তাদেরকে বড়ই ভালবাসি। তুমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে এক শুভ সংবাদ প্রদান করবে যে, যারা আল্লাহতা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় দারিদ্রতার ওপর ছবর করে এবং ধৈর্য সহকারে কষ্ট সহ্য করে যা তাদের অদৃষ্টে এমন তিনটি সৌভাগ্য নির্ধারিত আছে যা ধনী লোকের ভাগ্যে কখনই ঘটবে না। ১. বেহেশতের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে কতগুলো উজ্জ্বল আলোময় প্রকোষ্ঠ রয়েছে। সাধারণ বেহেশ্তীগণ নিম্নদেশ থেকে সে প্রকোষ্ঠগুলোকে এত উচ্চে দেখবে যেমন ভূ-পৃষ্ঠের লোক আসমানে নক্ষত্ররাশি দেখে থাকে। সে সর্বোচ্চ ও মনোহার প্রকোষ্ঠগুলো কেবল দরিদ্র পরগম্বর, দরিদ্র মুছলমান এবং দরিদ্র শহীদগণই প্রাপ্ত হবেন। ২. দরিদ্র মুছলমানগণ ধনী লোকের পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হবেন। ৩. দরিদ্র লোক যদি শুধু এক বার পড়েন–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহভিন্ন কেউ উপাস্য নেই এবং আল্লাহ অতি মহান আর ধনী লোক উক্ত কালেমা পাঠ করে তৎসঙ্গে দশসহস্র দেরহাম গরীব-দুঃখীদের মধ্যে ছদকা করে দিলেও ধনী লোক দরিদ্রের সমান অবস্থা ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। প্রতিনিধি ফিরে এসে দরিদ্রদেরকে এ শুভ সংবাদ প্রদান করলে তারা সবাই সমস্বরে বলে ওঠল رَضِيْنَا رَضِيْنَا "আমরা সন্তুষ্ট হলাম, আমরা সন্তুষ্ট হলাম।

হযরত রছুলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীছের শেষ ভাগে বলেছেন, "দরিদ্র লোক উপরোক্ত কলেমাটি একবার পাঠ করলে যে মর্যাদা লাভ করতে পারে আমীর লোক তা পাঠ করে সৎসঙ্গে প্রচুর ধন গরীব দুঃখীকে বিতরণ করলেও তদ্রূপ মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এর কারণ নেই যে, আল্লাহর যিকর একটি তাজা বীজতুল্য। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে সংসারাসক্তির আবিল্য থেকে পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং দুঃখ কষ্টে চোট না পেয়ে নিরচ্ছিন্ন সুখ-শান্তির মধ্যে মগ্ন থেকে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়ে যায়। তাতে যেকেরের বীজ বপন করলেও অঙ্কুরিত হতে

https://kitabbhubon.com

পারে না কঠিন প্রস্তরের ওপর পানির ছিঁটা পড়লে তা যেমন ভিতরে প্রবেশ না করে দূরে ছিটকিয়ে পড়ে, তদ্রূপ ধনী লোকের সংসারাসক্তি ও ভোগ-বিলাসের মত্ত কঠিন হৃদয়ে যিকিরের বীজ স্থান না পেয়ে দূরে সরে পড়ে।

ফলকথা, ধনী এবং দরিদ্র উভয়ের অবস্থার পার্থক্য কেবল আল্লাহতা'আলার নৈকট্য লাভের পরিমাণ থেকেই জানা যায়। আল্লাহতা'আলার নৈকট্য তাঁর প্রতি মহব্বত দ্বারাই বুঝা যায় এবং মহব্বতের পরিমাণ তাঁর যিকিরে মশগুল থাকার পরিমান হতে নির্ণয় করা যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর চিন্তা বা মহব্বত থেকে নিজের হৃদয়কে যে পরিমাণ মুক্ত রাখতে পারে, সে ব্যক্তি সে পরিমাণই আল্লাহতা'আলার যিকিরে ও মহব্বতে মশগুল থাকতে সক্ষম হয়। ধনী লোক যত তুষ্ট এবং সহিষ্ণুই হোক না কেন তার হৃদয় কখনও সংসার এবং ধনের আকর্ষণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না। এমতাবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মানসিক অবস্থা কেমন করে সমান হবে ? হয়ত কোন কোন ধনী লোক এরূপ মনে করতে পারে যে, আমি দৌলত পরিবেষ্টিত কেও আমার হৃদয় ধনাসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা আমি ধনের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। ধন-দৌলত আমার হাতে এক দিক থেকে আসে আর একদিক দিয়ে চলে যায়। তার প্রতি কোন আকর্ষন বা আসক্তিই আমার হৃদয়ে উৎপন্ন হতে পারে না। এরূপ মনে করা সেই ধনী ব্যক্তির পক্ষে নিছক একটি ধোঁকা। কেননা ধনাসক্তি এবং সংসারের মোহ মানব মনে এমনভাবে লুকায়িত থাকে যে, মানুষ সহজে তা বুঝে উঠতে পারে না। যে ধনী তার অন্তরে ধনাশক্তি নেই বলে ধারণা করে, সে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলেই নিজের ধারণার সত্যতা বা অসত্যতা নির্ণয় করতে পারে। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) লক্ষ মুদ্রাকে মাটির ন্যায় তুচ্ছ পদার্থ মনের করে অকাতরে বিতরণ করে ফেলেছিলেন। তার হৃদয়ের অবস্থা তত উন্নত কিনা, তেমন তুচ্ছ জ্ঞানে সে হস্তস্থিত সমস্ত ধন নিজের জন্য কপর্দক মাত্র না রেখে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে কিনা, এতটুকু তুলনা করে দেখলেই ধনে তার অনাসক্তি ও ঔদাসীন্যতা আছে কিনা বুঝতে পারবে।

যদি সংসারে অনাসক্ত থেকে ধন-দৌলতের কোন প্রকার মোহ অন্তরে স্থান না দিয়ে ধন সঞ্চয় করা সম্ভব হত, তবে হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কেন দুনিয়াকে এত ভয় করতেন এবং

https://kitabbhubon.com

অপরকেও ধন দৌলত থেকে দূরে সরে থাকার জন্য কেন আদেশ প্রদান করতেন ? পয়গম্বরকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দুনিয়াকে মুর্তিমান হয়ে তাঁর সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখে অবজ্ঞার সাথে বললেন, "আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়, আমার সম্মুখ থেকে দূর হও।"

হযরত ঈছা (আঃ) স্বীয় সংগীদেরকে বলেছেন, "তোমরা সংসারাসক্ত লোকের ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর না। তাদের ধনৈশ্বর্যের ছায়া তোমাদের হৃদয়ে পতিত হলে তোমাদের ঈমানের স্বাদ ও মাধুর্য ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।" তাঁর এ বাণীর তাৎপর্য এই যে, পরের ধন-দৌলতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে ধন-দৌলতের মাধুর্য অন্তরে উৎপন্ন হতে থাকে। তখন আল্লাহ্‌তা'আলার যিকির ও এবাদতের স্বাদ লোপ পেতে থাকে। অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় একাগ্র মনে আর আল্লাহ্‌তা'আলার এবাদতে মশ্‌গুল থাকতে পারে না। কেননা দু'বিপরীত মুখী আসক্তি এক হৃদয়ে স্থান পায় না। ধনাসক্তি হৃদয়ে উদিত হলে আল্লাহতা'আলার মহব্বত আর তথায় টিকিতে পারে না। বিশ্ব-জগতে কেবল দু'প্রকারের পদার্থই বিদ্যমান আছে, আল্লাহ এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় পদার্থ। আল্লাহ ভিন্ন অপরাপর পদার্থের সাথে মনকে যতই নিবদ্ধ করবে, আল্লাহতা'আলা থেকে মনের আকর্ষণ ততই ছুটে যাবে। আবার আল্লাহ ভিন্ন অপরাপর থেকে মন যে পরিমাণে দুরবর্তী হবে সে পরিমাণেই আল্লাহ্‌তা'আলার মহব্বতের স্বাদ উপভোগ করবে। অতএব হে মানব !

غیر حق را مید هی ره در حریم دل چرا

میلشی بر صفمة هستی خط باطل چرا-

"আল্লাহ ভিন্ন অপরাপর পদার্থকে তোমার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশের পরশ কেন দিচ্ছ। "তোমার অস্তিত্বের পটে ভিত্তিহীন অলীকরেখা কেন আঁকছে।"

হযরত আবু সুলায়মান দারনী (রহঃ) বলেছেন, "দরিদ্র লোক কোন বস্তু লাভ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে তা পেতে অক্ষম হয়ে হতাশ মনে

https://kitabbhubon.com

যে দীর্ঘ ও স্নিগ্ধ নিশ্বাস ফেলে তা ধনী লোকের সহস্র বছরের এবাদৎ অপেক্ষা উত্তম।"

হযরত বেশার হাফী কুদ্দিসা সিররুহুর সমীপে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, "হযরত ! বৃহৎ পরিবার পরিজনের ভরন-পোষনের ভার আমার ওপর ন্যস্ত রয়েছে, অথচ আমি নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃসম্বল। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে আমার জন্য প্রার্থনা করুন।" তিনি বললেন, "ভ্রাত ঃ ! যে সময় তোমার পরিবারবর্গ আহার্য এবং পানীয় দ্রব্যের অভাব জ্ঞাপন করবে। তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও তা সংগ্রহ করতে অক্ষম হবে এবং পরিজনবর্গকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে দেখে তোমার হৃদয় ব্যথা ও বেদনায় জর্জতির হয়ে পড়বে, সে সময় তুমি আল্লাহ্তা'আলার দরবারে আমার মঙ্গলের জন্য দো'আ করবে। তোমার তৎকালীন দো'আ আমার দো'আ অপেক্ষা বহুগুনে শ্রেষ্ঠ হবে। আল্লাহতা'আলা ব্যথাতুর হৃদয়ের দো'আ অতীব করুণার সাথে কবুল করে থাকেন।

অভাবের সময় দরিদ্র লোকের প্রতিপাল্য কর্তব্যসমূহ

প্রিয় পাঠক ! জেনে রেখ, অভাবের সময় দরিদ্র লোকের পক্ষে কতিপয় নিয়ম ও কর্তব্য পালন করা আবশ্যক। তন্মধ্যে অভাবের সময় অভাব প্রদানকারী আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও বিধানের ওপর অন্তরের সাথে সন্তুষ্ট থাকা দরিদ্র লোকের প্রথম কর্তব্য। আর নিজের দারিদ্রতার জন্য বাইরে কারও নিকট অভিযোগ বা দুঃখ প্রকাশ না করা দ্বিতীয় কর্তব্য। অভাবগ্রস্থ দরিদ্র লোকের অন্তরের সাধারণত ঃ তিন প্রকার অবস্থার উদ্ভব হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকারের অবস্থা এই যে, অভাবের সময় এক শ্রেণীর দরিদ্র লোক স্বীয় দারিদ্রতাকে আল্লাহতা'আলার স্নেহের অবদান মনে করে নিজের অবস্থার ওপর বিশেষ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, আল্লাহতা'আলা যাদেরকে ভালবাসেন তাদেরকেই অভাব ও দারিদ্রতার মধ্যে নিমগ্ন রাখেন। অতএব দারিদ্রতা প্রদানের জন্য সে আল্লাহতা'আলার অশেষ শোকরগুযারী করতে প্রবৃত্ত হয়। অভাবের সময় দরিদ্র লোকের হৃদয়ে এ শ্রেণীর অবস্থা সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা।

https://kitabbhubon.com

দ্বিতীয় প্রকারের অবস্থা এই যে, আর এক শ্রেণীর দরিদ্র লোক অভাবের সময় স্বীয় অভাব ও দারিদ্রতার জন্য আনন্দিত এবং প্রফুল্ল হয় না বটে; কিন্তু আল্লাহতা'আলার বিধানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। নিজের দারিদ্রতা নিজের হৃদয়ে পীড়াদায়ক এবং অপছন্দনীয় হলেও তজ্জন্য আল্লাহতা'আলার ওপর অসন্তুষ্ট হয় না বরং সন্তুষ্ট থাকে। এর দৃষ্টান্ত চিন্তা করে দেখ, সিঙ্গাদার ডেকে লোকে সিঙ্গা লাগিয়ে শরীরের দুষিত রক্ত বের করে ফেলে। সূক্ষ্ম নরুনের অগ্রভাগ দ্বারা শরীর কেটে সিঙ্গালাগিয়ে উক্ত স্থান থেকে রক্ত টেনে বের করতে যে ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয় মানুষ তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না বটে; কিন্তু তাই বলে সিঙ্গাদারের প্রতি অসন্তুষ্টও হয় না বরং সে কষ্ট প্রদানের পরিনামে যথেষ্ট মঙ্গল রয়েছে ভেবে সিঙ্গাদারের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তদ্রূপ দারিদ্রতা অপছন্দনীয় এবং কষ্টদায়ক হলেও তৎপ্রতি মানুষ সন্তুষ্ট হতে না পারলেও তার পশ্চাতে আল্লাহতা'আলার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সন্তুষ্টই থাকে। অভাবের সময় দারিদ্রতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারা ছোট কথা নয়। এ-ও দরিদ্র লোকের হৃদয়ের প্রশংসনীয় অবস্থা বটে। তৃতীয় প্রকারের অবস্থা এই যে, অভাবের সময় স্বীয় দারিদ্রতার জন্যে আল্লাহতা'আলার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া। তা নিতান্ত জঘন্য অবস্থা ও হারাম। এ পর্যন্ত দরিদ্র লোকদের সর্বদা এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে মনে জাগরুক রাখা কর্তব্য যে, আমাদের জন্য যা কিছু মঙ্গলজনক আল্লাহতা'আলা সর্বদা তা ই করে থাকেন। তাঁর কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বা ঘৃণা করা কারও উচিত নয়। অভাব ও দারিদ্রতার জন্য কারও সম্মুখে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়, বরং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আবরণে স্বীয় দারিদ্রতাকে ঢেকে রাখা উচিত।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছেন, "দারিদ্রতা কোন কোন সময় পারলৌকিক শাস্তি ভোগের কারণ হয়েও থাকে। কর্কশ স্বভাব, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা এবং আল্লাহতা'আলার বিধানের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা তার চিহ্ন। দারিদ্রতা আবার কখনও কখনও পারলৌকিক সৌভাগের কারণও হয়ে থাকে। নম্র স্বভাব, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে দুঃখ বা অভিযোগ না করা, দরিদ্র অবস্থা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহতা'আলার শোকরগুযারী করা তার লক্ষণ। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, নিজের অভাবও দারিদ্রতাকে গোপন রাখা ধনরত্নের একটি পরিপূর্ণ ভান্ডার। অভাবের সময় দরিদ্র লোকের প্রতিপাল্য আরও কতগুলো কর্তব্য এই যে,

https://kitabbhubon.com

ধনবান লোকের সাথে মেলামেশা করবে না। তাদের সামনে নিজকে খাট বলে প্রকাশ করবে না এবং তাদের প্রশংসাবাদ ও তোষামোদ করবে না। হযরত ছুফিয়ান ছওরী রাহেমাল্লাহ বলেছেন, "দরিদ্র লোক যখন আমীর লোকের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে তখন বুঝবে যে, সে রিয়াকার ফকীর। অর্থাৎ কপটাচারী। আর যদি দরিদ্র লোক রাজা বা রাজ পুরুষগণের কাছে যাতায়াত করে, তবে বুঝতে হবে যে, এ ব্যক্তি তস্কর। অভাবের সময় দরিদ্র লোকের আর একটি কর্তব্য এই যে, নিজের ভান্ডারে যা কিছু আছে নিজ প্রয়োজনে সমাধানের খুব টানা-খেছা করে তা থেকে কিছু বাঁচিয়ে সময় সময় অপর অভাবগ্রস্ত লোককে দান করবে। একদা হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন কোন সময় একটি মাত্র মুদ্রা এক লক্ষ মুদ্রার সমতুল্য হয় বরং তদপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে।" উপস্থিত ছাহবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, "ইয়া রছূলুল্লাহ ! ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কিরূপ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ?" হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কোনও দরিদ্র লোকের ভান্ডারে দুটি মাত্র মুদ্রার অধিক কোন ধন থাকে না এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তা হতে একটি মুদ্রা অপর অভাবগ্রস্থকে দান করে ফেলে, তখন তার এ একটি মাত্র মুদ্রা কোন ক্রোড়পতির লক্ষ মুদ্রা আল্লাহর রাস্তায় দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে।

দান গ্রহণের নিয়ম

প্রিয় পাঠক ! দরিদ্র ব্যক্তি যতই অভাবগ্রস্থ হোক না কেন অন্যের প্রদত্ত দান গ্রহণের সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ১. যে দাতা অর্থ উপার্জন বিষয়ে অসদুপায় অবলম্বন করেছে বলে সন্দেহ আছে তার দান কখনই গ্রহণ করবে না। ২. নিজের অভাব মোচনে যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন তার অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না। ৩. যদি কোন দরিদ্র লোক পরের দান গ্রহণপূর্বক অপর দরিদ্র লোকের অভাব মোচনে ব্যয় কর, তবে তার পক্ষে আবশ্যকের অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করা জায়েয আছে, সে ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে দান গ্রহণ পূর্বক অতি সঙ্গোপনে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তা অতিশয় উত্তম কার্য হবে। কিন্তু এ প্রকার কার্য করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। ছিদ্দীক শ্রেণীর মহাপুরুষগণ ব্যতীত সাধারণ

https://kitabbhubon.com

পর্যায়ের কারও পক্ষে তা সম্ভব হয় না। যা হোক অপর দরিদ্রের অভাব মোচনের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন দরিদ্রেই প্রয়োজনাতিরিক্ত দান গ্রহণ করা বৈধ নয়। যদি ধন গ্রহণ করে তার লোভ সংবরণপূর্বক অপর দরিদ্রের অভাব মোচনার্থে ব্যয় করার সম্ভাবনা না থাকে, তবে ধনের মালিক থেকে অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করা উচিত নয়। মালিক নিজেই দান গ্রহণের উপযুক্ত লোক অনুসন্ধানপূর্বক দান করবে। ৪. দান গ্রহণ করবার পূর্বে দাতা কি উদ্দেশ্যে দান করছেন তা জেনে নেয়া আবশ্যক। দাতা হয়ত আন্তরিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'হাদইয়া' অর্থাৎ উপঢৌকন স্বরূপ দান করে থাকেন। কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দরিদ্র লোকের অভাব মোচনার্থে দান করে থাকেন, অথবা লোক সমাজে দাতা বলে খ্যাতি লাভ করার নিয়তে দান করে থাকেন। 'হাদ্ইয়া' বা উপঢৌকন স্বরূপ দান করে থাকলে যদি তাতে উপকার করেছে বলে কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতা স্থাপনের নিয়ত না থাকে, তবে এরূপ 'হাদিয়া' গ্রহণ করা সুন্নত। যদি জানতে পারা যায় যে, উপস্থিত বস্তুর মধ্যে কিয়দংশ কেবল খাঁটি হাদইয়ার নিয়তে আনয়ন করা হয়েছে, তাতে কোন প্রকারের বাধ্য বাধকতা স্থাপনের নিয়ম নেই, আর কিছু অংশের মধ্যে প্রতিদান মূলক বাধ্য-বাধকতার নিয়ত আছে। তবে শুধু আন্তরিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাদইয়া স্বরূপ যে অংশ হাযির করা হয়েছে তাই গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট অংশ প্রত্যাখ্যান করবে।

হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে এক ব্যক্তি কিছু ঘি, পনীর এবং একটি খাসী হাদ্ইয়া স্বরূপ হাযির করলে হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে কেবল ঘৃত ও পনীরটুকু গ্রহণ করে খাসীটি ফেরত দিয়েছিলেন।

হযরত ফতেহ মূছেলীর সমীপে এক ব্যক্তি পঞ্চাশ সহস্র দেরহাম এনেছিলেন। তিনি তা থেকে একটি মাত্র মুদ্রা গ্রহণ করে বাকি সমস্ত মুদ্রাই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, বিনা প্রার্থনায় কেউ কোন দ্রব্য এনে সম্মুখে উপস্থিত করলে যদি তা গ্রহণ করা না হয়, তবে যেন আল্লাহতা'আলার দান প্রত্যাখ্যান করা হয়।" হযরত হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ হতেও এ হাদীছটি বর্ণিত আছে। কিন্তু একদিন কোন এক ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পরিপূর্ণ একটি থলি এবং নানাবিধ রং বেরং-এর অনেকগুলো মূল্যবান বস্ত্র তাঁর সমীপে হাযির করলে

https://kitabbhubon.com

তিনি তার কিছুই গ্রহণ করেননি। বরং বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক শিক্ষার মজলিস স্থাপন করে তজ্জন্য কারও নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করে, কিয়ামতের দিন সে মহাবিচারক আল্লাহকে দেখতে পাবে সত্য, কিন্তু আল্লাহর সমীপে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না।" হযরত হাসার বসরী (রহঃ) সম্ভবত ঃ এই কারণেই উক্ত হাদইয়া দ্রব্যগুলো থেকে কিছু গ্রহণ করেননি যে, আধ্যাত্মিক শিক্ষার মজলিসস্থাপনে তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল পারলৌকিক ছওয়াব লাভ করা। অথবা কারণ এও হতে পারে যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সে ব্যক্তি উক্ত হাদইয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই দিতে এসেছিল। অথচ তিনি এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিনিময়ে মানুষের নিকট কিছু পাবার আশা না রেখে কেবল পরলোকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশাই করেছিলেন। কারও দান গ্রহণ করলে তাঁর সে খাঁটি নিয়ত বিনষ্ট হয়ে পারলৌকিক ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, এ আশঙ্কায়ই তিনি উক্ত লোকটির দান গ্রহণ করেন নি।

কোন এক ব্যক্তি তাঁর জনৈক বন্ধুর নিকট কিছু হাদইয়া নিয়ে উপস্থিত হলে বন্ধু বলেছিল, "ভ্রাত' যদি মনে কর যে, তোমার এ দান গ্রহণ করলে তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, তবে আমি তা গ্রহণ করছি।" হযরত সুফিয়ান সওরী কুদ্দিসা সিররুহু কারও নিকট থেকে কোন দান বা হাদইয়া গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, "আমি যদি বুঝতে পারতাম যে, আমাকে কিছু দান করে এ ব্যক্তি আর কখনও এ দানের কথা মুখে উচ্চারণ করবে না, তবে আমি অবশ্যই তার দান গ্রহণ করতাম। কিন্তু আমি জানি যে, এ ব্যক্তির দান আমি গ্রহণ করলে সে আমার উপকার করেছে বলে গর্বে বুক ফুলাবে এবং তা অপরের নিকট প্রকাশ করে বেড়াবে। কোন এক বুযুর্গ তাঁর বিশেষ ধর্মীয় বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত কারও নিকট থেকে কোন হাদইয়া গ্রহণ করতেন না। বুযুর্গ লোক মাত্রই অপরের দান পূর্বক তার এহসান বা উপকারের বোঝা ঘাড়ে নিতে সম্মত হতেন না। তারা একে বড়ই ভয় করতেন।

হযরত বেশার হাফী রাহেমাহুল্লাহ বলতেন, "আমি হযরত সাররী সক্তী ব্যতীত অপর কারও নিকট কোন সময় কিছু ছওয়াল করিনি। ধন-সম্পদে তাঁর বৈরাগ্যভাব আমার বিশেষভাবে জানা আছে যে, তাঁর হস্ত থেকে ধন বের হয়ে গেলে তিনি বিশেষ সুখীও সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। ৫. রিয়াকারীর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ যারা দান করে, নামের ডঙ্কা বাজাবার ইচ্ছা

https://kitabbhubon.com

করে, তাদের দান গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। কোন এক ধনীলোক একজন সাধু দরবেশকে কিছু অর্থ প্রদান করলে তিনি তার কিছু মাত্র গ্রহণ করে সম্পূর্ণ ধনই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা দেখে উপস্থিত লোকেরা দরবেশের ওপর খুব চটে নানাপ্রকার উক্তি করতে লাগল। দরবেশ বললেন, "দেখ ভাই সকল! দাতার ওপর দয়া করেই আমি তার দান ফেরত দিয়েছি। আমি তার দান গ্রহণ করলে সে লোকের নিকট তার দানের বাহাদুরী প্রকাশ করে বেড়াতে এবং তাতে তার ধনও হস্তচ্যুত হত, দানের পুণ্যও বিনষ্ট হত।" ৬. ছদকার নিয়তে কেউ কোন কিছু দান করতে আসলে, যদি গ্রহণকারী সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে যে, তা কেবলমাত্র গরীব-দুঃখীদের অভাব মোচনের নিয়তে দান করা হচ্ছে, তবে গ্রহণকারী প্রথমে নিজকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে দেখবে যে, সে এরূপ দান গ্রহণের উপযুক্ত কি'না। নিজকে তদ্রূপ অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র বলে বিবেচনা না করলে সে দান কখনই গ্রহণ করবে না। ৭. আবার নিজে তদ্রূপ গ্রহণের উপযোগী হলে কখনই প্রত্যাখ্যান করবে না। হাদীছে শরীফে বর্ণিত আছে, "বিনা প্রার্থনায় যে দান নিয়ে মানুষ তোমার দ্বারে উপস্থিত হয় তাকে স্বয়ং আল্লাহর প্রেরিত রিযিক বলে বিবেচনা করা কর্তব্য।" বুযুর্গগন বলেছিলেন, "মানুষ কারও নিকট অযাচিতভাবে কোন দান নিয়ে আসলে সে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে এমন বিপদে জড়িত হবে যে, কোন দিন যথার্থই অভাবগ্রস্ত হয়েও কারও নিকট কিছু চাইতে গেলে তখন সে বাঞ্ছিত দ্রব্য পাবে না। কেউই তাকে কিছু দিবে না।" হযরত সাররী সক্তী কুদ্দিসা সিররুহু কখনও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রহঃ) নিকট হাদইয়া স্বরূপ কিছু পাঠাতেন, তখনই তিনি তা গ্রহণ না করে ফেরত দিতেন। একদিন হযরত সার্‌রী সক্তী (রহঃ) ইমাম ছাহেবের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আহ্‌মদ ! অযাচিত হাদইয়া প্রত্যাখ্যানের বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করো।" সার্‌রী সক্তী (রঃ) এ বাক্যটি একবার বললে ইমাম সাহেব বলেছিলেন, "অনুগ্রহ পূর্বক আপনার বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করুন।" হযরত সার্‌রী সক্তী (রহঃ) পুনরায় বললেন, "অযাচিত হাদইয়া প্রত্যাখ্যান করার বিপদ থেকে আত্মরক্ষা কর।" তখন ইমাম সাহেব বিশেষ চিন্তার পর উত্তর করলেন, "আচ্ছা ভাই! আজ আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা রেখে দিন। এখনও আমার হাতে এক মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যাদি মওজুদ আছে। এক মাসের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে গেলে অতঃপর আপনার দান সাদরে গ্রহণ করব, আর ফেরত পাঠাব না।

https://kitabbhubon.com

বিনাপ্রয়োজনে কারও নিকট চেয়ে লওয়া হারাম

প্রিয় পাঠক ! অবগত হও, হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যতগুলো ঘৃণেয় এবং নিন্দনীয় কার্য আছে তন্মধ্যে বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা করা একটি জঘন্যতম নিন্দনীয় কার্য। অভাবের তাড়নায় পতিত না হলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বণ করা "হারাম" তিন কারণে ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কার্যের অন্তর্গত হয়।

প্রথম কারণ ঃ নিজের অভাব প্রকাশ করলে বিশ্বপালক আল্লাহর প্রতিপালনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। কারও ভৃত্য যদি অন্যের নিকট কিছু খাদ্য প্রার্থনা করে, তবে এতে বুঝা যায় যে, তার প্রভু তাকে আবশ্যক অনুযায়ী খাদ্য দেয়নি। কাজেই সে অন্যের নিকট খাদ্য ভিক্ষা করছেন। এতে প্রকারন্তরে তার প্রভুর নিন্দা করা হয় এবং প্রভুর বিরুদ্ধে অন্যের নিকট অভিযোগ করা হয়। অবশ্য অভাবে পড়ে এবং নিন্দা বা অভিযোগের গন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ না পায় এমনভাবে চাইলে তা দুষনীয় নয়।

দ্বিতীয় কারণ ঃ লোকের নিকট অভাব জানিয়ে হাত পাতলে নিজকে হেয় ও হীন ও প্রতিপন্ন করা হয়। এক আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও সম্মুখে নিজকে হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করা মুছলমানের উচিৎ নয়। অভাবগ্রস্থ হয়েও নিজকে ভিক্ষাবৃত্তির হেয়তা, হীনতা, নীচতা থেকে বাঁচাবার উপায় এই যে, নিতান্ত অভাবে পড়ে কারও নিকট থেকে কিছু চেয়ে লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ালে যথাসম্ভব নিজের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের অথবা উদারচেতা দয়ালু লোকের নিকট হাত পাতবে। এরা কখনও তাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখবে না বরং একান্ত সহানুভূতি সহকারে তার অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা করবে। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অপর কারও নিকট হাত পাতবে না। তবে নিতান্ত কঠিন অভাবে পতিত হলে এবং বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন ব্যতীত অপর কারও নিকট হাত পাতবে না। তবে নিতান্ত কঠিন অভাবে পতিত হলে এবং বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন না থাকলে অপরের নিকট হাত পাতা যেতে পারে। অভাব তত কঠিন না হলে সাধ্যানুযায়ী হাত পাতা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

তৃতীয় কারণ ঃ কারও নিকট কিছু চাইলে তাকে কষ্ট দেয়া হয়। কেননা যারা আন্তরিক ইচ্ছায় বশীভূত হয়ে দান করে না তাদের নিকট কেউ কিছু চাইলে হয়তো লোকের তিরস্কারের ভয়ে কিংবা চোখ লজ্জায়

https://kitabbhubon.com

অথবা লোক দেখান মনোভাব নিয়ে লোকের প্রশংসা পাবার বাসনায় কিছু দান করতে সম্মত হন। না দিলে লোকে তিরস্কার করবে এ ভয়ে তার অন্তরে বিরাজমান থেকে বিভীষিকা প্রদর্শনে তাকে কিছু দান করতে বাধ্য করে। আবার যশ-খ্যাতির লোভ তাকে মাতোয়ারা করে তোলে। এ দু'প্রবৃত্তি অর্থাৎ তিরস্কারের ভয় এবং যশ খ্যাতির লোভ যেন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রার্থীকে দিয়ে দেয়। পরক্ষণেই হয়তো সে এ বলে অনুতাপ করতে আরম্ভ করে দেয় যে, হায় এত পরিশ্রমের ধন কেন দান করলাম ? কেন বৃথা ধন ক্ষয় করলাম। এতে পরিশেষে তার হৃদয়ে বিশেষ কষ্ট হয়ে থাকে। লোকের তিরস্কারের ভয়ে কিংবা পরে তজ্জন্য অনুশোচনানলে দগ্ধিভূত হয়, তদ্রূপ লোকের নিকট্ সাধ্যানুযায়ী কিছু না চাওয়াই উত্তম। নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় যদি চাইতেই হয়, তবে সোজাসোজি না চেয়ে প্রকারান্তরে চাওয়াই শ্রেয়। তাতে সে প্রার্থীর প্রার্থনা বুঝতে না পারার ভান করে দানজনিত কষ্ট থেকে বাঁচবার সুযোগ পেতে পারে। এরূপ লোককে দান প্রার্থী ইত্যাকার সুযোগ দেয়া উচিত। আর যদি সোজাসোজি ভাষারই চাইতে হয়, তবে উপস্থিত লোকের মধ্যে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য না করে সভাস্থ সকল লোককে সম্বোধন করে নিজের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। এরূপে অনির্দিষ্টভাবে চাইলে কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে বেকায়দায় ফেলে কষ্ট দেয়া হয় না। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও যদি সভার মধ্যে একজন মাত্র ধনবান লোক থাকে এবং উপস্থিত আর সকলেই সে ধনী ব্যক্তির দানের প্রত্যাশী হয়। তবে অনির্দিষ্টভাবে চাইলেও তথায় সে ধনী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয় এবং তজ্জন্য তাকে বেকায়দায় ফেলে কষ্ট প্রদান করা হয়। যার ওপর যাকাৎ ওয়াজেব হয়েছে এরূপ ধনী ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্বক নিজের জন্য না চেয়ে অপর একজন যাকাৎ গ্রহনোপযোগী দরিদ্র ব্যক্তির জন্য যাকাৎ চাইলে যদি সে ধনী ব্যক্তির মনে পূর্বোক্তরূপে কষ্ট হয় তথাপি অপরের জন্য যাকাৎ চাওয়া জায়েয হবে। নিজে স্বয়ং অভাবগ্রস্থ হয়ে অর্থাৎ যাকাৎ গ্রহনোপযোগী দরিদ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যে ধনীর উপর ওয়াজেব হয়েছে তদ্রূপ ধনী ব্যক্তির নিকট সোজাসোজি ভাষায় যাকাৎ নিজের জন্য চাইলেও জায়েয হবে। এতভিন্ন কোন ধনী ব্যক্তিকে লোকনিন্দার ভয়ে, চোখ লজ্জায়, কিংবা ইত্যাকার কোন কারণে দান করলে তা গ্রহণ করা হারাম। কেননা তদ্রূপ দান গ্রহণ করা জোরপূর্বক ছিনিয়ে লওয়ার সমতুল্য।

https://kitabbhubon.com

আমাদের এ কথাটি ফেকাহ শাস্ত্রের ফতোয়ার সাথে মিলবে না। কারণ ফেকাহ শাস্ত্রের বিধানে কেবল মুখের প্রকাশ্য কথার ওপরই নির্ভর করা হয় তদ্রূপ ফতোয়া বা বিধান ইহজগতেই কাজে আসবে পরোলোকের সাথে এর কোন সংশ্রব নেই। এ রাজা বাদশাগণের পার্থিব বিধান, ইহসংসারের কার্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরলোকের বিচার অন্তরের ভাব নিয়ে নিষ্পত্তি করা হবে। সুতরাং মন যখন সাক্ষ্য দিবে যে, দাতা অসন্তুষ্টি সহকারে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে দান করছে। তখন তার সারমর্ম এই যে, কারও নিকট কিছু প্রার্থনা করাই হারাম। তবে কঠিন অভাবে পড়লে প্রয়োজনের চাপে ছওয়াল করা যেতে পারে। আড়ম্বর ও জাঁকজমক বাড়াবার মানসে কিংবা সুন্দর পোশাক অথবা উপাদেয় খাদ্য লাভের নিমিত্ত ভিক্ষা চাওয়া নিতান্তই জঘন্য কাজ। যে সকল ব্যক্তি শ্রমসাধ্য কাজ করতে অক্ষম অথচ একেবারে কপর্দকহীন কোন উপায়ে উপার্জন করবার ক্ষমতাও নেই। তেমন লোকের পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জায়েয। উপার্জনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যার বিদ্যা উপার্জনের লিপ্ত থাকা বশত ঃ কোন উপায়ে ধনোপার্জনের অবসর পায় না, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শ্রমিকের কাজ করে অর্থোপার্জনের অবসর পায় না, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শ্রমিকের কাজ করে অর্থোপার্জনের দিকে গেলে বিদ্যার্জনের বাধা প্রাপ্ত হয়, এরূপ বিদ্যার্থী অর্থাভাবে পতিত হলে ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে নিজের অভাবে ব্যয় করতে পারে। কিন্তু যারা বিদ্যা উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে আল্লাহ্তা'আলার এবাদতে রত আছে তাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই অন্যের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা চাওয়া সঙ্গত নয়; বরং নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যয়াদি নির্বাহের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প শ্রম প্রভৃতি যে কোন হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করা ওয়াজেব। বিদ্যা শিক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষেও প্রথমে অভাব হওয়া মাত্রই অন্যের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা চাওয়া উচিত নয়; বরং অগ্রে নিজের অনাবশ্যক পুস্তকাদি বিক্রয় দ্বারা আহারের সংস্থান করে নিবে। তদ্রূপ অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক জায়নামায, জামা-কাপড় বা অন্য কোন দ্রব্য থাকলে তা বিক্রয় করে আহারের অভাব পুরণ করে নিবে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে এসমস্ত দ্রব্য নিজের নিকট থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট ভিক্ষা চাওয়া হারাম। সাধারণতঃ সকল প্রকার লোকের পক্ষে নিজের বা নিজ পরিবারস্থ লোকের আড়ম্বর ও ধুমধামের সাথে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট ভিক্ষা চাওয়া হারাম।

https://kitabbhubon.com

কি পরিমাণ দ্রব্যের মালিক থাকলে ভিক্ষা চাওয়া নিষিদ্ধ

হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের অধিকারে বিক্রয়োপযোগী কিছু মাত্র সম্বল রেখে ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে, তার মুখ মন্ডলের উপর বিন্দু মাত্র মাংস থাকবে না, কেবল অস্থিই অবশিষ্ট থাকবে।" হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "নিজের অধিকারে বস্তু থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্যের নিকট ভিক্ষা চেয়ে কিছু গ্রহণ করে তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তুই তার জন্য অগ্নি স্বরূপ হবে।" ছাহাবায়ে কেরাম হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে নিবেদন করলেন, "ইয়া রছূলাল্লাহ ! কি পরিমাণ ধনের মালিক থাকলে অপরের নিকট থেকে ভিক্ষা চেয়ে লওয়া জায়েয হয় না ? এর জবাবে হুযূর দু'বার দু'প্রকারের জবাব দিয়েছিলেন, একবার বলেছিলেন, "যার নিকট এক দিনের দু'বেলা খাওয়ার পরিমাণ সংস্থান আছে, তার পক্ষে অন্যের নিকট ভিক্ষা চাওয়া জায়েয নয়।" আর একবার বলেছিলেন, "পঞ্চাশ দেরহাম মূল্যের পরিমাণ দ্রব্য বা পঞ্চাশ দেরহাম মুদ্রা হাতে থাকলে তার পক্ষে ভিক্ষা চেয়ে লওয়া নিষিদ্ধ।" একই প্রশ্নের দু'প্রকার উত্তরের তাৎপর্য এই যে, পঞ্চাশ দেরহাম পরিমাণ রৌপ্য-মুদ্রা হাতে থাকলে এক ব্যক্তির সারা বছরের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে। যে দেশে বছরের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে একবার মাত্র দান খয়রাত বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে সে দেশে অক্ষম ও নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চাশ দেরহাম পরিমাণ মুদ্রা হাতে না থাকলে দান বিতরণের সময় ভিক্ষা চেয়ে পূর্ণ বছরের আবশ্যকীয় পরিমাণ মুদ্রা সংগ্রহ করে লওয়া জায়েয আছে। কেননা এ সারা বছরের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে না নিলে সংবছর ধরেই তাকে অনশনে দিন কাটাতে হবে। আর যে দেশে ভিক্ষুকদের প্রত্যহ ভিক্ষা পাওয়ার উপায় আছে। অতএব তদ্রূপ দেশে দু'বেলার পরিমিত' আহারের ব্যবস্থা না থাকলে অন্যের নিকট থেকে চেয়ে লওয়া জায়েয আছে। শেষোক্ত দেশের একদিন পূর্বোক্ত দেশের এক বছরের সমস্থানীয় বলে ধরা হয়েছে। বস্তুত ঃ মানুষের পক্ষে ত্রিবিধ দ্রব্যের অভাব হয়ে থাকে। ১. অন্ন : ২. বস্ত্র; ৩. বাসগৃহ। হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সংসারে কেবল মাত্র তিনটি দ্রব্যই মানুষের হক বা

https://kitabbhubon.com

প্রাপ্য আছে, আর কোন কিছুতেই তার প্রাপ্য অংশ নেই। ক. দেহ রক্ষার জন্য অন্ন, খ. আবরু (গুপ্তাঙ্গ) ঢাকবার জন্য এবং শীত-গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য বস্ত্র, গ. রোদ ও ঝড়-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাস-গৃহ।" গৃহের যাবতীয় তৈজস পত্রাদিও এর অন্তর্গত। কারও নিকট শীত নিবারণের জন্য 'লেপ' বা রাজাই আর নিজের আরোহনীয় অশ্বের শীত নিবারনের জন্য 'দেহাবরন' থাকলে কম্বল বা শতরঞ্জির জন্য ভিক্ষা চাওয়া জায়েয নয়। পানি রাখার জন্য মাটির কলসী থাকলে পিতলের কলসীর জন্য এবং মাটির বদনা থাকলে কাঁসার বা পিতলের গাড়ু বা বদনার জন্য ভিক্ষা করা অনুচিত। প্রয়োজনের সীমা নির্ণয় করা কঠিন। মানবের আবশ্যকতা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কঠিন অভাবে পড়লে তা মোচন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা ভোগ-বিলাসের জন্য যা কিছুর অভাব হয় তেমন দ্রব্য না হলেও চলে। অতএব যে পর্যন্ত কঠিন অভাব উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত অন্যের নিকট হাত পেতে কিছু চাওয়া উচিত নয়। কেননা ভিক্ষাবৃত্তি বড়ই ঘৃণিত কাজ।

অবস্থা ভেদে দরিদ্রের শ্রেণীবিভাগ

প্রিয় পাঠক। জেনে রেখ, অবস্থা ভেদে দরিদ্র বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। হযরত বেশর হাফী (রহঃ) বলেন, দরিদ্র লোক অবস্থা বিশেষে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর দরিদ্র এরা স্বয়ং কারও নিকট হাত পেতে কিছু যাজ্ঞা করেন না। কেউ উপযাচক হয়ে কিছু দান করতে গেলেও তা গ্রহণ করেন না। এ শ্রেণীর লোকের স্থান 'আলাই ল্লিয়্যীন নামক সর্বোচ্চ বেহেশতে স্বাধীন ও পুণ্যবান আত্মাসমূহের সাথে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দরিদ্র লোক। এরা নিজে অগ্রসর হয়ে কারও নিকট কিছু ভিক্ষা চান না বটে, কিন্তু কেউ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কিছু দান করতে গেলে তা প্রত্যাখ্যান করেন না। এরূপ দরিদ্রগণ ফেরদাউস নামক বেহেশ্‌তে আল্লাহতা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত প্রিয়তম বান্দাগণের সাথে বাস করবেন। তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র। এরা যেমন তেমন অভাবে পড়লে কারও নিকট হাত পাতেন না। তবে নিতান্ত কঠিন অভাবে পতিত হলে অভাব মোচনের পরিমাণ ধনই চেয়ে লয়ে থাকেন। এ শ্রেণীর দরিদ্রগণ 'আছ্‌হাবুল ইয়ামীন' অর্থাৎ যাদের পারলৌকিক পরিত্রান অনিবার্য সুনিশ্চিত তদ্রূপ পুণ্য বান্দাদের সাথে স্বাধীনভাবে বেহেশ্‌তে বাস করবেন।

https://kitabbhubon.com

উচ্চপর্যায়ের দরিদ্র লোকের দৃষ্টান্ত এবং তাদের কারামত

হযরত ইব্‌রাহীম ইবনে অদহাম কুদ্দিসা সিররুহু তার প্রিয় সাথী শকীক (রহঃ) কে বললেন, "হে শকীক! তুমি দেশ-ত্যাগ করে আসবার সময় স্বীয় শহরের দরিদ্র শ্রেণীকে কি অবস্থায় দেখে এসেছ ?" তিনি উত্তর করলেন, "আমি তাদেরকে নিতান্ত ভাল অবস্থায়ই দেখে এসেছি। কোন সময় কিছু পেলে আল্লাহ্‌তা'আলার শোকর আদায়পূর্বক তা ভোগ করে থাকেন এবং না পেলে ছবর করে থাকেন।" এ উত্তর শুনে হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহঃ) বললেন, "আমি বলখ দেশ ত্যাগ করে আসা কালে তথাকার কুকুরগুলোকেও ঠিক এ অবস্থায়ই দেখে এসেছি। তখন হযরত শকীক (রহঃ) বললেন, "আপনার মতে দরিদ্র লোকদেরকে কেমন অবস্থায় থাকা উচিত ?" তিনি বললেন, "আমার বিবেচনায় তাঁরাই সত্যিকারের ফকীর বা দরিদ্র যাঁরা কিছু না পেলেও আল্লাহতা'আলার শোকর গুযারী করেন এবং কিছু পেলে নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে ব্যয় করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সবই অপর 'অভাগগ্রস্ত' দরিদ্র লোকের অভাব মোচনের জন্য দান করে ফেলেন।" একথা শ্রবনে করে হযরত শীকীক (রহঃ) হযরত ইবরাহীম আদহামের (রহঃ) মস্তক চুম্বন পূর্বক বললেন, "আপনার কথাই যথার্থ।" কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, "আমি হযরত আবুল হাসান নূরী রাহেমাহুল্লাকে প্রকাশ্য সড়কের ওপর দু'হাত বিস্তার পূর্বক প্রার্থনা করতে দেখে বিস্ময়ন্বিত হয়ে পড়েছিলাম; আমি এ ব্যাপারটি হযরত জুনাইদ বাগদাদী কুদ্দিসা সিররুহুর সমীপে জ্ঞাপন করলে তিনি বলেছিলেন, "তুমি কখনই মনে করিও না যে, হযরত নূরী (রহঃ) মানুষের নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করতেন, বরং তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য এবং পরলোকে তাদের ছওয়াব প্রাপ্তির জন্য হস্ত প্রসারণ পূর্বক আল্লাহতা'আলার সমীপে প্রার্থনা করে থাকবেন, যাতে ইহলোকে এবং পরলোকে মানুষের মঙ্গল হয় এবং কোন প্রকারেই ক্ষতি তাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে।" এ কথা বলে হযরত জুনাইদ (রহঃ) আমাকে একখানি নিক্তি আনতে আদেশ দিলেন। আমি নিক্তি এনে হাজির করলে তিনি তাদ্বারা স্বহস্তে একশ দেরহাম রৌপ্য-মুদ্রা ওজন করে একটি পাত্রে রেখে দিলেন। অতঃপর তার সাথে বিনা ওজনেও বিনা গণনার কিছু পরিমান মুদ্রা মিশিয়ে আমার হস্তে প্রদান পূর্বক বলেছিলেন, "এ মুদ্রাগুলো হযরত নূরীকে (রহঃ) দিয়ে এস।"

https://kitabbhubon.com

আমি ভেবে বিঘ্নিত হলাম যে, পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য লোকে নিক্তি দ্বারা ওজন করে থাকে। ইনি এক'শ দেরহাম ওজন করাবর পরে বিনা ওযনে তৎসঙ্গে এক মুষ্টি মুদ্রা মিশিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ মুদ্রাগুলোর পরিমাণ অনির্নীত করে ফেললেন কেন ? যা হোক আমি মুদ্রাগুলো হযরত নূরীর (রহঃ) সমীপে নিয়ে হাজির করলাম। তিনি আমাকে একখানি নিক্তি আনবার জন্য আদেশ করলেন, নিক্তি হাজির করা হলে তিনি তদ্বারা একশ দেরহাম হযরত জুনাইদ রাহেমাহুল্লাহকে ফেরত দিও।" অবশিষ্ট মুদ্রাগুলো তিনি নিজের জন্য রেখে দিয়ে বললেন, "বাস্তবিকই হযরত জুনাইদ একজন মহাচতুর লোক, তিনি উভয় পার্শ্ব থেকে রশি জড়িয়ে রেখেছেন।" আমি হযরত নূরীর এ উক্তি শ্রবনে হতভম্ব হয়ে রইলাম। নূরী (রহঃ) যে একশ দেরহাম হযরত জুনাইদ (রহঃ) কে ফেরত দেওয়ার জন্য আমার হস্তে প্রদান করলেন আমি তা নিয়ে হযরত জুনাইদ রাহেমাহুল্লাহর সমীপে স্থাপন করে সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্বিক বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, "আল্লাহতা'আলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করছি, যে পরিমাণ দেরহাম তাঁর জন্য ছিল তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। আর যা আমার জন্য ছিল তা ফেরত দিয়েছেন। আমি উভয় মহোদয়ের কাজ ও উক্তির কোন তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত এর অর্থ কি ? তিনি বললেন, আমার প্রেরিত সমস্ত মুদ্রাগুলোর মধ্য থেকে একশ মুদ্রার ছওয়াব আমি পরকালে পাবার আশায় পাঠিয়েছিলাম। আর অবশিষ্ট মুদ্রাগুলো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্য ব্যতীত কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তোষ ও প্রষন্নতা লাভের আশায় পাঠিয়েছিলেন। যা আল্লাহর ওয়াস্তে বিনা স্বার্থে প্রেরণ করা হয়েছিল কেবল তাই তিনি রেখেছিলেন। আর যে একশ মুদ্রা আমি ব্যক্তিগত স্বার্থের মানসে অর্থাৎ পরকালে পুণ্য প্রাপ্তির আশায় পাঠিয়েছিলেন তা তিনি গ্রহণ না করে ফেরত দিয়েছেন। যা হোক, পূর্বকালের দরিদ্র ও ফকীর লোকগণ এরূপ পূর্ণ গুণবান ছিলেন। এ কারণে তাঁদের অন্তর এত পরিস্কার ও স্বচ্ছ ছিল যে, অপরের হৃদয়স্থিত গোপন মনোভাব ও তাঁরা জানতেন। এখনকার ফকীগণ যদি তত পূর্ণগুণের অধিকারী নাও হতে পারেন, তবে অন্ততঃ তদ্রূপ গুণ লাভের আশাধারী হওয়া উচিত। যদি আশাও করতে না পারেন, তবে এতটুকু বিশ্বাস অন্ততঃ রাখা কর্তব্য যে, দরিদ্র ফকীর দরবেশের ভাগ্যে এমন অলৌকিক গুণ ও ক্ষমতা ঘটতে পারে।

https://kitabbhubon.com

সংসার বৈরাগ্যের পরিচয় এবং তার ফযীলত

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখ, এক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে দারুন পিপাসার সময় পানীয় পানি সুশীতল করবার উদ্দেশ্যে কিছু বরফ সংগ্রহ করেছেন; এমন সময় আর একজন লোক এসে তাকে বলল, দেখ ভাই! আমি তোমাকে এ বরফগুলোর বদলে সম ওজনের স্বর্ণ দিচ্ছি। তুমি তা নিয়ে এ বরফগুলো আমার নিকট বিক্রয় কর। তখন বরফের মালিক অবশ্যই এরূপ কল্পনা করবে যে, বরফ গলনশীল পদার্থ। একটু পরেই গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। রাতের সমাগম পর্যন্ত এর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এর পরিবর্তে যদি চিরস্থায়ী অথচ বরফ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক মূল্যবান স্বর্ণ পাওয়া যায়, তবে তা আজীবন আমার নিকট থাকবে এবং বহুবিধ উপকারে আসবে। এর বিনিময় নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় দ্রব্য খরিদ করে যাবজ্জীবন পরম সুখে দিনাতিপাত করতে পারব। বরফের পানিতে ক্ষণিকের তরে আমার শান্তি হবে বটে; কিন্তু এ ক্ষণস্থায়ী শান্তিটুকুর লালসা ত্যাগ করে এখন উষ্ণ জলে পরিতুষ্ট থাকতে পারলে আজীবন মহাসুখে দিন যাপন করতে পারব। এরূপ চিন্তা করলে বরফ মিশ্রিত ঠান্ডা পানি পান করবার লালসা তার অন্তরে আর স্থান পাবে না। বরফ থেকে উৎকৃষ্ট ও অধিক হিতকর স্বর্ণের আশায় বরফকে পরিত্যাগ করা এবং তার ক্ষণস্থায়ী শান্তির লোভ পরিহার করাকেই যুহ্দ অর্থাৎ বৈরাগ্য বলা হয়। বরফ সম্বন্ধে বরফের মালিক যে কারণেও যে প্রকারে বিরাগী হয়েছিল। সংসার সম্বন্ধেও জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির বৈরাগ্য সে কারণে এবং সেরূপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাঁরা সর্বদাই দেখতে পাচ্ছেন যে, সংসার অনবরত চলে যাচ্ছে, পরমায়ু ও পার্থিব ভোগ বিলাস এবং সুখ-শান্তি সর্বদা হ্রাস পাচ্ছে, এমনকি মৃত্যুর সময় সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। এদিকে পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাঁরা দেখতে পান তা পরিস্কার এবং অটল অচল। মৃত্যু মুহূর্ত থেকে যে পরকাল আরম্ভ হবে তার শেষ নেই। এমতাবস্থায় চিন্তাশীল জ্ঞানী লোকেরা ইহকালের সাথে পরকালের তুলনা করলে ইহকালকে পরকাল অপেক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ ও অপদার্থ বলে বুঝতে পারেন এবং সেই পরকালকে লাভ করার জন্য তাঁরা সন্তুষ্ট চিত্তে ইহলোককে বিলিয়ে দিতে পারেন। ফলকথা, তাঁরা সংসারের প্রতি বিরাগী হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতঃ পরকালকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়ে ধরেন। একেই প্রকৃত যুহ্দ বা বৈরাগ্য বলে।

https://kitabbhubon.com

কেবল সংসারকে পরিত্যাগ করার নামই বৈরাগ্য বা যুহ্দ নয়। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য যুহ্দ নামে পরিচিত হতে হলে সংসার পরিত্যাগের সঙ্গে আরও কতিপয় শর্ত আছে। তন্মধ্যে ১. প্রথম শর্ত এই যে, সংসারে জায়েয বস্তুগুলো থেকে বিরাগী হওয়া। কেননা শরীঅতের নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে পরিত্যাগ করা তো সকলের প্রতিই ওয়াজেব। হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে পরিত্যাগ করা তো সকলের প্রতিই ওয়াজেব। হারাম বা নিষিদ্ধ পদার্থ পরিত্যাগ করার মধ্যে বাহাদুরী কিছুই নেই।

কিন্তু নির্দোষ এবং জায়েয পদার্থগুলোর লোভ সংবরণপূর্বক তা পরিত্যাগ করা অবশ্যই অসীম মানসিক বলের প্রয়োজন। অতএব 'মুবাহ' অর্থাৎ জায়েয পদার্থগুলোর লোভ পরিত্যাগপূর্বক বিরাগী হওয়াকেই প্রকৃত 'যুহদ' বলা যাবে। ২. দ্বিতীয় শর্ত এই যে, সংসারের যাবতীয় ভোগ্য বস্তু ভোগ করার অমোঘ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পরিত্যাগ করা, তবেই তাকে প্রকৃত যাহিদ অর্থাৎ সংসার বিরাগী বলা যাবে। সংসারের ভোগ্য বস্তু ভোগ করার ক্ষমতাই যার নেই, তার সম্বন্ধে সংসার বর্জন করার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা সে ব্যক্তি যা কিছু পরিত্যাগ করছে সেগুলো ভোগ করবার ক্ষমতা নেই বলে পরিত্যাগ করছে। ক্ষমতাধীন এবং আয়ত্তাধীন হওয়া সত্ত্বেও যদি পরিত্যাগ করত, তবে বুঝা যেত যে, অসীম মানসিক বল প্রয়োগে প্রবৃত্তিকে দমন পূর্বক সে ব্যক্তি সংসারের ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করেছে এবং তদবস্থায়ই তাকে প্রকৃত 'যাহিদ' বলা যেত। সংসারের লোভনীয় ও উপভোগ্য বস্তু যে ব্যক্তি কিছুই পায়নি; তাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু দান করলে যদি সে গ্রহণ না করে এবং নির্বিকার মনে তা ত্যাগ করতে পারে তবেই তাকে 'যাহিদ' অর্থাৎ সংসার বিরাগী বলা যেতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ ব্যক্তি লোভনীয় পার্থিব বস্তু হাতে পেয়ে তার লোভ সংবরণপূর্বক পরিত্যাগ করতে পারবে কি না, পরীক্ষা করে না দেখলে বলা যায় না। বিনা পরীক্ষায় তার পরিত্যাগ ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। দুনিয়ার উপভোগ্য পদার্থ হাতে আসলেই মানুষের স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেক লোক হাতে কিছুই নেই বলে উপভোগ করতে পারছে না। হাবভাবে দেখিয়ে থাকে যে, সে সংসার ত্যাগী মহাপুরুষ, কিন্তু কোন বস্তু হস্তগত হওয়া মাত্র মানুষের সে ধোঁকা দূরীভূত

https://kitabbhubon.com

হয়ে যায় এবং দেখতে পায় যে, লোকটি হস্তস্থিত বস্তু মহাসুখে উপভোগ করছে। কাজেই যার কিছু নেই তাকে দুনিয়ার উপভোগ্য কোন পদার্থই দান করে ভালরূপে পরীক্ষা করলেই বুঝা যাবে যে, সংসার ত্যাগের ক্ষমতা তার আছে কি নেই ? হাতে পেয়েও যদি নির্বিকার মনে তা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়, তবে তাকে সংসার বিরাগী বলা যাবে। এ কারণেই যারা আজীবন দরিদ্রাবস্থায় দিন যাপন করছে তাদের সংসার ত্যাগের ক্ষমতা আছে কিনা বলা কঠিন। ৩. তৃতীয় শর্ত হল, ধন সম্পদ বস্তুগত হওয়া মাত্র ব্যয় করে ফেলা, সংরক্ষণের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করা, মান সম্মানেরও কিছুমাত্র পরোয়া না করা, মান সম্মানেরও কিছুমাত্র পরোয়া না করা। কেননা প্রকৃত পরহেয়গার বা সংসারবিরাগী তাঁকেই বলা যাবে যিনি সংসারের সর্বাধিক আনন্দ ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগ পূর্বক তৎবিনিময়ে পরলোকের আনন্দ ও সুখ-শান্তির উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ বিনিময় করনকে প্রকারন্তরে বেচাকেনা বলা যায়। এ ক্রয়বিক্রয় বড়ই লাভজনক। এ মর্মে আল্লাহ্তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔

"আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের বিনিময়ে মুমিন বান্দাগণ হতে তাদের জান এবং মাল খরিদ করে লয়েছেন।" (পারা -১১; সূরা -তাওবা ঃ রুকু -১৪) আল্লাহ আরও বলেন–

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ۔

'তোমরা আল্লাহতা'লা সাথে যে ক্রয়বিক্রয়ের কারবার করেছে তদ্বিষয়ে এ শুভ-সংবাদ গ্রহণ কর যে, এ খরিদ বিক্রিতে তোমরা যথেষ্ট লাভবান হবে।" এ আয়াত দু'টির সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাগণের জান মাল যা গলনশীল বরফের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী তদবিনিময়ে চিরস্থায়ী বেহেশতে মূল্য স্বরূপ প্রদান করবেন। এ বিনিময়ে ব্যবসায়ে তোমাদের প্রভুত কল্যাণ এবং প্রচুর লাভ হবে।

https://kitabbhubon.com

প্রকৃত 'যুহদ' অর্থাৎ বৈরাগ্যের পরিচয়

প্রিয় পাঠক ! জেনে রেখ, যে ব্যক্তি বদান্যতা ও দানশীলতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অথবা পারলৌকিক সৌভাগ্য অন্বেষণ ভিন্ন অপর কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছে তাকে প্রকৃত যাহিদ বা সংসার বিরাগী বলা যাবে না। আবার এও জেনে রেখ যে, কেবল পারলৌকিক শান্তির বিনিময়ে ইহকাল বিক্রয় করা তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের নিকট নিতান্ত দুর্বল ও তুচ্ছ ধরনের 'যুহদ' বা বৈরাগ্য। পূর্ণ ও প্রকৃত 'যাহিদ' সে ব্যক্তিকেই বলা যেতে পারে, যিনি ইহলোকের ভোগ বিলাস এবং সুখ-শান্তি র প্রতি যেমন অমনোযোগী তদ্রূপ পরলোকের চিরস্থায়ী ভোগ বিলাস এবং সুখ শান্তি থেকেও অমনোযোগী। অর্থাৎ তিনি পার্থিব সুখ-শান্তির বিনিময়ে পারলৌকিক শান্তি ভোগ করতেও অনিচ্ছুক। পরলোকে বেহেশতের মধ্যে চোখ, কান, উদর, কামেন্দ্রিয় প্রভৃতির উপভোগ্য বস্তু আছে। সত্যিকারের যাহিদ (সংসার বিরাগী) এ সমুদয় পদার্থকে নিতান্ত তুচ্ছ ও অপদার্থ বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা নিজেদেরকে উদার, কান, চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তু থেকে বহু ঊর্ধ্বে রাখতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত উপভোগ্য বস্তু যাতে ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতুষ্ট হয়ে থাকে তা পশু প্রভৃতি ইতর প্রাণীরাও ভোগ করতে পায়। সুতরাং তাঁরা এসমস্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না; বরং ইহলোকের বিনিময়ে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বেহেশ্‌ত পেতে ইচ্ছুক না হয়ে উভয় জগতের বিনিময়ে কেবলমাত্র আল্লাহতা'আলাকে পেতে চান এবং তাঁরই দর্শন ও পরিচয় লব্ধ আনন্দে পরিতৃপ্ত থাকতে উৎসুক হন। একমাত্র আল্লাহতা'আলার সত্তা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পদার্থই তাঁদের দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ এবং নগণ্য বলে প্রতিপন্ন হয়। আল্লাহ্‌তা'আলার মা'রেফত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে যারা পরিপক্কতা লাভ করেছেন কেবল তাঁরাই এ শ্রেণীর 'য়াহিদ' হতে পারেন। এ শ্রেণীর সংসার বিরাগী লোক সাংসারিক, ধনৈশ্বর্য হতে পলায়ন না করলেও ক্ষতি নেই; বরং তাঁরা মাল-আসবাব পেলেই গ্রহণ করে থাকেন এবং নিজের জন্য কিছু না রেখে যথাসময়ে যথাস্থানে ব্যয় করে ফেলেন এবং উপযুক্ত প্রাপকগণকে দান করে থাকেন। এ শ্রেণীর সংসারত্যাগীর জলন্ত দৃষ্টান্ত হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সসাগরা পৃথিবীর ধনভান্ডার হাতে পেয়েও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেননি। বরং

https://kitabbhubon.com

সমস্ত ধনই অকাতরে উপযুক্ত প্রাপকের মাঝে বিতরণ করে দিয়ে নিজে নিতান্ত নিঃস্ব জীবন যাপন করতেন। আর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) একসঙ্গে লক্ষ মুদ্রা হাতে পেয়েও তা মৃত্তিকার ন্যায় জ্ঞানে অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদের মধ্যে সমস্ত মুদ্রাই বিতরণ করে দিয়েছিলেন। রোযা ইফতারের পর সেদিন নিজের আহারের জন্য একটি মুদ্রা ব্যয়ে সামান্য গোশ্তও খরিদ করেন নি।

যা হোক, তত্ত্বজ্ঞানী মহামানবের হাতে লক্ষ মুদ্রা আসলেও তিনি তার লোভ সংবরণে সত্যিকারের সংসার ত্যাগী হতে পারেন। আর অন্যান্য লোক কপর্দকহীন হয়েও সংসার বিরাগী 'যাহীদ' হতে পারে না। ফল কথা, সংসারের মোহ হতে হৃদয়ে আকর্ষন ছিন্ন করত, তা হতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত থাকাই প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ সংসারের অন্বেষণে ব্যস্ত ও হয়ে পড়বে না কিংবা সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলের দিকে পলায়নও করবে না, সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষনা করে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিকুল আচরণও করবে না কিংবা সন্ধি সুলভ মনোভাব নিয়ে সংসারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেও থাকবে না। সংসারকে লোভনীয় জ্ঞানে ভালও বাসবে না কিংবা বর্জনীয় জ্ঞানে শত্রুও মনে করবে না। কেননা কোন বস্তুকে ভালবাসলে যেমন অন্তর তৎপ্রতি আকৃষ্ট ও লিপ্ত হয়ে পড়ে তদ্রূপ ঘৃণাপূর্বক তাকে ত্যাগ করতে গেলেও মনকে তার চিন্তায় ব্যাপৃত রাখতে হয়। তা হতে মন একেবারে উদাসীন থাকতে পারে না। অথচ আল্লাহতা'আলার সত্তা ভিন্ন অন্যান্য সর্ববিধ পদার্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মনকে নিলিপ্ত ও উদাসীন রাখাই পূর্ণ ও প্রকৃত বৈরাগ্যের চিহ্ন। পূর্ণ সংসারত্যাগী লোকের দৃষ্টিতে পার্থিব ধন সম্পদ নদীর প্রবাহিত পানির ন্যায় এবং নিজের হাত আল্লাহতা'আলার ধন ভান্ডারের ন্যায় বিবেচিত হয়ে থাকে। তাঁর হাতে ধন আসল কি চলে গেল, কি বৃদ্ধি হল, কি কমে গেল, সেদিক হতে তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকতে হবে। এরূপ অবস্থায় ঔদাসীন অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারলে সংসার বৈরাগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু নির্বোধ লোকেরা প্রকৃত বৈরাগ্যের অর্থ বুঝতে না পেরে বিষম ধোঁকায় পতিত হয়। তারা ধনের মোহ দমনপূর্বক তাকে ত্যাগ করতে পারে না। সযত্নে গৃহ মধ্যে রেখে দেয় এবং এরূপ বিবেচনা করে যে, এ ধনের প্রতি আমার কোন মোহ বা আসক্তি নেই। এরূপ লোক ধোঁকার মধ্যে পতিত আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। কোন দরিদ্র লোক এসে যদি

https://kitabbhubon.com

তার ধন কিংবা অপর জনের ধন অথবা নদীর পানি নিয়ে যায় এবং সে সময় যদি উক্ত ধন সঞ্চয়কারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে ঐ ত্রিবিধ ধন হরণের ব্যাপারে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার নির্লিপ্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ তার ধন অপহৃত হল, কি অপরের ধন নিয়ে গেল, না নদীর পানি নিয়ে গেল এ বিষয়ে যদি তার মনে কোন পার্থক্যের উদর না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, লোকটি ঠিক বিবেচনায় আছে, ধোঁকায় পড়েনি। আর যদি সে নিজের ধন, কিংবা অপরের ধন কিংবা নদীর পানি অপহৃত হল বলে পার্থক্য করতে পারল, তবে বুঝবে যে, সে নিজকে সঞ্চিত ধন সম্বন্ধে উদাসীন মনে করে ধোঁকায় পতিত রয়েছে। তার হৃদয়ে ধনের প্রতি বৈরাগ্য জন্মেনি। বরং ধনের প্রতি আসক্তি অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। প্রকৃত কথা এই যে, ধন অধিকারে এসে যথেচ্ছা ভোগের ক্ষমতা হওয়া সত্ত্বেও যদি নির্বিকার চিত্তে ধনের সংস্রব বর্জন পূর্বক তা থেকে পালাতে পারে অর্থাৎ অকাতরে পানির ন্যায় দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করতে কোন প্রকার দ্বিধা সঙ্কোচ না হয়, তবেই বুঝবে যে, প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মেছে এবং ধনের মায়াজাল ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ মুবারক রাহেমাহুল্লাহকে 'ইয়া যাহিদ' অর্থাৎ হে সংসার ত্যাগী মহাপুরুষ! বলে সম্বোধন করলে তিনি তদুত্তরে বলেছিলেন, "আমি যাহিদ বা সংসার বিরাগী নই।" হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয কুদ্দেসা সিররুহু হলেন প্রকৃত সংসার ত্যাগী মহাপুরুষ। কেননা তাঁর হস্তে বিশ্বের সমস্ত ধন ভান্ডার রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে অনায়াসে ও অবাধে তা ভোগ করতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগপূর্বক ফকীরের জীবন যাপন করছেন। তিনি প্রকৃত সংসার ত্যাগী মহা মানব। আমার অধিকারে কোন ধনই নেই। আমি আজীবন দরিদ্র ও নিঃস্ব। আমার তো ধনের মোহ ত্যাগ করতে হয়নি, তবে আমি সংসার ত্যাগী 'যাহিদ' হলাম কিসে ?

আবু লায়লা একদিন ইবনে শীরমাকে বলেছেন, "আবু হানীফা জোলার ছেলে হয়ে আমার প্রদত্ত 'ফতওয়া' রদ করে দিয়েছে।" একথা শ্রবন করে ইবনে শীরমা বললেন, "আবু হানিফা জোলার সন্তান না শরীফ লোকের সন্তান এর মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখছি না। আমি কেবল তাঁর সম্বন্ধে এই মাত্র জানি যে, পার্থিব ধন-সম্পদ তাঁকে জড়িয়ে ধরবার জন্য দৌড়িয়ে আসছে, আর তিনি তা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়ে

https://kitabbhubon.com

পালাচ্ছেন। আর দেখ, দুনিয়া আমাদের থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে। আর আমরা তাকে ধরবার জন্য প্রাণপণে পিছু পিছু দৌড়াচ্ছি।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন– নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন দিন চিন্তাও করিনি যে, আমাদের মধ্যেও সংসারানুরাগী লোকের অস্তিত্ব রয়েছে; আয়াতটি এই–

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ-

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে কতক লোক সংসারকে চায়, আর কতক লোক পরকালকে চায়।" (পারা ৪, সূরা আল এমরান, রুকু ১৬)

এক সময় কতিপয় মুছলমান লোক বলেছিলেন– কোন কাজ আল্লাহতা'আলা ভালবাসেন তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তবে কেবল সে কাজই করতাম।" তম্মুহূর্তে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

لَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ-

অর্থাৎ 'যদি আমি তাদের উপর এ হুকুম লিখে দিতাম যে, তোমরা আত্মহত্যা কর, কিংবা তোমরা জন্মভূমি পরিত্যাগ কর, তবে তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক ভিন্ন কেউই সে আদেশ পালন করত না। (পারা ৫, সূরা নিসা, রুকু ৯)

পরকালের বিনিময়ে সংসার বিক্রয় করতে অনাগ্রহের কারণ ঃ প্রিয় পাঠক ! জেনে রেখ, স্বর্ণের বিনিময়ে বরফ বিক্রয় করা যে একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা, তা বুঝে বরফের পরিবর্তে স্বর্ণ গ্রহণ করা বড় একটা কঠিন কাজ নয়। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তুচ্ছ ও নগণ্য বরফের পরিবর্তে মহামূল্যবান ও দীর্ঘস্থায়ী স্বর্ণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু স্বর্ণের তুলনায় বরফ যত নিকৃষ্ট। পরকালের তুলনায় ইহকালের ভোগ্য পর্দাসমূহ তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক নিকৃষ্ট হলেও মানুষ এ অপদার্থ সংসার ত্যাগ করে তদবিনিময়ে পরমোৎকৃষ্ট পরকাল গ্রহণ করতে আগ্রহ করে না কেন ? এর তিনটি কারণ আছে– ১. ঈমানের দুর্বলতা ; ২. প্রবৃত্তি ও

https://kitabbhubon.com

কামনার প্রাবল্য তা বর্তমানেই একেবারে নগদ উপভোগ করা যায়। কাজেই বাকি পরকালের আশায়নগদ উপভোগের লোভও দমন করতে পারে না। ৩. অলসতা ও দীর্ঘ সূত্রতা। এ কাজটি আজ করব না, আগামী কাল করব, এ লোভনীয় বস্তুটি আজ উপভোগ করে নেই-আগামী কাল ত্যাগ করব। এরূপ মনোভাবকে দীর্ঘসূত্রতা বলা হয়েছে। লোভের প্রাবল্যই এরূপ দীর্ঘ্যসূত্রতার মূল কারণ। লোভনীয় পদার্থ সম্মুখে পেলে তা ভোগ করার জন্য লোভ প্রবল হয়ে ওঠে। উৎপত্তির প্রারম্ভেই তাকে দমন না করে, যদি মনে মনে এরূপ ওয়াদা করে যে, আজ উপভোগ করে লই,আগামী কাল লোভকে দমন করে ফেলব, তবে প্রশ্রয় পেয়ে লোভ দুর্দশনীয় হয়ে ওঠে, পরে মানুষ আর তাকে দমন করতে পারে না। মানুষ সাধারণত ঃ এ লোভের বশবর্তী হয়েই হস্তস্থিত নগদ পার্থিব তুচ্ছ সুখ-শান্তির মোহে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যতের স্থায়ী ও অনাবিল সুখের কথা ভুলে যায়।

'যুহদ' অর্থাৎ সংসার বৈরাগ্যের ফযীলত

প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, সংসারাসক্তির অপকারিতা ও নিন্দার বর্ণনায় যা কিছু বলা হয়েছে, তাকেও সংসার বৈরাগ্যের প্রশংসনীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিনাশকারী দোষসমূহের মধ্যে সংসারের প্রতি বিরাগ ও বিরক্তি একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। সংসারের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণের অপকারিতা সম্বন্ধে কোরআন শরীফে যে সমস্ত আয়াত এবং হাদীছের কিতাবে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত আছে, বৈরাগ্যের ফযীলত সম্বন্ধে উক্ত আয়াত ও হাদীছগুলো আমরা এস্থলে বর্ণনা করব। 'যুহ্দ' অর্থাৎ সংসার বৈরাগ্যের বড় প্রশংসা এই যে, আল্লাহ্ তাকে দিব্য জ্ঞানের অধিকারী প্রকৃত আলেমদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন এবং স্বীয় কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন– বিশ্বকুখ্যাত কৃপণ ধনী কারূণ যখন মহাজাঁক-জমকের সাথে সৈন্য সামন্ত ও ভৃত্য অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রা করে বের হয়েছিল, তখন দর্শকবৃন্দের মধ্যে প্রত্যেকেই আক্ষেপের সাথে বলেছিল– 'হায়! কি মজা হত-যদি আমরা এ আড়ম্বর ও ধনৈশ্বর্যের মালিক হতাম ! তখন কেবল প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ বৈরাগ্যের মাহাত্ম স্মরণে বলেছিলেন– 'যারা ঈমান এনেছে

https://kitabbhubon.com

এবং নেক কাজ করেছে তাদের ভাগ্যে যে ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে তা সংসারের ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা বহুগুনে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট।" আয়াতটি এই–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔

'আর যাদেরকে এল্‌ম প্রদান করা হয়েছে তারা (কারুণের সেই আড়ম্বর দেখে) বলেছিল, " তোমাদের সর্বনাশ হোক, যারা পরলোকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের জন্য আল্লাহতা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ছওয়াব তাদের এ সমস্ত তুচ্ছ ধন-দৌলত ও আড়ম্বর অপেক্ষা বহুগণে শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট।" (পারা ২০ -সূরা কাছাছ ঃ রুকু- ৮) এ কারণেই বুযুর্গগণ বলেছেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত সংসারের প্রতি বিরাগ ও অনাসক্ত থাকতে পারে, তার হৃদয়ে হেকমতের বহু সংখ্যক প্রস্রবন প্রবাহিত হতে থাকে।"

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা যদি পেতে চাও, তবে সংসার ত্যাগী ও সংসার বিরাগী হয়ে থাক।" হযরত হারেসা (রাঃ) হযরত রছূলে মাকবূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিবেদন করেছিলেন, "ইয়া রছূলুল্লাহ্ ! আমি যথার্থ মুমিন হতে পেরেছি।" হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর প্রমাণ কি ?" হযরত হারেসা (রাঃ) নিবেদন করলেন– 'আমার অন্তর দুনিয়ার কুহুক জাল ছিন্ন করে এমনিভাবে পালিয়েছে যে, আমার দৃষ্টিতে স্বর্ণ এবং প্রস্তরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় বস্তুই আমার নিকট সমান তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। বেহেশ্‌ত এবং দোযখকে আমি যেন দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।" হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঈমানের যে অবস্থা তোমার পাওয়া দরকার ছিল, তা তুমি সঠিক পেয়েছে। এখন একে যত্নে রক্ষা কর।' অতঃপর তিনি বললেন–

عَبْدٌ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ এ ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার খাঁটিবান্দা। আল্লাহতা'আলার এর অন্তঃকরণকে আলোকিত ও উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন, আর যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল–

https://kitabbhubon.com

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ-

"আল্লাহতা'আলা যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের ভাব ধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তখন ছাহাবাগণ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ইয়া রছূলাল্লাহ ! এই উন্মুক্ত করা কিরূপ ? হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করেছিলেন, 'তা এক প্রকারের আলো' হৃদয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং তার প্রভাবে হৃদয় উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়ে পড়ে।" ছাহাবাগণ আবার নিবেদন করলেন, "ইয়া রছূলাল্লাহ ! উত্তম আলো হৃদয়ে উৎপন্ন হওয়ার চিহ্ন কি ? তদুওরে হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ' এ অস্থায়ী সংসারের প্রতি মনে উদাসীন ভাব এসে পড়ে। সংসারের কোন কিছুতেই মন আকৃষ্ট হয় না। চিরস্থায়ী পরকালের প্রতি মন ছুটে যায় এবং মৃত্যু আগমনের পূর্বে মৃত্যুর পরবর্তী কালের জন্য সম্বল সংগ্রহে লিপ্ত ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

হযরত রছূলে মাকবূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক দিন বলেছেন– 'হে লোকগণ! শরম ও লজ্জা যেরূপ রাখা উচিত তদ্রূপ শরম ও লজ্জা আল্লাহতা'আলার জন্য কর। ছাহাবাগণ বললেন, "ইয়া রছূলাল্লাহ! যেরূপ লজ্জা আল্লাহ্তা'আলার প্রতি রাখা উচিত আমরা তাঁকে তদ্রূপ লজ্জাই করে থাকি। হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে কেন যে ধন সম্পদ ভোগ করতে পারবে না তা সঞ্চয় কর এবং যে স্থানে থাকতে পারবে না সেখানে বাসগৃহ নির্মাণ কর ?

হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক সময় শুক্রবার দিন জুমআর নামাযের খোৎবা পাঠান্তে বললেন– "যে ব্যক্তি لا اله الا الله অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই। এ বাক্যটি একাগ্র মনে একান্তভাবে বিশ্বাস করে এবং তৎসঙ্গে অন্য কিছু মিশ্রিত না করে তার জন্য বেহেশ্ত সুনিশ্চিত।" এ কথাটি শ্রবন মাত্র হযরত আলী কার্মাল্লাহু ওয়াজহাহু দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন– "ইয়া রছূলাল্লাহ! এর সাথে যে বস্তু মিশ্রিত করা উচিত নয় তার পরিচয় বলে দিন।" তদুত্তরে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তা সংসারাসক্তি এবং সংসারের অন্বেষণ।" এমন অনেক লোক আছে যারা পয়গম্বরের ন্যায় উপদেশবানী আওড়িয়ে থাকে, কিন্তু তাদের আচরণ ধনমদেমও অত্যাচারী

https://kitabbhubon.com

লোকদের মত। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের তথা সংসারের আসক্তি হতে এক আল্লাহভিন্ন কেউ উপাস্য নয়, কথাটির প্রতি স্থির বিশ্বাসকে নিরাপদ ও নিস্কলঙ্ক রাখতে পারে বেহেশতে তার স্থান হবে।

হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, ইহলোকে যারা সংসার বিরাগী তাদের অন্তরের সম্মুখে আল্লাহতা'আলা হেকমতের দ্বার মুক্ত করে দেন। তাদের বাগেন্দ্রিয়কে জ্ঞান গর্ভময় বাক্যের সাথে প্রচলিত করে দেন। সংসারের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির উৎপত্তির কারণ এবং তাদের নিরাময় প্রণালী তাদেরকে শিখিয়ে দেন এবং পরিশেষে তাদেরকে নিরাপদে শান্তির সাথে দুনিয়া থেকে বেহেশ্তের দিকে নিয়ে যান।'

হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ছাহাবাগণসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিপার্শ্বে একটি বিরাট উষ্ট্রের বাথান ছিল। বাথানের উষ্ট্রগুলো খুব হৃষ্টপুষ্ট ও গর্ভবর্তী ছিল। এ জাতীয় উষ্ট্র আরবের এক উৎকৃষ্ট সম্পদ। মূল্যের হিসেবে বহু মূল্যবান ধনও বটে; তদুপরি তারা এদের দুধ পান করে, গোস্ত ভক্ষণ করে এবং পশম বিক্রি করে জীবন ধারণ করে। বাগানটির প্রতি হযরতের ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টি পতিত হতেই তিনি সেদিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। তা দেখে সঙ্গীয় ছাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রছূলাল্লাহ ! এ তো অতি উত্তম ধন। এরদিকে দৃষ্টিপাত করতেই আপনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেন ? তিনি বললেন– 'আল্লাহ্তা'আলা আমাকে পার্থিব ধন সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করে বলেছেন–

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا- لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ- وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى-

'হে রছূল ! আপনি আপনার চোখদ্বয়কে বিস্ফারিত করবেন না সে ধন-সম্পদের প্রতি যা মানব জাতির বহু সম্প্রদায়কে উপভোগের নিমিত্ত এবং পার্থিব জীবনের শোভা- সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য দান করেছি যেন তাদেরকে উক্ত ধনসম্পদ দ্বারা আমি পরীক্ষা করতে পারি। আপনার জন্য আপনার প্রভু যে রিয্ক নির্ধারিত রেখেছেন তা অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। (পারা ১৬, সূরা-ত্বহা, ৮)

https://kitabbhubon.com

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামর সহচরবৃন্দ তার সমীপে নিবেদন করেছিলেনঃ- আপনি আদেশ করলে আমরা আপনার জন্য একখানি গৃহ নির্মাণ করে দেই, আপনি তাতে সুখে শান্তিতে আল্লাহ্তা'আলার এবাদত করতে পারবেন।" তদুওরে তিনি বলেছিলেন– "আচ্ছা যাও, পানির উপরে আমার জন্য একখানি গৃহ নির্মাণ কর। তাঁরা নিবেদন করল– 'হুযুর ! অস্থায়ী পানির ওপরে গৃহ নির্মাণ করা কি সম্ভব হবে ? তিনি বললেন- 'তবে সংসারের ভালবাসা অন্তরে রেখে আল্লাহতা'আলার এবাদৎ করা কেমন করে সম্ভব হবে ?"

রছূলকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন– "যদি আল্লাহ্তা'আলার ভালবাসা পেতে ইচ্ছা কর, তবে সংসার থেকে মনের আকর্ষণ ছিন্ন করে ফেল– আর লোকের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করলে তাদের নিকট যা আছে তা থেকে হস্ত সঙ্কুচিত করে লও।"

আমীরুল মুমিনীন খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) মুসলিম বিশ্বের সমস্ত ধন-ভান্ডারের অধিপতি হয়েও কঠোর দারিদ্রতার সাথে জীবন যাপন করতেন। কোন দিন বা সামান্য আহার জুটত, কোন দিন বা অনাহারে দিন কাটাতেন, শত গ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করতেন। তাঁর দুঃখ ক্লেশ দর্শক করে তাঁর দুহিতা (হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতমা প্রিয়তমা পত্নী) উম্মুল মুমিনীন হযরত আফছা (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন– "বাবাজান ! আপনি মুসলিম জগতের অধিপতি, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রভূত রাজস্ব এবং গণিমতের মাল আপনার হস্তে এসে থাকে। আপনি সমস্ত ধনই দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করে মদীনার দুঃখ দৈন্য দূর করে দিয়েছেন। অথচ আপনি স্বয়ং দারিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। আপনি উক্ত ধনরাশি থেকে কিছু অর্থ গ্রহণ পূর্বক এ জীর্ন শীর্ন ও ছিন্ন বস্ত্রের পরিবর্তে কিছু উত্তম পোষাক প্রস্তুত করে পরিধান করুন। কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য সংগ্রহ পূর্বক পরিবার পরিজনবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আহার করুন। কন্যার এতাদৃশ্য অনুরোধ শ্রবনে হযরত ওমর (রাঃ) একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন– 'বৎস' ! স্বামীর অবস্থা পত্নী অপেক্ষা অধিক আর কেউ জানতে পারে না। হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন যাপনের অবস্থা তুমি খুব ভালরূপেই

https://kitabbhubon.com

অবগত আছ। তোমাকে আল্লাহ্‌তা'আলার শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি – 'বল দেখি তা সত্য কিনা ? হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কয়েক বৎসর রছূলরূপে পৃথিবীতে ছিলেন ততদিন ধরে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ সকাল বেলা তৃপ্তি সহকারে ভোজন করতে পেলে রাতের বেলা উপবাস থাকতেন এবং রাতের বেলা ক্ষুধা নিবারণ পূর্বক আহার করতে পারলে পরদিন পূর্বাহ্ন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। তোমাকে আল্লাহতা'আলার শপ দিয়ে আরও জিজ্ঞেস করছি, খয়বরের বিজয়ের দিন পর্যন্ত বহু বছর ধরে তাঁর গৃহে অগ্নি সংযোগে পাকান কোন খাদ্যই জোটেনি। খোরমা, ছাতু প্রভৃতি ভক্ষণ পূর্বক জীবন যাপন করেছেন। তাও পেট ভরে আহার করার সুযোগ হয়নি। বল দেখি, তা সত্য কিনা ? তোমাকে পুনরায় আল্লাহতা'আলার শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি তা অবগত আছ যে, একদিন কিছু আহার্য দ্রব্য সুন্দর খাঞ্চায় করে তাঁর সম্মুখে স্থাপন করা হলে, তা তাঁর নিকট এতই অপ্রিয় ও অছন্দনীয় হয়েছিল যে, তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তাঁর নির্দেশ ক্রমে আহার্য দ্রব্য খাঞ্চা থেকে নামিয়ে জমিনের ওপর রাখা হয়েছিল। তা সত্য কি না ? তোমাকে আল্লাহতা'আলার শপথ দিয়ে আরও জিজ্ঞেস করছি, তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ, তিনি নিতান্ত সামান্য ও নগণ্য বিছানায় শয়ন করতেন। খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে তদুপর একখানা কম্বলকে দু'ভাজে পেতে তাঁর শস্যা রচনা হত। এক রাতে কম্বল খানা চার ভাঁজে পেতে দেয়ার কারণে বিছানা অপেক্ষাকৃত অধিক নরম হয়ে ছিল। পরদিন প্রত্যুষে তিনি বললেন– অদ্য রজনীতে বিছানা কোমলতা আমাকে নৈশকালীন নফল এবাদৎ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। অতঃপর তোমরা আমার বিছানা পূর্ব্যের দু'ভাগে প্রস্তুত করবে, দু'ভাজের চেয়ে অধিক ভাঁজে আর কখনও বিছিও না। তোমাকে পুনর্বার শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি নিশ্চয়ই জান, তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এক প্রস্থ ভিন্ন অধিক ছিল না যে দিন কাপড় ধৌত করতেন সেদিন হযরত বিলালের (রাঃ) আযান শ্রবন করেও কাপড় না শুকান পর্যন্ত হুজরা শরীফ থেকে বের হতেন না।

তোমাকে আল্লাহতা'আলার শপথ দিয়ে আরও জিজ্ঞেস করছি, তুমি অবশ্যই জান, বনি-জাফর গোত্রের জনৈকা রমনী হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু

https://kitabbhubon.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বস্ত্র বয়ন করে দিত। একবার তিনি তার নিকট একখানা তহবন্দ ও একখানা চাদর বয়ন করে দিবার জন্য ফরমাইশ দিয়েছিলেন। বয়নকারিনী নামাযের পূর্বে একত্রে দু'খানা বস্ত্র দিতে পারবে না অথচ হযরত ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড়ের অভাব, এ বিবেচনায় সে একখানা বস্ত্র বয়ন পূর্বক অগ্রে পাঠিয়ে দিল। হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বস্ত্রের এক প্রান্ত কোমরে পেঁচ দিয়ে পরিধান পূর্বক তা সুতা দ্বারা বেঁধে অপর প্রান্ত চাদর স্বরূপ পিঠের ওপর ফেলে বাইরে এসেছিলেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ত্র তাঁর নিকট ছিল না। তা কি সত্য ? উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ এ সমুদয় ঘটনা আমি অবগত আছি। সমস্ত ঘটনাই সত্য।

হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কঠোর দুঃখ-কষ্টময় জীবন যাপনের কাহিনী স্মরণ পূর্বক তাঁরা পিতা-কন্যা উভয়ে এমন গভীর শোকে রোদন করতে আরম্ভ করলেন যে, শেষ পর্যন্ত উভয়ে মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা লাভের পর হযরত ওমর (রাঃ) বললেন– "আমার পূর্ববতী দু'বন্ধু অর্থাৎ হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যেরূপ দুঃখ-কষ্টময় জীবন যাপন করে গিয়েছেন তদ্রূপ চলতে পারলে আমি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত– তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারব। অন্যথায় আমি পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে যাব। তাঁদের আদর্শ গ্রহণে কঠোর দারিদ্রতা সহকারে জীবন যাপন করে যেন তাঁদের সাথে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারি তাই আমার কর্তব্য,।

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জনৈক ছাহাবী প্রথম শ্রেণীর তাবেঈনগণকে বলেছিলেন– তোমরা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অপেক্ষা বেশি পরিমাণে আল্লাহতা'আলার এবাদৎ করে থাক, কিন্তু তথাপি ছাহাবীগণ তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। এর কারণ এই যে, ছাহাবাগণ সংসারের প্রতি তোমাদের অপেক্ষা অধিক বিরাগী ছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন– সংসার বৈরাগ্যে যুগপৎ মনের শান্তি এবং দেহের আরাম উভয়ই রয়েছে।

https://kitabbhubon.com

সংসার বিরাগী সাধক লোকের দু'রাকাআত নামায মুজতাহেদগণের সারা জীবনের এবাদৎ অপেক্ষা উত্তম। হযরত সাহাল তাসতারী বলেছেন– চার প্রকার পদার্থের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারলে মানুষ খালেছ নিয়তে অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতা'আলার এবাদৎ করতে পারে। অনাহারে থাকার ভয় (২) বিবস্ত্র থাকার ভয়, (৩) নিঃস্বতার ও দারিদ্রতার এবং অপমান ও অপদস্থতার ভয়। এ চতুর্বিধ ভয়ই এবাদতের একনিষ্ঠতা বিনষ্ট করে থাকে।

বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ – প্রিয় পাঠক ! জেনে রেখ, সংসার বৈরাগ্যের তিনটি শ্রেণী আছে – ১. সংসারের সুখ-শান্তি ও ভোগ বিলাস থেকে হস্ত সঙ্কুচিত করেছে বটে; কিন্তু অন্তর এখনও সংসারের দিকে আকৃষ্ট রয়েছে, অথচ মনকে দুনিয়ার আকর্ষন থেকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করছে, তজ্জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রামও করছে। এ শ্রেণীর লোককে মুতাযাহ্হিদ অর্থাৎ সংসার বৈরাগ্য অর্জনের জন্য চেষ্টাকারী বলা যায়। 'যাহদ' ও অর্থাৎ পূর্ণ সংসার বিরাগী বলা যাবে না, কিন্তু সত্যিকারের সংসার বৈরাগ্য লাভের প্রাথমিক পথ এটাই, ২. যারা সংসার থেকে মনের আকর্ষণ ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু সংসার ত্যাগ করতে পেরেছে বলে মনে মনে কল্পনা করছে এবং নিজের সংসার বৈরাগ্যকে একটি বিরাট সাফল্য বলে মনে মনে চিন্তা করছে। এ সকল লোক যাহিদ বা সংসার বিরাগী নাম পাবার যোগ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের বৈরাগ্যের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। ৩. যারা এভাবে সংসার বিরাগী হয়েছে যে, নিজেদের বৈরাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছে। সংসার ত্যাগ করতে পারাকে খুব বড় কাজ বলে মনে করে না; বরং আল্লাহতা'আলাকে পাবার পথে তা সামান্য একটা সোপান্ অতিক্রম করেছে বলে জ্ঞান করে তাদের বৈরাগ্য উন্নত শ্রেণীর।

মধ্যম ও উন্নত শ্রেণীর বৈরাগ্যের তারতম্য

উন্নত শ্রেণীর সংসার বিরাগীর দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করা যেতে পারে– মনে কর, কোন ব্যক্তি এক প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার মন্ত্রিত্ব পাবার প্রত্যাশী হয়ে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতেই সিংহদ্বারে এক ভয়ঙ্কর

https://kitabbhubon.com

কুকুর দেখতে পেল। কুকুর শক্ত করে দ্বার আটকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তখন লোকটি এক চমৎকার কৌশল অবলম্বন করল। নিজের আহারের জন্য সঙ্গে করে রুটি, গোশ্ত যা কিছু এনেছিল সমস্তই কুকুরের সম্মুখে ফেলে দিল। খাদ্য পেয়ে কুকুর তৎক্ষণাৎ দ্বার ছেড়ে দিল। কুকুরের বাধা দূর হওয়াতে লোকটি সহজেই সম্রাটের সম্মুখে পৌঁছে মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করল। এস্থলে বিবেচনা করলে দেখা যায় এ ব্যক্তির দৃষ্টিতে মন্ত্রিত্ব পদের তুলনায় রুটি-গোশ্ত নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ, সে কুকুরকে রুটি- গোশ্ত ফেলে দেয়ার কথা কোন সময় কল্পনায়ও আনবে না। মন্ত্রিত্ব পদের তুলনায় রুটি- গোশ্তের কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

পাঠক ! ভেবে দেখ, সমগ্র বিশ্বসংসার এক লোকমা রুটি-গোশ্ত বৈ আর কিছুই নয়। শয়তান একটি ভয়ানক কুকুর সদৃশ খোদা প্রাপ্তির পথ আটকিয়ে বসে আছে। সংসারের যাবতীয় ভোগ বিলাসের বস্তু রুটি-গোশ্তের ন্যায় শয়তান রূপ কুকুরের সম্মুখে ফেলে দিলে, সে তোমার পরকালের পথ ছেড়ে দিবে। আহারের জন্য সংগৃহীত রুটি-গোশ্ত মন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্তির তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ বটে, কিন্তু তৎতুলনায় পরকালের অনন্ত গৌরব প্রাপ্তির আনন্দের সম্মুখে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের আনন্দ কিছুই নয় বললেই চলে। কেননা পারলৌকিক আনন্দ অনন্ত ও অসীম এবং দুনিয়ার ধন মানের আনন্দ ক্ষণস্থায়ীও নিতান্তই ক্ষণ-ভঙ্গুর। অনন্তও অসীম বস্তুর সাথে ক্ষণস্থায়ী পদার্থের কোন তুলনাই হতে পারে না। এ কারণেই হযরত আবূ ইয়াযীদ বস্তামী কুদ্দিসা সিররূহুর সমীপে এসে কয়েকজন লোক বলেছিল যে, অমুক ব্যক্তি বৈরাগ্য লাভ করেছে বলে প্রকাশ করতেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন বিষয়ে বৈরাগ্য ? লোকেরা নিবেদন করল ঃ সংসার বিষয়ে বৈরাগ্য।' তখন হযরত বস্তামী (রহঃ) বলেছিলেন ঃ সংসার তো কোন পদার্থই না যে, তা থেকে মানুষ বিরাগী হতে পারে। এমন অপদার্থ বস্তু ত্যাগ করতে পারার মধ্যে কি বাহাদুর আছে ? যে বস্তু থেকে বৈরাগ্য লাভ করে আল্লাহতা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে তা কোন বস্তুর মত বস্তু হতে হবে, তবে সে বৈরাগ্যের অবশ্যই বাহাদুরী আছে।

—৫

https://kitabbhubon.com

আকাঙ্খিত দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ

যে উদ্দেশ্যে সংসার বৈরাগ্য অবলম্বন করত সংসারে যাবতীয় সুখ-শান্তি ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করা হয় তার প্রকার ভেদে বৈরাগ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রান লাভের উদ্দেশ্যে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সংসারের যাবতীয় লোভনীয় বস্তুর মোহ পরিত্যাগ করা। তা খোদাভীরু লোকের বৈরাগ্য। হযরত মালেক দীনার একদিন বলেছিলেন– আজ রাতে আমি আল্লাহতা'আলার সমীপে বড় দুঃসাহসিকতার কাজ করে ফেলেছি। আমি মুনাজাত কালে তাঁর নিকট বেহেশত প্রার্থনা করেছিলাম। ২. পরকালের ছওয়াব ও অনন্ত সুখ-শান্তি পাবার আশায় ইহজগতের সর্ববিধ লোভ লালসা পরিত্যাগ করা এ বৈরাগ্যের পশ্চাতে দোযখের শাস্তির ভয়, বেহেশতের সুখ-শান্তির আশা এবং তৎসংঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালার প্রেম এ ত্রিবিধ মানসিক গুণ বিদ্যমান থাকে বলে তা উন্নত শ্রেণীর বৈরাগ্য, আল্লাহতা'আলার অনুকম্পার প্রত্যাশা বান্দাগণের বৈরাগ্য। ৩. এ শ্রেণীর বৈরাগ্যে সংসার বিরাগী ব্যক্তির মনে দোযখের শাস্তির ভয় কিংবা বেহেশতের অনন্ত সুখ-শান্তি লাভের আশা থাকে না। এ বিরাগী কেবল আল্লাহ্তা'আলার প্রেম এমনিভাবে মুগ্ধ থাকে যে, ইহকাল কিংবা পরকাল সম্বন্ধীয় কোন চিন্তা মুহূর্তের জন্য তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় না। খোদাভিন্ন আর যা কিছু আছে, সে সমস্তের সম্বন্ধে কল্পনা করাও তাঁরা লজ্জাকর ও অপমানজনক বলে মনে করেন। তা পূর্ণ উন্নত শ্রেণীর বৈরাগ্য। আল্লাহগত প্রাণ হযরত রাবেয়া বছরী রাহেমাল্লাহুকে একদিন লোকে বেহেশ্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন– ال جاد ثم الادار গৃহের কল্পনা অপেক্ষা গৃহস্বামীর কল্পনা করাই শ্রেয়। আল্লাহতা'আলার প্রেমাস্বাদনে যে অনুপম আনন্দ পাওয়া যায়, বেহেশতের সুখ-শান্তি লাভের আনন্দ তার সম্মুখে কিছুই নয়। সংসার বিরাগী লোকেরাই সে অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার প্রেমের আস্বাদন পেয়েছে তাঁর দৃষ্টিতে বেহেশ্তের সুখাস্বাদনের তুলনা এরূপ যেমন– বাদশাহী কাজে বাদশাহের আনন্দের তুলনায় পাখি নিয়ে বালক-বালিকাদের ক্রীড়া করার আনন্দ। বালক-বালিকারা বাদশাহীর কাজ

https://kitabbhubon.com

অপেক্ষা পাখি নিয়ে খেলাধুলা করতেই অধিক আনন্দ পেয়ে থাকে। কেননা তাদের বুদ্ধি অপূর্ণ, এখনও পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেনি বলে তারা বাদশাহী কাজের আনন্দ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান রাখে না। এরূপে যারা আল্লাহতা'আলার দর্শন ভিন্ন অন্য কিছুতে আনন্দ পায়, বুঝতে হবে যে, তাদের বুদ্ধি এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি, তারা এখনও অবোধ বালক-বালিকাদের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে–বয়স্ক এবং পূর্ণ জ্ঞানবান লোকের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি।

পরিত্যাজ্য বস্তুর প্রকারভেদে বৈরাগ্যের শ্রেণী বিভাগ

ওপরে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রকারভেদে বৈরাগ্যের তিন শ্রেণী দেখান হয়েছে। পরিত্যাজ্য বস্তুর প্রকার ভেদেও বৈরাগ্যের বহু শ্রেণী আছে যে বস্তু পরিত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করা হয় তার গুরুত্ব লঘুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বৈরাগ্য বহু প্রকারের হয়। কেউ বা সংসারের কিয়ংদশ কেউ বা অধিকাংশ পরিত্যাগ করে থাকে, কিন্তু পূর্ণ ও পরিপক্ক বৈরাগ্য এ যে, পদার্থের প্রতি প্রবৃত্তি কিছুমাত্র ঝোঁক টের পাওয়া যায় তাতে আবশ্যকতা কিছুই নেই এবং ধর্ম পথেও তার প্রয়োজনীয়তা নেই; নিশ্চয়ই তা পরিত্যাগ করবে। ধনমান খাওয়াপরা বাক্যালাপ, নিন্দা, জন সমাজে উঠা-বসা, শিক্ষাদান ওয়াযের মসলিস অনুষ্ঠান, হাদীছ বর্ণনা করা প্রভৃতি কাজে প্রবৃত্তির টান আছে এবং মানব মন এতে আনন্দ পেয়ে থাকে। যে পদার্থের প্রতি প্রবৃত্তির টান থাকে তাকেই দুনিয়া বলা যায়, কিন্তু এত মধ্যে কতকগুলো কাজ, মানব জাতির বিশেষ উপকার সাধন করে থাকে। যথা– শিক্ষাদান, ওয়ায অনুষ্ঠান, হাদীছ বর্ণনা করা ইত্যাদি। এ জাতীয় কাজগুলোতে যদি প্রবৃত্তির আকাঙ্খা মিটান উদ্দেশ্য না হয়ে কেবল লোকদেরকে আল্লাহতা'আলার পথের দিকে আকর্ষন করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে এ কাজগুলো সংসরের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রবৃত্তির আকাঙ্খা মিটান যথা যশখ্যাতি অর্জন ও বাহাদুরী প্রদর্শন প্রভৃতি উদ্দেশ্য হলে এ মহৎ কাজগুলোও দুনিয়া নামক পদার্থের অন্তর্গত হবে।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী বলেছেন ঃ যূহদ অর্থাৎ সংসার বৈরাগ্যের পরিচয়সূত্র সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক প্রকার বিশ্লেষণ শ্রবন করেছি কিন্তু, আমার মতে যে বস্তু মানুষকে আল্লাহতা'আলার পথ থেকে

https://kitabbhubon.com

বহুদূরে সরিয়ে নেয়, তা পরিত্যাগ করার নামই যূহদ বা সংসার বৈরাগ্য। তিনি আরও বলেছেন– যারা কাম প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা পরিবারের শোভা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিয়ে করে পত্নীর মনস্তুষ্টি সাধনে মগ্ন হয় কিংবা দেশ বিদেশের বিচিত্র দৃশ্যাবলি দর্শন করবার নিমিত্ত ভ্রমনে বের হয় অথবা স্বীয় জ্ঞান-গরিমা প্রকাশের জন্য হাদীছ লিখার কাজে প্রবৃত্ত হয় তারা সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

আবু ছুলাইমান দারানী রাহেমাহুল্লাহরই সমীপে লোকে জিজ্ঞেস করেছিল, আল্লাহতা'আলা যে বলেন– إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার সমীপে ছালীম হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হয়, সে ব্যতীত অন্য কেউই পরিত্রান পাবে না। (পারা-১৯ ঃ সূরা- শোয়ারা ঃ রুকু ৫) কেমন হৃদয়কে ছালীম হৃদয় বলা যাবে ? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে হৃদয়ে আল্লাহতা'আলা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের স্থান নেই সে হৃদয়কেই 'ছালীম' অর্থাৎ নিখুঁত ও সুস্থ হৃদয় বলা যাবে।

হযরত যাকারিয়া নবী (আঃ) এর পুত্র হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) পাটজাত চট পরিধান করতেন। সুতীবস্ত্রের কোমল ও মিহিনতা স্পর্শ তাঁর শরীরকে আরাম প্রিয় করে তুলবে। এ ভয়েই তিনি কর্কশ ছালার চট পরতেন। কর্কশ ছালার ঘর্ষণে তাঁর দেহের কয়েক স্থানে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। পুত্রের এহেন কঠোর সাধনার কষ্ট দর্শনে তাঁর স্নেহ পরায়না মাতা তাকে চটের পরিবর্তে পশমী বস্ত্র পরিধান করতে অনুরোধ করলেন। মাতৃ অনুরোধে একদিন তিনি পশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তৎক্ষনাৎ তাঁর প্রতি ওহী আসল ঃ 'হে ইয়াহ্ইয়া ! তুমি আমাকে ত্যাগ করে দুনিয়া অবলম্বন করলে ?" এ কঠোর সাবধান বাণী শ্রবণে তিনি অনুতপ্ত হয়ে একান্তভাবে রোদন করলেন। তৎক্ষণাৎ পশমী বস্ত্র খুলে ফেলে পূর্ববৎ ছালার চট পরলেন। প্রিয় পাঠক ! জেনে রেখ, প্রবৃত্তির আকাঙ্খিত এবং সুখদায়ক সর্ববিধ বস্ত্র পরিত্যাগ করা চরম উন্নত পর্যায়ের বৈরাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারের মোহ ও লোভনীয় পদার্থ যে পরিমাণে বর্জন করতে সক্ষম হয় বৈরাগ্যের ব্যাপারে সে ব্যক্তি সে পরিমাণে উন্নতি লাভ করতে পারে।

https://kitabbhubon.com

পাপের কালিমা যেমন হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে তদ্রূপ সংসারের মোহ এবং লোভনীয় পদার্থের আকর্ষন হৃদয়কে আল্লাহ্তা'আলার স্মরণ ও ধ্যান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করলে যেমন পাপ জনিত ক্ষতি পুরন হয়ে থাকে, তদ্রূপ সংসারের মায়া ও লোভনীয় বস্তু পরিত্যাগ দ্বারা সংসারের প্রতি আসক্তি জনিত আত্মার ক্ষতি সংশোধিত হয়ে থাকে। জীবনের সর্ববিধ পাপ থেকে এক যোগে তওবা না করে আংশিকভাবে কতক পাপ থেকে তওবা করলে যেমন বিফল হয় না; বরং যে পরিমাণ পাপ থেকে তওবা করা হল সে পরিমাণ ক্ষতি পুরণ হল। এরূপে সংসারের যাবতীয় লোভনীয় পদার্থকে একবারে বর্জন না করে যদি আংশিকভাবে লোভনীয় ও আনন্দদায়ক পদার্থকে পরিত্যাগ করা হয়, তবে সে পরিমানেই বৈরাগ্য লাভ হল। ফল কথা এই যে, পাপরাশির কতকাংশ থেকে তওবা করাও যেমন জায়েয তদ্রূপ সংসারের সুখ-প্রদত্ত আনন্দদায়ক পদার্থসমূহের কতকাংশ বর্জন করাও জায়েয। এ জায়েয থাকার তাৎপর্য এই যে, আংশিক তওবা করলেও বিফলে যাবে না এবং আংশিকভাবে সংসারের লোভনীয় পদার্থ বর্জন করলেও তা ছওয়াব শূন্য হবে না। কিন্তু তওবাকারী ও সংসার বিরাগীদের জন্য দয়াময় আল্লাহতা'আলা পরলোকে যে মহান মর্যাদা ও উচ্চ গৌরব প্রদানের ওয়াদা করেছেন, তা কেবল সারা জীবনের যাবতীয় পাপ থেকে তওবাকারীদের জন্য এবং সংসারের সর্ববিধ আনন্দদায়ক ও লোভনীয় পদার্থ পরিত্যাগকারীদের জন্যই অবধারিত। আংশিক পাপ থেকে তওবাকারী এবং আংশিকভাবে সংসারে আনন্দদায়ক পদার্থ পরিত্যাগকারীরা সে মহান মর্যাদা প্রাপ্ত হবে না।

সংসার বিরাগীদের পক্ষে সংসারের যে সমস্ত দ্রব্যে পরিতৃপ্ত থাকা উচিত তৎসমূদয়ের বিস্তৃত বিবরণ

প্রিয় পাঠক ! অবগত হও, মানবজাতি সংসাররূপে জেলখানায় এসে বন্দী হয়ে পড়েছে। এ জেলখানার আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের অন্ত নেই। মানব জাতিকে এ বন্দীখানায় অবস্থানকালে অসংখ্য বিপদ-আপদ ভোগ করতে হয়। উক্ত বিপদরাশির মধ্যে জীবন যাপনের জন্য মানব জাতীয় বিশেষ করে ছয় প্রকার দ্রব্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। ১. অন্ন বা আহার্য দ্রব্য; ২. পরিধেয় বস্ত্র; ৩. বাসগৃহ, ৪. গৃহের আসবাবপত্র; ৫. পত্নী, ৬.

https://kitabbhubon.com

ঐশ্বর্য ও সম্মান। সাংসারিক জীবনে এ ষড়বিধ পদার্থ মানবজাতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়ও একান্ত আবশ্যকীয়।

প্রথম প্রকারের আবশ্যকীয় পদার্থ অন্ন বা আহার্য ঃ আহার্য দ্রব্য রকম, পরিমাণ ও সঙ্গীয় ব্যঞ্জনাদির পরিপ্রেক্ষিতে আহার্য দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হয়। রকমের মধ্যে নিকৃষ্ট রকমের খাদ্য তাই যাতে কেবল জীবন ধারন বা দেহ রক্ষার উপযোগী খাদ্য প্রাণ আছে; সুখপ্রদ বা লোভনীয় কিছু নেই। যেমন– খুদ কুড়া ভুষি প্রভৃতির মধ্যে খাদ্যপ্রাণ আছে বলে বিভিন্ন প্রকারের পশু পাখী তা খেয়ে জীবন ধারন করে থাকে। কিন্তু মানুষের জন্য তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য। যব, বাজরা, চিনা, কাউন প্রভৃতি মাধ্যমে শ্রেণীর খাদ্য এবং চালুনী দ্বারা চালা নয় এমন গমের আটা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য। মোটা চালকেও এ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। যারা চালা গমের আটা, ময়দা, সুজী, চিকন চালের অন্ন আহার করে তারা সংসার বিরাগী নামের উপযুক্ত নয়। তাদেরকে শরীরসেবী এবং আরাম প্রিয় বলে আখ্যায়িত করা যায়।

যে ব্যক্তি যত নিম্নমানের খাদ্যে পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন তিনি ততোধিক যাহিদ বা সংসার বিরাগী হতে পারেন।

যাহিদ লোকের আহার্য দ্রব্যের পরিমান সম্বন্ধেও তিনটি স্তর আছে। সর্বনিম্ন পরিমাণ দৈনিক আনুমানিক এক পোয়া ; মধ্যম শ্রেণীর পরিমান দৈনিক অর্ধসের এবং সর্বোচ্চ পরিমান দৈনিক কাঁচি সেরের এক সের। যাঁরা এতন্মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমান আহার গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা সাধারণ পর্যায়ের সংসার বিরাগী। শরীঅতের বিধানে সংসার বিরাগী যাহিদগণের জন্য উপরোক্ত হারে পরিমান নির্ধারিত আছে। সর্বোচ্চ পরিমান অপেক্ষা অধিক ভোজনকারিগণ যাহিদ নামের যোগ্য নয়। তাদেরকে উদরসেবী এবং আরামপ্রিয় বলে আখ্যায়িত করা যাবে। ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করে রাখা সম্বন্ধেও যাহিদগণের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে। এক বেলায় ক্ষুধা নিবারণের পরিমান আহার্য সঞ্চয় করে রাখা উন্নত শ্রেণীর বৈরাগ্য বা পরহেযগারী বলে গণ্য হবে। তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করে রাখলে উন্নতস্তরের যাহিদ বা পরহেযগার থাকবে না। এর কারণ এই যে, সংসারের বেঁচে থাকার আশাকে ক্ষুদ্রও খাট করা থেকেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাবের উৎপত্তি হয়ে থাকে। আর আশা কামনাকে দীর্ঘ করা

https://kitabbhubon.com

থেকেই সংসারের প্রতি লোভও কামনা জন্মলাভ করে থাকে। ত্রিশ দিন থেকে চল্লিশ দিনের পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখা মধ্যম শ্রেণীর যুহদ বা বৈরাগ্য বলে ধরা হবে। আর সর্বনিম্ন পর্যায় যুহদ এক বছরের আহারের পরিমাণ খাদ্য সঞ্চয় করা। এক বছরের অতিরিক্ত কালের জন্য খাদ্যদ্রব্য হাতে সঞ্চয় করে রাখলে সে ব্যক্তি যুহদ অর্থাৎ সংসার বৈরাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি এক বছরের অধিককাল বেচে থাকার আশা পোষণ করবে তা থেকে বৈরাগ্যের আশা করা যেতে পারে না।

হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবারবর্গের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয়পূর্বক তাঁদের হাতে সমর্পণ করতেন। কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ক্ষুদার যন্ত্রনা সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি নিজের জন্য রাতের আহার্য্যও দিবসে সংগ্রহ করে রাখতেন না। রুটি বা অন্যের সঙ্গীয় ব্যঞ্জনাদি সম্বন্ধেও তিনটি স্তর আছে। সির্কা ও শাক নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর ব্যঞ্জন। তেল বা তেল পক্ক দ্রব্য মধ্যম শ্রেণীর ব্যঞ্জন। গোশ্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যঞ্জন ও প্রবৃত্তির বিশেষ লোভনীয় খাদ্য। অবিরতভাবে গোশ্ত ভক্ষণ করতে থাকলে যুহদ অর্থাৎ বৈরাগ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। সপ্তাহে ২/১ বার গোশ্ত ভক্ষন করলে বৈরাগ্য সমূলে বিনষ্ট হয় না।

সংসারত্যাগী যাহিদকে আহারের সময় সংযত হওয়া আবশ্যক। দিবা রাত্রের মধ্যে একবারের অধিক আহার করা সঙ্গত নয়। দু'দিনের এক সন্ধ্যা আহার গ্রহণ করাই পূর্ণ বৈরাগ্য। একদিন দু'বার আহার করলে বৈরাগ্য থাকে না। 'যুহদ' অর্থাৎ সংসার বৈরাগ্যের প্রকৃত অবস্থা জানতে ইচ্ছা করলে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের জীবন যাপনের অবস্থা উত্তমরূপে জেনে লওয়া কর্তব্য। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন– হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পারিবারিক জীবনের অবস্থা কখনো কখনো এমন হত যে, ক্রমাগত চল্লিশ দিন ধরে তেলের অভাবে তাঁর গৃহে রাতের বেলা প্রদীপ জ্বলত না এবং খোরমা ও পানি ব্যতীত অন্যবিধ কোন পাকান খাদ্য আহার করতে পাওয়া যেত না।

https://kitabbhubon.com

হযরত ঈছা (আঃ) বলেছিলেন– যে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত লাভের প্রত্যাশা করে তার পক্ষে যবের রুটি ভক্ষন করতঃ শিয়াল-কুকুরের ন্যায় আবর্জনা স্তুপে শয়ন করেই পরিতৃপ্ত থাকা উচিত। তিনি স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলতেন যবের রুটি এবং শাক-তরকারি ভক্ষণ কর, গমের রুটির কাছেও ঘেষনা। তদ্রূপ উন্নত স্তরের খাদ্য ভক্ষন করে তোমরা তার জন্য আল্লাহতা'আলার নিকট যথোচিত শোকরগুযারী করতে সক্ষম হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের আবশ্যকীয় দ্রব্য পরিধেয় বস্ত্র ঃ কিরূপ বস্ত্রে পরিতৃপ্ত থাকা সংসারত্যাগী যাহিদগণের কর্তব্য এস্থলে তাই বর্ণনা করা হবে। সংসারবিরাগী লোককে মাত্র একখানা বস্ত্রের ওপর পরিতৃপ্ত থাকতে হয়, তদপেক্ষা অধিক বস্তু রাখা উচিত নয়। এমনকি সে একখানা মাত্র বস্ত্র ধুবার সময় বিবস্ত্র হতে হলেও ক্ষতি নেই। একাধিক বস্ত্র পরিধান করলে সে ব্যক্তি সংসার ত্যাগী যাহিদ বলে গণ্য হবে না। সাধারণ শ্রেণীর যাহিদের জন্য সংক্ষিপ্ততম পরিচ্ছদ একটা লম্বা পিরহান একটা টুপী ও এক জোড়া জুতা, তৎসঙ্গে একটা পায়জামা ও একটা পাগড়ি হলে তা পূর্ণ পরিচ্ছেদ পরিণত হবে।

পরিধেয় বস্ত্রের রকম– চট বা ছালার চট নিতান্ত সামান্য ধরনের পরিচ্ছদ, পশমী কম্বল বা মোটা পশমী বস্ত্র মধ্যম শ্রেণীর পোশাক, সুতীর মোটা বস্ত্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পোশাক। এ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচ্ছদ পরিধান করলেও নিকৃষ্ট পর্যায়ের সংসারত্যাগী বলে পরিচিত হবে। কিন্তু মিহিন ও কোমল বস্ত্র ইচ্ছাপূর্বক পরিধান করলে সে ব্যক্তি সংসারত্যাগী বা পরহেযগার শ্রেণী হতে বহিস্কৃত হবে।

হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবলীলা সংবরণ করলে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশ ছিদ্দীকা (রাঃ) একখানা সূতীর মোটা তহবন্দ ও একখানা পশমী কম্বল বের করে বলেছিলেন এই রছূলকুল শিরোমনি হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাকুল্য পোশাক। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে- যে পোশাক পরিধান করলো তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তৎসম্বন্ধে লোক পরস্পর বলাবাল্য করতে আরম্ভ করে। তা আল্লাহতা'আলার দৃষ্টিতে এত ঘৃনিত যে, আল্লাহতা'আলার কোন প্রিয় পাত্র তা পরিধান করলেও খুলে না ফেলা পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা তার প্রতি অসন্তষ্ট থাকেন। হযরত রছূলে মাকবুল

https://kitabbhubon.com

ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিধেয় বস্ত্র দু'খানির অর্থাৎ একমাত্র তহবন্দ ও কম্বলের মোট মূল্য দশ দেরহামের অধিক হত না। ছিড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক দিন পর্যন্ত না ধোবার ফলে বস্ত্রদ্বয় এত ময়লা হয়ে যেত যে, দর্শক তা তেলীর বস্ত্র বলে ভুল করে বসত।

একবার কোন এক ব্যক্তি হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একখানা বুটাদার বস্ত্র হাদিয়া স্বরূপ দান করলেন। তিনি তা গ্রহণপূর্বক পরিধানও করেছিলেন। কিন্তু বস্ত্রের নক্শার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি তা নিজের পবিত্র দেহ থেকে উম্মোচন পূর্বক জনৈক ছাহাবীকে বললেন– তা আবূ হুহাইমকে প্রদান করত তার কম্বল খানা আমার জন্য নিয়ে এস। এ বস্ত্রের নক্শা আমার চোখকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করে ফেলেছে।

একবার রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাদুকা মোবারকে পুরাতন ফিতা বদলিয়ে নতুন ফিতা লাগান হয়েছিল। ক্ষণকাল পরেই তিনি তা খুলে ফেলে পূর্বের সেই পুরাতন ফিতাগাছি লাগাবার জন্য আদেশ করে বলেছিলেন– নামাজের মধ্যে এ ফিতাগাছির সৌন্দর্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছিল।

একবার হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুক্রবার দিন জুমআর নামাযের খোৎবার জন্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে নিজের অঙ্গুলিস্থিত মোহর অঙ্কনের অঙ্গুরীটির প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তা খুলে ফেলে বলেছিলেন– এক চোখ তোমাদের ওপর আর এক চোখ অঙ্গরীটির ওপর রাখা সমীচীন নয়।

আর একদিন হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য এক জোড়া নতুন পাদুকা খরিদ করে আনা হয়েছিল তা দর্শন মাত্র তিনি আল্লাহতা'আলার উদ্দেশ্যে সেজদা করেন। অতঃপর বাইরে পদার্পণ করে সর্বপ্রথম যে ফকীরকে দেখতে পেলেন তাকেই পাদুকা জোড়া দান করে বললেন ঃ এ পাদুকা দুটো আমার দৃষ্টিতে অতিশয় সুন্দর বলে খুব ভাল লেগেছিল। তাতে আমি আশঙ্কা করলাম কি জানি আল্লাহতা'আলার এ কারণে আমাকে শত্রু বলে মনে করেন। সুতরাং সভয়ে আমি তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করেছি।

রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেছিলেন– যদি তোমরা কাল কিয়ামতের দিন আমার সাথে মিলিত হতে ইচ্ছে রাখ, তবে পৃথিবীতে কেবল পাথেয় স্বরূপ

https://kitabbhubon.com

জীবন ধারনের পরিমাণ অনু- বস্ত্রে পরিতৃপ্ত থাক এবং ছেঁড়াবার পর গ্রন্থি না লাগিয়ে কোন জামা-কাপড় শরীর থেকে উন্মোচন করো না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর পরিধেয় বস্ত্রে চৌদ্দটি গ্রন্থি লাগান হয়েছিল। বহু ছাহাবী (রাঃ) তা গণনা করে দেখেছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু মুসলিম জাহানের শাসনদন্ড নিজ হাতে গ্রহণ করার পর তিন দেরহাম মূল্যে একটা পিরহান ক্রয় করেছিলেন। পিরহানটির আস্তিন তাঁর হস্ত অপেক্ষা কিছু লম্বা ছিল। তিনি আস্তিনের অতিরিক্ত অংশটুকু ছিঁড়ে ফেলে পিরহানটি পরিধানপূর্বক বলেছিলেন- আল্লাহ্তা'আলার অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ পরিচ্ছদ পরিধান করবার জন্য দান করেছেন।

কোন একজন বুজুর্গ লোক বলেছেন- আমি হযরত ছুফিয়ান ছওরীর (রাঃ) পাদুকাসহ সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের মোট মূল্য হিসেব করে দেখলাম, সমুদয় পোশাকের মোট মূল্য এক দেরহাম চার দাঙ্গ অপেক্ষা অধিক ওঠেনি। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জাঁক-জমক ও আড়ম্বর পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহতা'আলার উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনে তদ্রূপ পরিচ্ছদ পরিধান না করে দীন হীন পোশাক পরিধান করে। তবে তৎপরিবর্তে তাকে পরকালে বেহেশতের বিচিত্র কারুকার্যময় সুন্দর পোশাক ইয়াকুত প্রস্তর নির্মিত নৌকার মধ্যে বোঝাই করে তাকে দান করা আল্লাহতা'আলার ওপর তার প্রাপ্য দাবীরূপে অবধারিত হয়ে পড়ে। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছিলেন- আল্লাহতা'আলা যে সমস্ত নবীকে মানবজাতির হেদায়তের জন্য প্রেরণ করেছেন তাঁদের সকলকে এ অঙ্গীকার আবদ্ধ করেছেন যে, তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ যেন সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের ন্যায় নিতান্ত সাদা-সিধে হয়। তাতে আমীর লোকেরা তাঁদের অনুসরণে চেষ্টা করবে এবং দরিদ্র লোকেরাও মনঃক্ষুন্ন হবে না।

ফেযালাহ্ ইবনে ওযাইদ রাহেমাহুল্লাহ মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। লোকে তাকে দেখতে পেত-নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পোশাক পরিধান পূর্বক নগ্ন পদে চলাফেরা করতেন। এতে মানুষ তাঁকে বলত আপনি দেশের শাসনকর্তা, এমন সাধারণ পরিচ্ছদে যথা-তথা বিচরণ করা আপনার পক্ষে শোভনীয় নয়। তিনি তদুওরে বলতেন- জাঁকজমকে ও আড়ম্বরে চলতে হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে

https://kitabbhubon.com

নিষেধ করেছেন। এমন কি, তিনি আমাদেরকে এও আদেশ করেছেন যে, সময় সময় নগ্ন পদে বেড়াও। একদা মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছে রাহেমাহুল্লাহ পশমী মোটা কাপড়ের একটা জামা পরিধানপূর্বক কুতাইবা ইবনে মুসলিম রাহেমাহুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। পশমী জামা গায়ে দেখে কুতাইবা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'আপনি এমন মোটা খশখশে পশমী জামা কেন পরিধান করেছেন ? তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান না করে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। কুতাইবা আবার প্রশ্ন করলেন– "উত্তর দিচ্ছেন না কেন ?" তখন ইবনে ওয়াসে বললেন– আপনার প্রশ্নে আমি মহা সঙ্কটে পড়েছি। কি উত্তর দেব স্থির করতে পারছিনা। যদি বলি-'যুহদ' অর্থাৎ বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যে পরিধান করেছি, তবে আত্ম-প্রশংসা করা হবে। আর যদি বলি-দারিদ্রতা বশতঃ এরূপ নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতে বাধ্য হয়েছি, তবে তাতে আল্লাহতা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। হযরত ছালমান রাহেমাহুল্লাহকে লোকে জিজ্ঞেস করেছিল– "আপনি ভাল জামা-কাপড় পরিধান করেন না কেন ? তদুওরে তিনি বলেছিলেন– 'ক্রীতদাসের দেহে জাকাল পোশাক-পরিচ্ছদ শোভনীয় হয় না। আগামীকল্য স্বাধীন হতে পারলে উত্তম পোশাক পরিচ্ছদ হতে বঞ্চিত থাকব না। উমীয় বংশের খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাহেমাহুল্লাহর নিকট চট নির্মিত খশ্খশে ও নিকৃষ্ট পোশাক ছিল। রাতে বেলায় নামাজ পড়বার সময় তিনি তা পরিধান পূর্বক নিতান্ত দীন হীন বেশে মহা প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হতেন। লোকে দেখবার ভয়ে তিনি তা দিবা ভাগে পরিধান করতেন না।

হযরত হাছান বছরী রাহমাহুল্লাহ ফারক্বাদ সান্জীকে বলেছিলেন– "তুমি যে এ মোটা কম্বল পরিধান করেছ আমার ভয় হয় এর কারণে হয়ত তুমি নিজকে অন্যান্য ছুফী লোক অপেক্ষা অধিকতর বুযুর্গ বা শ্রেষ্ঠ সাধু পুরুষ বলে বিবেচনা করতে পার। আমি শুনেছি অধিকাংশ কম্বল পরিহিত দোযখে যাবে।

তৃতীয় প্রকারের আবশ্যকীয় বস্তু-বাসগৃহ ঃ সংসারত্যাগী যাহিদেরকে কিরূপ বাসগৃহে পরিতুষ্ট থাকা উচিত এস্থলে তাই বর্ণিত হবে। ঝড়-বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য লোকের বাসগৃহের প্রয়োজন হয়। এ অস্থায়ী সংসারে বাসগৃহের যত অস্থায়ী ব্যবস্থা করা যায়, ততই সংসারত্যাগী হওয়ার পক্ষে অধিক হিতকর। বসবাসের সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী

https://kitabbhubon.com

ব্যবস্থা এই যে, স্থায়ীভাবে বাস করবার নিমিত্ত কোন নির্দিষ্ট গৃহ নিজে প্রস্তুত কিংবা ভাড়ায় গ্রহণপূর্বক স্থায়ীভাবে নিজের অধিকারে না রেখে কোন মসজিদ অথবা মুসাফের খানার অস্থায়ীভাবে বাস করবে। পরের দহলীজে বা বার্হিবাটির কাচারী ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করতে পার। এ ধরনের বসবাসে সংসারের প্রতি মন আদৌ আকৃষ্ট হতে পারে না। কোন প্রকার ব্যয় বাহুল্যও থাকে না। নিজ নির্মিত বা ভাড়ায় গৃহীত গৃহ উন্নত শ্রেণীর বাসস্থান সংসার বিরাগীদের জন্য এরূপ গৃহের আয়তন আবশ্যকতার পরিমিত হওয়া উচিত। অনাবশ্যক উচ্চ বা প্রশস্ত হলে যাহিদ শ্রেণী থেকে বহিস্কৃত হবে। সংসারত্যাগী লোকের বাসগৃহ ছয় গজের অধিক উচ্চ অধিক প্রশস্ত প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ লতা পাতার বিচিত্র নকশা অংকিত এবং জাঁকাল আসবাব পত্রে সজ্জিত হতে পারে না। ফলকথা এই যে, কেবল ঝড়-বৃষ্টি এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে, আত্মরক্ষার জন্যই বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত। তাতে জাঁকজমক ও ধনেশ্বর্যেরা বাহাদুরী প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়।

বুযুর্গগণ বলেছেন– হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইহলোক ত্যাগের পর মুছলমান সমাজে সর্বপ্রথম সংসারাসক্তির যে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল তা এই ছিল যে, লোকে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে চুনকাম করা আড়ম্বরপূর্ণ বাসগৃহ এবং বহুখন্ডে কর্তিত সেলাই বহুল বিচিত্র রংঢংয়ের জামা-কাপড় প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিল। অথচ হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় জামা-কাপড়ে একটি মাত্র সেলাই থাকত। হযরত আব্বাস (রাঃ) একটা উচ্চ বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে পরে তা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

আর একদিন হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট একটা গৃহের পার্শ্ব দিয়ে কোন স্থানে গমন করছিলেন। গৃহের উচ্চ গম্বুজের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি সঙ্গীয় লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– এ গৃহটি কার ? সঙ্গীয় লোকেরা নিবেদন করল ঃ অমুক ব্যক্তির পরে সে লোকটি হুযুরের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হল তিনি তার প্রতি দৃষ্টি করেন নি। এতে লোকটি বুঝতে পারল যে, কোন কারণে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। উপস্থিত

https://kitabbhubon.com

ছাহাবাগণের নিকট হুযুরের এ অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারল যে, তার বাসগৃহের উচ্চ চূড়াই তার প্রতি হুযুরের অসন্তোষ্টের কারণ পরে সে ব্যক্তি গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলে হুযুরের সমীপে উপস্থিত হলে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহতা'আলার দরবারে তার কল্যাণের জন্য দীর্ঘ দো'আ করলেন। হযরত হাছান বছরী (রাঃ) বলেছিলেন– হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে নিজের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য কখনও একখানা ইটের ওপর আর একখানা ইট স্থাপন করেন নি এবং একখানা কাষ্ঠের সাথে আর একখানা কষ্ঠও জোড়েন নি।

হযরত রছুলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহতা'আলা যার অমঙ্গল ইচ্ছা করেন তার ধন- দৌলত পানি ও মাটির মধ্যে বিনষ্ট করে দেন। (অর্থাৎ বাসগৃহ নির্মাণের জন্য মাটি ও পানির সাহায্যে ইট প্রস্তুত কাজে ব্যয় করে দেন) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন– একদিন হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট পদার্পণ পূর্বক আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কি করছ ? আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রছূলাল্লাহ! ছিল ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা তা মেরামত করছি ? তিনি বললেন– তোমরা এখন যে কাজে হাত দিয়েছ আসল কাজ তা অপেক্ষা আরও অধিক নিকটবর্তী সময় পাবে কিনা বলা যায় না। অর্থাৎ মৃত্যু মাথার ওপর দন্ডায়মান। আর একদিন তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি (আয়তনে বা সংখ্যায়) আবশ্যকের অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণ করবে– ক্বিয়ামতের দিন তাকে আদেশ করা হবে, এ গৃহ মাথায় নিয়ে দাঁড়াও। আর এক সময় তিনি বলেছেন– জীবিকা নির্বাহের একান্ত প্রয়োজনে মানুষ যা কিছু ব্যয় করে তজ্জন্য সে পরকালে ছওয়াব পাবে। কিন্তু মাটি ও পানিতে যা ব্যয় করে, তজ্জন্য কোনই বিনিময় প্রাপ্ত হবে না। হযরত নুহ নবী (আঃ) নিজের বসবাসের জন্য একখানা নলের গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। উম্মত মন্ডলী তাঁকে জিজ্ঞেস করল– 'আপনি নিজের জন্য ইটের সাহায্যে একখানা পাকা বাড়ি নির্মাণ করলে কি ক্ষতি হত ? তিনি উত্তর করেছিলেন– মৃত্যু যার অনিবার্য তার জন্য এ নলের ঘরও অতিরিক্ত।

হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মানুষ সংসারের যে সমস্ত বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণ করে ক্বিয়ামতের দিন তা তার জন্য ভীষণ শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু শীত গ্রীষ্ম থেকে

https://kitabbhubon.com

আত্মরক্ষার জন্য যত বড় গৃহের একান্ত প্রয়োজন তত বড় গৃহ নির্মাণ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়াভিমুখে গমনকালে পথিপার্শ্বের পাকা ইষ্টকে নির্মিত একটা সুউচ্চ প্রাসাদ দর্শন করে বললেন– "ইতোপূর্বে আমি ধারনা করতে পারিনি যে, হামান ফেরআউনের জন্য যেরূপ উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, এ কালের মুছলমানদের মধ্যেও কেহ তদ্রূপ উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ করবে। পাকা ইষ্টক দ্বারা প্রাসাদ নির্মাণের আকাঙ্খা জ্ঞাপনপূর্বক ফেরাআউন তদীয় মন্ত্রী হামানকে বলেছিল–

وَاَوْقِدْ لِىْ يَاهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ

(হে হাছান। আমার জন্য কর্দমের ওপর অগ্নি প্রজ্জলিত কর।" অর্থাৎ ইট কেটে তাতে আগুন ধরিয়ে দাও।) ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে– মানুষ যখন ছয় গজ অপেক্ষা অধিক উচ্চ বাড়ি ঘর নির্মাণ করে, তখন আসমান থেকে জনৈক ফেরেশ্‌তা তাকে ডেকে বলতে থাকে– ওহে পাপীকুলের সর্দার। কোথায় আসতেছো ? অর্থাৎ তোর অবস্থার দৃষ্টে তোকে মাটির নীচে চলে যাওয়া উচিত। তুই আসমানের দিকে কেন আসতেছো ? হযরত হাছান (রাঃ) বলেছেন– রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাসগৃহগুলো এত অনুচ্চ ছিল যে, একজন মানুষ মেজের ওপর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করলে গৃহগুলোর ছাদ স্পর্শ করতে পারত। ফুযাইল রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন– যে ব্যক্তি একান্ত আগ্রহের সাথে কঠোর পরিশ্রমে বাসগৃহ নির্মানান্তে তা ফেলে রেখে পরলোক গমন করে, সে ব্যক্তির অবস্থা আমার নিকট তত আশ্চর্যজনক বলে বোধ হয় না। তবে যে ব্যক্তি এসমস্ত ব্যাপার চোখের সম্মুখে দেখে উপদেশ গ্রহণ পূর্বক সাবধান হয় না তার জন্য অবশ্যই বিস্ময় বোধ করি।

যাহিদ লোকের জন্য চতুর্থ আবশ্যকীয় সামগ্রীগৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঃ এ সম্বন্ধে হযরত ঈছা নবী (আঃ) যে পদ্ধতিতে জীবনযাপন করতেন তাই সর্বোৎকৃষ্ট বৈরাগ্যের লক্ষণ তিনি মাত্র একখানা চিরুনী এবং একটা পানপত্র সঙ্গে রাখতেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন আসবাবপত্রই তাঁর ছিল না। একদিন কোন এক ব্যক্তিকে অঙ্গুলী দ্বারা দাঁড়ি আঁচড়াতে দেখে অনাবশ্যক বিবেচনায় স্বীয় চিরুনীটি পরিত্যাগ করেছিলেন। আর এক দিন জনৈক ব্যক্তি অঞ্জুলি ভরে পানি পান করছে

https://kitabbhubon.com

দেখে স্বীয় পান-পাত্রটিও বর্জন করেছিলেন। সাংসারিক জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রীগুলোর মধ্যে প্রত্যেক পদের এক একটা করে রাখা মধ্যম শ্রেণীর বৈরাগ্য। তাও তামা পিতল প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য নির্মিত না হয়ে মৃত্তিকা কিংবা কাষ্ট নির্মিত হতে হবে। ধাতব পাত্র ব্যবহার করলে যাহিদ শ্রেণী থেকে বহিস্কৃত হয়ে যাবে। পুরাকালের বুযুর্গ লোকগন আবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রত্যেক প্রকারের একটি করেও রাখেননি; বরং এক প্রকারের দ্রব্য দ্বারা নানাবিধ কাজ সমাধা করে নিতেন।

হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি মাত্র বালিশ ছিল। চর্ম নির্মিত খোলের মধ্যে খর্জুর বৃক্ষের সরু আঁশ ভর্তি করে তা প্রস্তুত করা হয়ে ছিল। পশমী কম্বলকে দু'ভাঁজ করে তাঁর প্রস্তুত করা হয়েছিল। পশমী কম্বলকে দু'ভাঁজ করে তাঁর জন্য শস্যা রচনা করা হত। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একদিন হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র পাঁজরদেশে খর্জুর পত্র তৈরি চাটাইয়ের দাগ অংকিত দেখে খুব রোদন করতে লাগলেন। হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে রোদনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি নিবেদন করলেন, 'ইয়া রছূলাল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এ ভেবে রোদন করছি যে, রোম দেশের 'কায়সার' এবং পারস্য দেশের 'কিসরা' উপাধিধারী কাফের বাদশাহগণ আল্লাহ্তা'আলার শত্রু হয়েও তাঁর প্রদত্ত ভুরি ভুরি নেয়ামতের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আর আপনি আল্লাহতা'আলার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁর প্রেরিত রছূল হয়েও এমন কঠিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন!' তখন হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)কে সান্তনা দিবার জন্য বললেন– 'ওমর! তুমি কি একথা শুনে সন্তুষ্ট হবে না যে, তাদের ভাগ্যে শুধু এ নশ্বর পৃথিবীর ধনসম্পদই রয়েছে। আর আমাদের জন্য অবধারিত রয়েছে পরলোকের অনুপম ও চিরস্থায়ী সম্পদ। (পারলৌকিক সৌভাগ্যের সাথে এ পার্থিব সম্পদের কোন তুলনাই হতে পারে না) এতচ্ছ্রবনে হযরত ওমর (রাঃ) নিবেদন করলেন– ইয়া রাছূলাল্লাহ ! আমি সন্তুষ্ট হলাম। হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওমর ! তুমি জেনে রেখ, 'যা বললাম প্রকৃত ব্যাপার তাই।'

জনৈক বুযুর্গ লোক হযরত আবূবকর (রাঃ) এর বাসগৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেল তাতে গৃহ-সামগ্রী বলতে কিছুই নেই। তা দেখে আগন্ত ক লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আবুযর (রাঃ) আপনার গৃহে

https://kitabbhubon.com

কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ? এদুত্তরে তিনি বললেন, 'আমার আর একটা বাড়ি আছে। এখানে যা কিছু আমার হাতে আসে তা তৎক্ষণাৎ আমি সে বাড়িতে প্রেরণ করে থাকি। আর একটা বাড়ি বলতে তিনি পরলোকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কথার মর্ম এই যে, সংসারে আমি ধন সম্পদ যা কিছু প্রাপ্ত হই তা সম্পূর্ণই পারলৌকিক অসীম ও অনুপম সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে ব্যয় করে ফেলি। লোকটি বলল, 'যতদিন ইহসংসারে বাস করবেন ততদিন তো এখানকার বাসগৃহের জন্য যৎকিঞ্চিৎ আসবাবপত্রের প্রয়োজন হবে। তদুওরে হযরত আবুযর বললেন–এ গৃহের মালিক অর্থাৎ আল্লাহতা'আলা আমাকে আর অধিক কাল এখানে বাস করতে দিবেন না। শীঘ্রই আমাকে ইহলোক থেকে বের করে পরলোকে নিয়ে যাবেন। য়্যামান প্রদেশের শাসনকর্তা হযরত ওমর ইব্নে সাআদ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইব্নুল খাত্তাবের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসলে খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন– তোমার ব্যক্তিগত ভান্ডারে পার্থিব আসবাবপত্র কি কি আছে ? তিনি নিবেদন করলেন'একটি লাঠি আছে, তার ওপর ভর দিয়ে চলি এবং তদ্বারা সর্প ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণীকে আঘাত করি। একটি চর্ম নির্মিত থলি আছে। তাতে খাদ্য দ্রব্যাদি রাখি। একটি পাত্র আছে, তাতে আহার্য দ্রব্য রেখে আহার করি, আবার প্রয়োজন হলে তাতে পানি রেখে মস্তক ও বস্ত্রাদি ধৌত করি। আর একটি ঘটি আছে, তাতে পানীয় পানি রেখে পান করি। আবার প্রয়োজনে তা দ্বারা ওযু-গোসলও করে থাকি। এই কয়েকটি পদার্থই আমার গৃহ সামগ্রীর মধ্যে আসল। এতদ্ব্যতীত আর যে কয়েকটি পার্থিব সামগ্রী আমার অধিকারে রয়েছে তা এদেরই আনুষঙ্গিক।

এক সময় হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথম স্বীয় প্রাণ-পুত্তুলি কন্যা হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ) সাথে দেখা করবার জন্য তাঁর গৃহে পদার্পণ করেন। গৃহের দ্বারে একখানা পর্দা ঝুলছিল। হযরত ফাতেমার (রাঃ) দু'হাতে দু'গাছি রৌপ্য নির্মিত বালা ছিল। এতদুভয় দৃশ্যই তাঁর দৃষ্টিতে অতিশয় অপ্রিয় বলে বোধ হলে তিনি কন্যার সাথে সাক্ষাৎ না করে ক্ষুণ্ন মনে নিজ গৃহাভিমুখে চলে গেলেন। হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ) যখন বুঝতে পারলেন যে, পিতা এ কারণে দুঃখিত মনে ফিরে গেছেন, তখনই তিনি কাল বিলম্ব না করে বালা দু'গাছি মাত্র দেড় দেরহাম মূল্যে বিক্রি করে

https://kitabbhubon.com

পর্দার বস্ত্রসহ গরীব দুঃখীদেরকে দান করে ফেললেন। এ সংবাদ শ্রবনে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন– 'মা' তুমি অতি উত্তম কার্য করেছ। একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত ছিদ্দীকা (রাঃ) গৃহদ্বারে একখানা পর্দা ঝুলান দেখে হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– এ পর্দাখানির প্রতি দৃষ্টি পড়লে দুনিয়া আমার স্মরণ পথে উদিত হয়। তা অমুক দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করে ফেল। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন– 'একখানি মোটা পশমী কম্বলকে দু'ভাঁজ করে শয্যা রচনা পূর্বক তদুপরে শয়ন করাই ছিল হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিরন্তন অভ্যাস এক রাতে আমি তাঁর জন্য একখানা নতুন কোমল শয্যা পেতে দিয়েছিলাম। তাতে শয়ন করে সে রাতে তিনি ঘুমাতে পারেন নি। সারারাত কেবল এপাশ-ওপাশ ফিরে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। পরের দিন তিনি বলেছিলেন– 'এ নতুন কোম্বল শয্যাটি গত রজনীতে আমার নিদ্রা বিনষ্ট করেছে। আমাকে ইতঃপর পূর্ববৎ সে দোভাজী কম্বলের বিছানা দিও।' তদবধি প্রতি রাত তাঁকে কম্বলের সেই মোটা দোভাজী বিছানাই পেতে দেয়া হত।

একবার কোন স্থান থেকে হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হস্তে বহু স্বর্ণ মুদ্রা এসে পৌঁছলে তিনি কালবিলম্ব না করে সে দিবসেই সমস্ত মুদ্রাগুলো গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করতে আরম্ভ করে দেন। বিতরণ করতে করতে রজনী এসে পড়ায় ছয়টি মুদ্রা অবশিষ্ট থেকে যায়। যথা সময় নিজের শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি শয্যায় স্থাপনপূর্বক ঘুমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই অবিতরিত ছয়টি মুদ্রার চিন্তা তাঁর হৃদয়ে বার বার উদিত হয়ে নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। অগত্যা তিনি গভীর রজনীতে গাত্রোত্থান পূর্বক অভাবগ্রস্থ দরিদ্রের অনুসন্ধানে বের হলেন এবং উপযুক্ত দরিদ্র লোকের মধ্যে সবগুলো মুদ্রা বিতরণপূর্বক গৃহে ফিরে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদনি প্রাতঃকালে বিগত রাতের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন–'যদি আমি উক্ত বিতরনাবশিষ্ট ছয়টি মুদ্রা রেখে মারা যেতাম তবে আমার অবস্থায় কেমন হত ?

হযরত হাছান বছরী (রাঃ) বলেছেন– "আমি সত্তর জন ছাহাবীর (রাঃ) সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি। তাঁদের সকলেই জীবন

https://kitabbhubon.com

যাপনের পদ্ধতি এক রকম ছিল। তাঁরা নিতান্ত সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত ধরনের এক প্রস্থ মাত্র কাপড় রাখতেন। বস্ত্রখানি পরিধানপূর্বক কোন খাট, চৌকি অথবা বিছানায় শয়ন না করে শুধু ভু-পৃষ্ঠের ওপর নিজের পাঁজর বা পৃষ্ট স্থাপনপূর্বক শুয়ে পড়তেন। দেহের মধ্যে ধুলা-বালি লাগবে সে সঙ্কোচ করতেন না। শুধু মৃত্তিকার ওপরে শয়ন করে চাদরখানি উড়িয়ে নিতেন ছাহাবায়ে কেরামের জীবনযাপনের ধারা ছিল এরূপ সাধারণ ও আড়ম্বর বিহীন।

সংসার ত্যাগী যাহিদগণের পঞ্চম আবশ্যকীয় বস্তু-পত্নী গ্রহণ বা বিয়ে করা ঃ হযরত সাহাল তাস্তারী ছুফ্ইয়ান উয়াইনাহ্ এবং আরও কতিপয় বিজ্ঞ মনীষী (রহঃ) বলেছেন– 'বিয়ের ব্যাপারে বৈরাগ্য নেই। অর্থাৎ বিয়ের সাথে বৈরাগ্য বা অবৈরাগ্যের কোনই সংস্রম নেই। এর প্রমাণ এই যে, হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'যাহিদ' এবং তিনি ছিলেন সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য বৈরাগ্য শিক্ষাদাতা। এতসত্ত্বেও তিনি পত্নী গ্রহণ করতেন ও তাঁদেরকে অতিশয় ভালবাসতেন। তাঁর নয় জন বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তদানীন্তন সংসারত্যাগীবৃন্দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হয়েও চারজন বিবাহিতা পত্নী এবং দশ বার জন সেবিকা দাসী রাখতেন। যদি বিয়ের সাথে বৈরাগ্যের কোন সম্পর্ক থাকত, তবে বৈরাগ্যের শিক্ষাদাতা ও বিরাগী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কখনও বিয়ে করতেন না।

বিয়ের সাথে বৈরাগ্যের কোন সম্পর্ক নেই। এ বাক্যটি দ্বারা উপরোক্ত মনীষীগণ সম্ভবতঃ তাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রবৃত্তি যাতে স্ত্রী সহবাসের সুখাস্বাদ উপভোগ করতে না পারে সে বিষয়ে অনুরাগহীনতা বা বৈরাগ্য রক্ষার্থে দার পরিগ্রহ না করা অর্থাৎ বিয়ে ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। কেননা বিয়ের ফলে বংশ রক্ষা পেয়ে আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মৎ বৃদ্ধি পাওয়ার পথ মুক্ত হয়ে যায়। বিয়ের কারণে বংশ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। ক্ষুধার সময় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে যেমন বিশেষ আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায়। তদ্রূপ কামোত্তোজনার সময় স্ত্রী সহবাসেও অশেষ আনন্দ এবং সুখ পাওয়া যায়। বৈরাগ্য রক্ষার্থে ক্ষুধার সময় আহারের আনন্দ ও সুখ বর্জন মানসে খাদ্য

https://kitabbhubon.com

গ্রহণ না করলে যেমন– শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ বৈরাগ্য ভ্রমে স্ত্রীসহবাস সুখ ও আনন্দ বর্জন মানসে দার পরিগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও মানব বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। বিয়ে করলে যদি স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহতা'আলাকে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে বিয়ে না করাই শ্রেয়। যাদের কাম প্রবৃত্তির প্রবল, বিয়ে না করলে গুরুতর পাপে লিপ্ত হওয়ার ভয় আছে তাদের পক্ষে বিয়ে করাই সঙ্গত। তবে সেক্ষেত্রে 'যুহ্দ' অর্থাৎ বৈরাগ্য পরিচয় এই যে, রূপবর্তী সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণে লোভী না হয়ে কামোত্তেজনা নিবারণের উপযোগী কুৎসিত কদাকার গুণবতী রমনীকে বিয়ে করবে। কেননা রূপবতী সুন্দরী রমনী কামভাবকে জাগরিত ও উত্তোজিত করে থাকে। আর গুণবর্তী কুৎসিত স্ত্রী কামোত্তেজনাকে শান্ত করে দেয়। অতএব কামভাব চরিতার্থ করণ এবং সহবাস সুখ উপভোগ মানসে সুন্দরী কামিনীর পণিগ্রহণ পরিত্যাগপূর্বক নিতান্ত প্রয়োজনের তাকীদেও বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে কুৎসিত রমনী বিয়ে করা অবশ্যই বৈরাগ্যের অন্তর্গত। হযরত ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে লোকে তাঁর জন্য একজন অতিশয় রূপবর্তী ও সুন্দরী পাত্রী নির্বাচন এবং বিয়ে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করে ইমাম ছাহেবকে বলল– 'এ পাত্রীর একটি ভগ্নী আছে এর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমতী; কিন্তু এক চোখ বিহীন বলে দর্শনে কুৎসিৎ ও কদাকার। আপনি যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। ইমাম ছাহেব রূপের মোহে সুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ না করে শুধু বুদ্ধিমত্তার প্রেক্ষিতে সেই এক চোখহীনা কুৎসিত রমনীকেই বিয়ে করে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন– "আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাথমিক অবস্থার মুরিদগণের পক্ষে নিজের হৃদয়কে ধনোপার্জন, বিয়ে এবং হাদীছ লিখন এ তিনটি কাজ থেকে রক্ষা করা আমি পছন্দ করি। অর্থাৎ প্রথম প্রথম আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে তৎসঙ্গে ধনোপার্জন বৈবাহিক জীবন এবং হাদীছ লিখনে লিপ্ত থাকা সাধনার পথে অন্তরায় বলে আমি তা পছন্দ করি না।" এ মহাত্মা আরও বলেছেন– "সাধনা পথের পথিকদের পক্ষে লেখাপড়া অর্থাৎ বিদ্যার্চ্চায় মগ্ন হওয়া আমি পছন্দ করি না। কেননা বিদ্যা চর্চায় লিপ্ত হলে মনে নানা বিষয়ের

https://kitabbhubon.com

চিন্তাও কল্পনা আবির্ভূত হয়ে মনকে বিভিন্নমুখী করে ফেলে। একাগ্রতাও একনিষ্ঠতা লোপ পায়।

সংসার ত্যাগী যাহিদগণের ষষ্ঠ আবশ্যকীয় পদার্থ ধন দৌলৎ ও মান সম্মান ঃ ধনৈশ্বর্য এবং মান-সম্মান এ দুটি পদার্থ হলাহল বিষতুল্য মারাত্মক। কিন্তু তা থেকে একান্ত আবশ্যকের পরিমাণ গ্রহণ করা বিষ অপহারক অমোঘ ওষুধের ন্যায় হিত কর। উক্ত পরিমাণ ধন ও মান সংসারিক ভোগ বিলাসের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং আধ্যাত্মিক সাধনার পথে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করার জন্য সহায় বলে পারলৌকিক হিতকর পদার্থসমূহের অন্তর্গত হবে। এক সময় কোন পার্থিব প্রয়োজনে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) তার জনৈক বন্ধুর নিকট কিছু ধার চাইলে তৎক্ষনাৎ আল্লাহতা'আলার তরফ থেকে ওহী আসল ঃ 'হে খলীল! আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু। তুমি আমার নিকট ধার চাইলে না কেন ? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিবেদন করলেন– 'ইয়া আল্লাহ! আমি উত্তমরূপে অবগত আছি, তুমি দুনিয়াকে ঘৃণা কর। অতএব তোমার নিকট দুনিয়া প্রার্থনা করতে আমার ভয় হয়েছিল পুনরায় ওহী আসল 'হে ইব্রাহীম! জীবন ধারনের জন্য যা কিছু একান্ত আবশ্যকীয় তা মোহ উৎপাদক দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মধ্যে গণ্য নয়।' ফলকথা মানুষ যখন পরকালের চিন্তায় বিভোর থেকে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও লোভনীয় পদার্থের মোহ র্বজন করে এবং একান্ত জীবন ধারনের তাকীদে কেবল অভাব মোচনের পরিমাণ ধনৈশ্বর্য ও মান সম্ভ্রম অবলম্বনে পরিতুষ্ট থাক, তবে তদ্রূপ মানুষের হৃদয় পার্থিব ভোগ বিলাস এবং ধন মানের মোহে আকৃষ্ট হতে পারে না। দুনিয়ার প্রতি কোন দিন তার হৃদয়ে অনুরাগও আসতে পারে না।

বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় আলোচনার উপসংহার

মানুষ পার্থিব ভোগ বিলাসের ও লোভনীয় পদার্থের চিন্তা ও আকর্ষণ থেকে যদি নিজের মনকে মুক্ত করে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার হবার অভ্যাস করতে পারে, তবে পরিনামে সে এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে যে, ইহলোক পরিত্যাগপূর্বক পরলোক গমনকালে তার মন নিম্ন জগৎ অর্থাৎ দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট থাকবে না এবং দুনিয়ার মায়ায় পুনঃপুনঃ তৎপ্রতি ফিরে ফিরে তাকাবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের জন্য শান্তি ও

https://kitabbhubon.com

আরামের স্থান বলে মনে করে, দুনিয়া ত্যাগকালে সে ব্যক্তিই দুনিয়ার প্রতি পুনঃপুনঃ ফিরে তাকায়। সে যেন দুনিয়ার মমতা অন্তর থেকে দূর করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াকে পায়খানার ন্যায় নিকৃষ্ট স্থান বলে মনে করে; অর্থাৎ মলত্যাগের ন্যায় নিতান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনের সময় ব্যতীত অন্যকোন সময় যেমন কেউ পায়খানায় গমন করতে ইচ্ছা করে না। তদ্রূপ এ ব্যক্তিও নিতান্ত প্রয়োজনের তাকীদেই কিছুকাল দুনিয়াতে অবস্থান করেছে। অন্যথায় দুনিয়াকে সে পায়খানার ন্যায়ই ঘৃণা করে। মৃত্যু আগমনের সাথে সাথে যখন তার সে প্রয়োজনের অবসান ঘটল, তখন সে ব্যক্তি আর মুহূর্ত কালের জন্যও দুনিয়াতে অবস্থান করতে ইচ্ছা করবে না; সুতরাং, দুনিয়া ত্যাগ করে যাবার কালে তৎপ্রতি ফিরেও তাকাবে না।

যারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাথে মনের সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুতভাবে গড়ে তুলেছে। তাদের মৃত্যুকালীন অবস্থার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে কর, যেমন কোন এক ব্যক্তিকে কোন এক স্থানে থাকতে দেয়া হবে না। বাধ্যতামূলকভাবে তাকে সে স্থান থেকে বের করে দেয়া হবে, তা জেনেও সে ব্যক্তি নিজের ঘাড়ের সাথে লৌহ শৃঙ্খল সংযোগ করে সে স্থানের সাথে মজবুতভাবে বেঁধে রাখল। অথবা শৃঙ্খল অভাবে নিজ মস্তকের দীর্ঘ কেশরাশিকে সে স্থানের কোন বস্তুর সাথে জড়িয়ে বেঁধে রাখল। তদবস্থায় যখন সে ব্যক্তিকে সে স্থান থেকে বল পূর্বক টেনে বের করা হয় তখন তার দেহ নিয়ে বড় টানা- হেঁচড়া আরম্ভ হয়ে যায়। দেহের বন্ধনের কারণে দেহ স্থানে থেকে যেতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দেহটিকে বহিস্কৃত করা হয় বটে, কিন্তু তার মস্তকের কেশ রাশি মস্তক থেকে ছিন্ন হয়ে সে স্থানে থেকে যায়। এরূপ টানা হেঁচড়ার সাথে ছিন্ন কেশ অবস্থায় যখন তাকে টেনে বের করা হয়, তখন সে যখমের যন্ত্রনা বহুদিন পর্যন্ত তাকে ভোগ করতে হয়। হযরত হাছান বছরী (রাঃ) বলেছেন– আমি ছাহাবায়ে কেরামের এমন এক দলকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি যে, তোমরা ধন সম্পদ বা সুখ শান্তি র মুখ দর্শন করলে যেমন প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে থাক, তাঁরা বিপদ-আপদে পতিত হলে তেমন আনন্দ পেতেন। তাঁরা তোমাদেরকে দেখলে শয়তান ভিন্ন আর কিছুই বলতেন না। আর তোমরা তাঁদেরকে দেখলে বলতে, এরা পাগল ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাঁরা বিপদ-আপদেও দুঃখে কষ্টে পতিত থাকতে এত আগ্রহ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার আপদ-

https://kitabbhubon.com

বিপদ ও দুঃখ কষ্ট ভোগ করলে মন দুনিয়ার প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হবে না বরং তৎপ্রতি অতিশয় বিরক্ত হয়ে ওঠবে। ফল এ হবে যে, এ উপায়ে মনকে দুনিয়ার প্রতি বিরক্ত করে নিতে পারলে পরলোক গমনের সময় দুনিয়ার কোন পদার্থের প্রতি মনের কোন প্রকার আকর্ষণ থাকবে না।

তাওয়াক্কুল

আল্লাহর প্রতি ভরসা। প্রিয় পাঠক অবগত হও, মনের একটা অতি উন্নত অবস্থার নাম তাওয়াক্কুল। যে সমস্ত উন্নত অবস্থার অধিকারী হলে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে-তাওয়াক্কুল সে সমস্ত অবস্থার মধ্যে একটা উচ্চতম অবস্থা। এর মর্যাদা অতি উচ্চ। তাওয়াক্কুলের পথে বাধা-তাওয়াক্কুল সম্বন্ধীয় জ্ঞান মূলত ঃ নিতান্ত দুর্বোধ্য ও কঠিন। এ কারণে তদনুযায়ী কাজ করাও খুবই কঠিন। কারণ, যে ব্যক্তি মানবের কার্যাবলীর মধ্যে আল্লাহর ভিন্ন অন্য কারও দখল বা হাত আছে বলে মনে করে সে ব্যক্তি 'তাওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার একত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি যাবতীয় কার্যাবলীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহর হাতে একচ্ছত্রভাবে ন্যস্ত করে মাঝখান থেকে কাজের উপকরণ উপাদান প্রভৃতি মধ্যবর্তী কারনসমূহকে বাদ দেয়া হয়, তবে শরীঅতের প্রতি দোষারোপ বা অবমাননা করা হয়। আবার কাজের বাহ্যিক কারণসমুহের মধ্য থেকেও কোন কারণকে বাদ দিলে স্বীয় বিবেক বুদ্ধির বিরোধিতা করা হয়। অথচ কাজের পশ্চাতে কোন বাহ্যিক কারণের কার্যকারীতা রয়েছে বলে বিবেচনা করলেও বাহ্যিক কারণের প্রতি ভরসা করতঃ 'তাওহীদ' বা একত্ববাদ বিশ্বাসের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি এসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং তাওয়াক্কুলের পরিচয় এমন একটা ব্যাপক সংজ্ঞা দ্বারা প্রদান করতে হবে যাতে বিবেক বুদ্ধি, শরীঅত এবং তাওহীদের নির্দেশও ভাবার্থের সমাবেশ থাকে। এরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা অবশ্যই নিতান্ত কঠিন কাজ। এ দিনের সমন্বয়যুক্ত তাওয়াক্কুল সম্বন্ধীয় জ্ঞানও অতি দুর্লভ। সকলের পক্ষে যে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। এ কারণে আমরা প্রথমে তাওয়াক্কুলের মোটামুটি পরিচয়ের জন্য তার ফযীলৎ বর্ণনা করব। অতঃপর তার হাক্কীকৎ বা প্রকৃত পরিচয় বর্ণনার চেষ্টা করব। পরিশেষে তাওয়াক্কুল জনিত অবস্থা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে উল্লেখ করব।

https://kitabbhubon.com

তাওয়াক্কুলের ফযীলত

প্রিয় পাঠক ! অবগত হও, আল্লাহ বলেছেন–

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

'তোমরা একমাত্র আল্লাহর প্রতিই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।' (পারা-৬ সূরা-মা'য়েদাহ; রুকু-৪) এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহতা'আলা লোককে কেবল আল্লাহর প্রতিই তাওয়াক্কুল করবার জন্য আদেশ করলেন এবং আল্লাহর প্রতি 'তাওয়াক্কুল করাকে ঈমানের অস্তিত্বের জন্য শর্ত করে দিলেন। তাওয়াক্কুল অভাবে ঈমান লোপ পাবে বলে জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

নিশ্চয়, আল্লাহতা'আলা (তাঁর উপর) তাওয়াক্কুলকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।' (পারা-৪ সূরা আল-ইমরানঃ রুকু-১৭) তিনি আর একস্থানে বলেছেন–

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।' (পারা ২৮, সূরা-তালাক- রুকু ১) তিনি আবার বলেছেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ-

'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন ? (পারা ২৪ ঃ সূরা যুমার ঃ রুকু ১) তাওয়াক্কুলের ফযীলৎ সম্বন্ধে কোরআন পাকের মধ্যে ইত্যাকার আরও বহু আয়াত রয়েছে। হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মহাপ্রভু আল্লাহপাক একদিন স্বীয় মহিমা মন্ডিত নিদর্শনসমূহের কতকাংশ আমাকে দেখালেন। আমি দেখতে পেলাম, পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত, মাঠ প্রান্তর, বন-জঙ্গল ও সমতল ভূমি আমার উম্মতে পরিপূর্ণ রয়েছে। উম্মতমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য দেখে আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। আল্লাহপাক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'উম্মতের সংখ্যা দেখে আপনি খুশী হলেন কি ? আমি নিবেদন করলাম ঃ

https://kitabbhubon.com

'হ্যাঁ খোদা ! আমি পরম আনন্দিত ও প্রীত হয়েছি।' আল্লাহ্পাক আবার বললেন– উম্মতের সংখ্যাধিক্য ছাড়াও তারও একটা আনন্দের সংবাদ শ্রবন করুন ঃ 'আপনার উম্মতমণ্ডলীর মধ্যে সত্তর হাজার লোক হিসেবে নিকেশ ব্যতীতই বেহেশ্ত চলে যাবে। হাদীছটি শ্রবন করে উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন– 'ইয়া রছূলাল্লাহ্ ! 'যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা কেমন লোক ? হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন 'যারা মন্ত্র-তন্ত্রের ও শুভাশুভ লগ্নের এবং দেহে চিহ্নিত করণের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না এবং তারা খোদা ভিন্ন অন্যকোন বস্তুর ওপরই নির্ভর বা ভরসা রাখেনা। একথা শ্রবন মাত্র হযরতওকাশা (রাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে নিবেদন করলেন ঃ 'ইয়া রছূলাল্লাহ্ ! আমার জন্য দো'আ করুন, আল্লাহতা'আলা যেন আমাকেও সে সত্তর হাজার লোকের দলভুক্ত করেন।' হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই দো'আ করলেনঃ হে খোদা! ওকাশাকে উক্ত সত্তর হাজার লোকের মধ্যে স্থান দান করুন।' তা দেখে, উপস্থিত ছাহাবীবৃন্দের মধ্য হতে আর একজন ছাহাবী দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন– 'ইয়া রছূলাল্লাহ ! আমার জন্যও তদ্রূপ দো'আ করুন। রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ওকাশা এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে গিয়েছে বা অগ্রাধিকার নিয়ে গিয়েছে। আর একদিন হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন– 'আল্লাহতা'আলার প্রতি যেরূপ দ্বিধাহীন চিত্তে তাওয়াক্কুল করা উচিত। তোমরা যদি তাঁর প্রতি সেরূপ তাওয়াক্কুর করতে পার, তবে তিনি পশু পাখির ন্যায় অজানিত স্থান থেকে তোমাদেরকে রিযিক দান করবেন। পশু-পাখিরা প্রাতঃকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিজ নিজ বাসস্থান থেকে বের হয়ে যায় এবং দিন শেষে সন্ধ্যাকালে পূর্ণ উদরে তৃপ্ত হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে।

রছূলে মাকবূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন–"যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি তার সমাপ্ত কার্য নির্বাহ করে দেন এবং সর্ববিষয়ের তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। আর এমন স্থান থেকে তার রিযিক সরবরাহ করে থাকেন যা কোন সময় তার কল্পনায়ও আসে নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার বা দুনিয়াবী কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ার সঙ্গে ছেড়ে দেন।" হযরত ইব্রাহীম

https://kitabbhubon.com

খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে যখন কাফেরগণ চড়কে বেঁধে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করতেছিল তখন তিনি বলেছিলেন–

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ-

"আল্লাহই আমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম কার্য নির্বাহক।' চড়ক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন শুন্যে, হাওয়ায় ছিলেন। তখন হযরত জিবরায়ীল (আঃ) এসে তাঁকে বললেন– "আপনি আমার সাহায্যে করার প্রয়োজন বোধ করেন কি ? তিনি উত্তর করলেন– আপনার সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি পূর্বে যে, حَسْبِىَ اللّٰهُ الخ বলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছেন, সে কথার সত্যতা রক্ষার জন্যই জিবরায়ীল আলাইহিস্সালামকে এ উত্তর দিয়েছিলেন। এ কারণেই আল্লাহতা'আলা ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রশংসায় বলেছেন–

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى

"আর ইবরাহীম যিনি বাক্য পূর্ণ করেছিলেন অর্থাৎ স্বীয় কথার সত্যতা রক্ষা করেছিলেন।" (পারা ২০ ঃ সূরা-নাজম ঃ রুকু-৩).

হযরত দাউদ আলাইহিসসালামকে আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণপূর্বক কোন ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে যদ্যপি সমস্ত আসমান এবং জমিন প্রবঞ্চনা প্রতারণা সহকারে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আমি তার সমস্ত বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে থাকি।'

হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেছেন– "একদিন আমার এক হাতে বৃশ্চিক দংশন করে ছিল। আমার মাতা আমাকে কসম দিয়ে বললেন– বৃশ্চিক দষ্ট হাতখানা বাড়িয়ে দাও ঐ ব্যক্তি (ওঝা) মন্ত্র পড়ে ঝেড়ে দিবে।' আমি দষ্ট হাতখানা না খুলে সুস্থ হাতখানা ওঝার সম্মুখে খুলে ধরলাম। কারণ আমি জনাব রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি মন্ত্র-তন্ত্র ও শরীরে দাগ কাটার ওপর নির্ভর বা বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি সে ব্যক্তির তাওয়াক্কুল নষ্ট হয়ে যায়। সে মুতাওয়াক্কেল বা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী নয়।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একদিন কোন একজন সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– "তুমি রিযিক কোথা থেকে পেয়ে থাক ? সে ব্যক্তি উত্তর

https://kitabbhubon.com

করলঃ আমি জানিনা, রিযিক দাতাকে জিজ্ঞেস কর যে, তিনি কোথা থেকে আমার রিযিক প্রেরণ করছেন। কতিপয় লোক জনৈক সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি সর্বদা এবাদৎ কার্যেই মশুগুল থাকেন, আপনার জীবিকা কিরূপ সংগৃহীত হয় ? উত্তরে তিনি কেবল নিজের দন্তের দিকে আঙ্গুলির দ্বারা ইশারা করলেন। এর অর্থ এই যে, যিনি এ যাঁতাকল সৃষ্টি করেছেন, পিষবার বস্তুও তিনিই সংগ্রহ করে থাকেন, তজ্জন্য আমার ভাবতে হয় না। হযরত হারাম ইবনে-হাইয়ান একদিন হযরত উয়াইস ক্বারনীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– "আমি কোন দেশে বসবাস করব ? তিনি বললেন– তুমি শাম দেশে গিয়ে বাস কর।' হযরত হারাম বললেন– 'তথায় আমার রিযিক কেমন করে পাওয়া যাবে ? হযরত উয়াইস ক্বারণী বললেন–

أُفٍّ لِّهٰذِهِ الْقُلُوْبِ خَالَطَهَا الشَّكُّ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ

অর্থাৎ যে সমস্ত হৃদয়ে সন্দেহ বাসা বেঁধেছে তাদের উপদেশ কার্যকরী হয় না, সে সমস্ত হৃদয়ের প্রতি আফসুস্।

তাওয়াক্কুলের ভিত্তি, তাওহীদ বিশ্বাসের পরিচয়

প্রিয় পাঠক! অবগত হও, তাওয়াক্কুল মনের অবস্থাসমূহের মধ্যে একটা অবস্থা, একে ঈমানের ফল বলা যায়, ঈমানের অনেকগুলো শাখা আছে, তন্মধ্যে দুটি শাখার ওপর তাওয়াক্কুলের ভিত্তি স্থাপিত। প্রথম তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্তা'আলার একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, দ্বিতীয় তাঁর করুনা ও দয়া মানুষের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় বর্ষিত হচ্ছে– একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। কিন্তু তাওহীদ সম্বন্ধীয় বিবরণ অতিশয় বিস্তৃত বরং সীমাহীন কেননা তাওহীদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানই সর্ববিধ জ্ঞানের চরম লক্ষ্যস্থল, তবে তৎসম্বন্ধীয় যতটুকু জ্ঞান ও বিশ্বাসের ওপর তাওয়াক্কুলের ভিত্তি স্থাপিত এস্থলে আমরা কেবল তাওহীদের ততটুকু বিবরণই প্রদান করতে প্রয়াস পাব।

তাওহীদের চারটি স্তর

প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, তাওহীদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের চারটি স্তর আছে। প্রথম ছিলকা বা আবরণ, দ্বিতীয় খুলি অর্থাৎ ছোবড়ার নিম্নের শক্ত

https://kitabbhubon.com

আবরণ, তৃতীয় শক্ত আবরণের মধ্যস্থিত মগজ বা শাঁস চতুর্থ উক্ত মগজ বা শাঁসের ভিতরস্ত সার পদার্থ। মোটকথা- তাওহীদের দু'টি সারবস্তু এবং দু'টি আবরন বা ছিলকা আছে। এর চার ভাগকে কাঁচা আখরোট অথবা নারিকেলের চারটি ভাগের সাথে তুলনা করা যায়। বাইরের ভাগ ছিলকা ; তার ভিতরের অংশ শক্ত খুলি ; তদভ্যন্তরে যে সাদা অংশ (পদার্থ) পাওয়া যায় তা মগজ বা শাঁস আর এ শাঁসের মধ্যে এক সার পদার্থ গুপ্ত রয়েছে, তা শাঁসের সার পদার্থ তেল।

তাওহীদের প্রথম স্তর ঃ প্রথম স্তরের তাওহীদ এই যে, মানুষ শুধু মুখে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউই উপাস্য নেই, বলে থাকেন, কিন্তু অন্তরের সাথে কলেমাটির অর্থের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তা মুনাফেকদের 'তাওহীদ' বা একত্বজ্ঞান। এদের নিকট তাওহীদের শুধু খোলস বা মুখোশটি রয়েছে। মর্মার্থের প্রতি এদের বিশ্বাস নেই।

তাওহীদের দ্বিতীয় স্তর ঃ লোকে অপর ধর্মপরায়ন লোকের মুখে শুনে তদনুকরণের لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কলেমার অর্থ অন্তরের সাথে মেনে লয় এবং বিশ্বাস করে সাধারণ লোকগণ তাওহীদ সম্বন্ধে এ ধরনের জ্ঞান বিশ্বাসই অর্জন করে থাকে। কোন কোন মানুষ নিজে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে অনুরূপ জ্ঞান বিশ্বাস লাভ করে থাকে, তা যুক্তিবাদী দার্শনিকদের তাওহীদ জ্ঞান, তা একেবারে বাহ্যিক খোলস নয়; বরং এ শ্রেণীর একত্বজ্ঞানকে খোলসের নিম্নবর্তী খুলি বলা হয়।

তাওহীদের তৃতীয় স্তর ঃ মানুষ মুশাহাদাহ্ বা প্রত্যক্ষ সাহায্যে দেখতে পায় যে, যাবতীয় পদার্থের মূলে এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর তারা বুঝতে পারে যে, সমস্ত কাজের কর্তাই আল্লাহতা'আলা। তিনি ভিন্ন আর কেউই কারও কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। এ স্তরের একত্ব জ্ঞান একটা নূর (জ্যোতি) আলো যা মানব-হৃদয়ে উৎপন্ন হয় এবং সে নূরেরই সাহায্যে উক্ত মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে থাকে। তা সাধারণ লোকের দেখা দেখি বিশ্বাসের এবং যুক্তিবাদী দার্শনিকগণের যুক্তিলব্ধ বিশ্বাসের অনুরূপ নয়। কেননা সাধারণ লোক ও যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ তাওহীদের যে জ্ঞান লাভ করে থাকে, তা এক প্রকারে বন্ধন বিশেষ। সাধারণ লোকেরা অপরের দেখা দেখি এবং যুক্তিবাদীরা যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাওহীদ জ্ঞানকে অন্তরের মধ্যে বেঁধে

https://kitabbhubon.com

লয়। স্বতস্ফুর্ত হয় না। কিন্তু মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষ দর্শন অন্তরের পর্দা উন্মুক্ত করে দেয়, সমস্ত দেখাদেখি অনুকরণ ও যুক্তি প্রমাণের বন্ধন বেড়ি খুলে দূর করে দেয়। এ শ্রেণীর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হলে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ অন্তর-চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় স্তরের দ্বিবিধ তাওহীদ জ্ঞান এবং তৃতীয় স্তরের প্রত্যক্ষ দর্শন এ ত্রিবিধ একত্বজ্ঞানের পার্থক্য বুঝাবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে– এক ব্যক্তি অপরের মুখে শুনতে পেল যে, অমুক আমীর লোক গৃহের ভিতরে আছেন। একথা শুনেই সে ব্যক্তি আমীরের গৃহে অবস্থান বিশ্বাস করল। সাধারণ লোকের তাওহীদ জ্ঞানকে এ লোকটির বিশ্বাসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সাধারণ লোকেরা তাদের পিতামাতা থেকে শুনে শুনে আল্লাহ্‌তা'আলার একত্বে বিশ্বাস করে থাকে এবং তাদের দেখাদেখি তাওহীদ জ্ঞান লাভ করে। দ্বিতীয় আর একজন লোক উক্ত আমীর লোকের গৃহদ্বারে তাঁর বাহনাশ্ব এবং তাঁর সেবক- সেবিকারগণকে কার্যরত দেখে বিশ্বাস করল যে, আমীর ব্যক্তি ঘরের মধ্যেই আছেন। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের তাওহীদ জ্ঞানকে এ দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসের অনুরূপ বলা যায়। তৃতীয় আর একজন লোক আমীরের গৃহে প্রবেশ করত, তাঁকে স্বচোখে দেখে নিল। 'আরেফ' অর্থাৎ চাক্ষুষ্মান তত্ত্বজ্ঞানী লোকের তাওহীদ জ্ঞান এ প্রত্যক্ষদর্শী লোকের বিশ্বাসের অনুরূপ। সমস্ত পদার্থের মূলে এক খোদাকে দেখতে পেয়ে আরেফ লোকের তাওহীদ জ্ঞান জন্মে থাকে। এ তিন প্রকারের ব্যক্তির তাওহীদ জ্ঞানের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে।

তৃতীয় স্তরের তাওহীদ জ্ঞানের মান যদিও অতিশয় উন্নত কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী আরেফ লোক এ স্তরে পৌঁছে সৃষ্ট পদার্থের প্রতিও তার লক্ষ্য থাকে। এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতিও তার লক্ষ্য থাকে। কেননা তারা দেখতে পায় যে, সৃষ্ট পদার্থসমূহ সৃষ্টিকর্তা থেকেই উদ্ভূত, সুতরাং তৃতীয় স্তরের একত্ব জ্ঞানের মধ্যে একাধিকের দখল রয়েছে। একচ্ছত্রভাবে এক খোদার প্রতি লক্ষ্য না থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্ট পদার্থ এবং স্রষ্টা উভয়ের প্রতি থাকবে, ততক্ষণ তার দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে থাকবে, একনিষ্ঠ হতে পারবে না। এ কারণে এ শ্রেণীর তাওহীদ জ্ঞানকে পূর্ণ তাওহীদ জ্ঞান বলা চলে না।

তাওহীদের চতুর্থ স্তর ঃ আরেফ ব্যক্তি একত্বজ্ঞানে এত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছেন যে, এক আল্লাহ ভিন্ন অপর কোন পদার্থের অস্তিত্বই

https://kitabbhubon.com

তাঁর দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। সমস্ত কিছুকে এক বলে দেখতে পান এবং এক বলে বুঝে থাকেন। প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্যে সৃষ্ট ও স্রষ্টা বলে কোনরূপ পার্থক্য জ্ঞান তাঁর থাকে না। সুফী লোকের পরিভাষায় এ শ্রেণীর একত্ব জ্ঞানকে "ফানা-ফিত্ তাওহীদ" অর্থাৎ একত্বের মধ্যে বিলীন হওয়া বলা হয়। এ স্তরের বিশদ মর্ম উপলব্ধি করার বিষয় বর্ণনা করে বুঝান কঠিন।

হযরত হুসাইন হাল্লাজ্ (রহঃ) একদিন খাওয়াস্ (রাঃ)-কে জনমানবহীন মরু-প্রান্তরের মধ্যস্থলে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি এখানে নির্জনে একাকী কি করছেন? তিনি উত্তর করলেন আমি আল্লাহ্তা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুল কাজে নিজকে দৃঢ়পদ রাখার অভ্যাস করছি। হযরত হাল্লাজ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি তো স্বীয় বাতিন বা অভ্যন্তরকে পরিশোভিত করার কাজে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন। আচ্ছা বলুন তো, নাস্তিকতার স্তর থেকে একত্বের স্তরে কেমন করে পৌঁছবেন ?'

তাওহীদের এ চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরের তাওহীদ জ্ঞান অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত কেবল মুখে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা, তা মুনাফিকের তাওহীদ জ্ঞান তা খুলির উপরিস্থ ছোবড়া বা বাহিরের আবরণ। প্রিয় পাঠক! কাঁচা আখরোট ফলের বাইরের ছিল্কা দেখতে মনোহর সবুজবরণ হলেও যদি তুমি তাকে খেতে আরম্ভ কর, তবে নিতান্তই বিস্বাদ লাগবে। তাকে খাওয়া তো দূরেরই কথা ইন্ধনরূপেও ব্যবহার করা যায় না। আগুনে ফেললে তা থেকে ধুম্র নির্গত হয়ে আগুন নির্বাপিত করে ফেলে। কাজেই তা সঞ্চয় করে রাখার উপযোগী পদার্থ নয়। তা সঞ্চয় করে রাখলে কোন কাজেই লাগবে না, অধিকন্তু ঘরে রেখে দিলে অনর্থন আবর্জনার ন্যায় কতটুকু স্থান আবদ্ধ করে রাখে। অতএব আখরোটের কাঁচা ছিল্কা কোন কাজেরই নয়। তথাপি কিছুদিনের জন্য তাকে আখরোট ফলের ওপরে লেগে থাকতে দিলে ভিতরের খুলিটি তাজা ও পরিপুষ্ট থাকে এবং বাইরের আপদ থেকে খুলিটিকে রক্ষা করে রাখে। এরূপে মুনাফেক লোকের একত্ব বিশ্বাসও কোন কাজের নয়। তথাপিএ তাওহীদের খোলস মুনাফিকদের দেহায়বকে মুছলমানের তলোয়ার থেকে রক্ষা করে রাখে। তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে বলে মৌখিক প্রকাশ করার কারণে মুছলমানদের তরবারি থেকে রক্ষা পায়। অর্থাৎ সে ঈমানের খোলসের কারণে মুনাফিককে দুনিয়ায় হত্যা করা হল না; কিন্তু মৃত্যুর পরে যখন এ

https://kitabbhubon.com

দেহের অবসান ঘটবে তখন তাদের মৌখিক ঈমানের খোলস তাদের আত্মরূপ শাঁসকে পারলৌকিক আপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আত্মাকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় স্তরের তাওহীদ বিশ্বাসের প্রয়োজন। তা আখরোটের (খোসা) সদৃশ। খোসা ছোবড়ার ন্যায় তত অকর্মন্য নয়। আখরোটের ছোবড়ার নিম্নস্থ খুলী জ্বালানীরূপে ব্যবহারের অযোগ্য হলেও তদ্বারা এতটুকু কাজ পাওয়া যায় যে, তাকে ভিতরস্থ শাঁসের ওপর লেগে থাকতে দিলে খুলির রক্ষণাবেক্ষনে শাঁস নিরাপদে থাকে, বিনষ্ট হতে পারে না। এ খুলিও অবশ্য শাঁসের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য পদার্থ। তদ্রূপ সাধারণ লোকের তাক্‌লীদী ঈমান অর্থাৎ পিতা-মাতা ও গুরুত্বজনকে দেখে তারা একত্ব বিশ্বাস লাভ করেছে এবং যুক্তিবাদীগণের যে একত্ব বিশ্বাস, এ উভয়বিধ একত্ব বিশ্বাস আখরোটের ছোবড়ার নিম্নবর্তী খুলির ন্যায়। আখরোটের খুলি যেমন তার ভিতরের শাঁসকে হেফাযৎ করে নিরাপদে রাখে তদ্রূপ সাধারণ লোকের ঈমান ও যুক্তিবাদীদের ঈমান তাদের শাঁসকে অর্থাৎ আত্মাকে দোযখ থেকে নিরাপদে রাখতে পারে। তথাপি খুলির ন্যায় সারশুন্য একত্ববিশ্বাসে শাঁস ও তেলের ন্যায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উন্নত পর্যায়ের একত্ব বিশ্বাসের স্বাদ কেমন করে পাওয়া যাবে ? আখরোটের শাঁস অবশ্যই খুব আদরনীয় ও লোভনীয় পদার্থ। কিন্তু তথাপি তুমি একে তন্মধ্যস্থিত তেলের অর্থাৎ তার সার পদার্থের সাথে তুলনা করলে দেখতে পাবে শাঁস জিনিসটি ছোবড়া ও খুলির তুলনায় অতিশয় পরিস্কার হলেও সার পদার্থ অর্থাৎ তেলের তুলনায় খুবই ভারী এবং অপরিচ্ছন্ন। শাঁসের পরিচ্ছন্নতা অপূর্ণ এবং তেলের পরিচ্ছন্নতা নিতান্ত পূর্ণ। বিশেষত ঃ শাঁসের সাথে সার পদার্থের তুলনা করলে দেখবে যে, তেলের মধ্যে একটা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পদার্থ নেই। অথচ শাঁসের মধ্যে কয়েকটি পদার্থের সমাবেশ রয়েছে। প্রথমত– তার জলীয় অংশটুকু বের করে নিলে কতকগুলো 'ছাবা' বা 'ছোবা' থেকে যায়। আবার জলীয় অংশ থেকে তেল বের করে নিলে 'মচ্‌কা' বা গাদ অবশিষ্ট থাকে। অতএব দেখা যায়, শাঁসের মধ্যে অনেকগুলো পদার্থ রয়েছে। অনুরূপভাবে তাওহীদ জ্ঞানের তৃতীয় স্তরে আরেফ লোকের মনে সৃষ্টি, স্রষ্টা ও সৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য থাকে। বহুদিক মনোনিবেশ করতে হয় বলে এক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা হয় না। পক্ষান্তরে চতুর্থস্তরের

https://kitabbhubon.com

একত্বজ্ঞানই পূর্ণমাত্রার এবং বাস্তবিক একত্ব জ্ঞান। এ স্তরে আরেফ লোকের মনোযোগ কেবলমাত্র আল্লাহ্তা'আলার প্রতিনিবন্ধ থাকে। এ শ্রেণীর একত্ব জ্ঞানী একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কোন পদার্থকে দৃষ্টির সম্মুখে দেখতে পায় না। এমন কি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অচেতন হয়ে যায়। তাঁদের দৃষ্টি থেকে একমাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় পদার্থই লোপ পেয়ে যায়। এমন কি, তার নিজের অস্তিত্ব ও ভুলে যায়। অর্থাৎ সে একমাত্র আল্লাহ্তা'আলা ভিন্ন নিজকেও দেখতে পায় না। অতএব চতুর্থ স্তরের তাওহীদ জ্ঞানই একমাত্র বাস্তব ও প্রকৃত একত্ব জ্ঞান।

চতুর্থ স্তরের তাওহীদ জ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য

প্রিয় পাঠক! তুমি অবশ্যই বলবে– আল্লাহতা'আলার একত্বজ্ঞানের এ চতুর্থ স্তরটি আমার নিকট নিতান্তই কঠিন বলে বোধ হয়। একথা আমাকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমি সৃষ্ট জগতের এতগুলো পদার্থ একটা মাত্র মূল থেকে আগত বলে কিরূপে মনে করব এবং এক বলে সমস্ত পদার্থতে কেমন করে বিশ্বাস করব। আমাদের দৃষ্টিতে এক একটি সৃষ্টি পদার্থের পশ্চাতে বহু সংখ্যক কারণ ও উপকরণ দেখতে পাচ্ছি, এ সমুদয়কে কিরূপে এক দেখতে পারি ? একদিকে আসমান রাজ্য ও তন্মধ্যস্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেখছি। অপরদিকে ভূমন্ডল এবং তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য প্রকারের পদার্থ দেখতে পাচ্ছি। এত অগণিত প্রকারের পদার্থ কেমন করে এক হতে পারে ? পাঠক! অবগত হও, উপরে আমরা তাওহীদ জ্ঞানকে চারটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছি। তন্মধ্যে মুনাফিকদের তাওহীদ সম্পূর্ণ মৌখিক, অন্তরের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। সর্বসাধারণের তাওহীদ জ্ঞান এতেক্কাদী বা 'তাকলীদী' অপরের দেখা দেখি উৎপন্ন হয়। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের তাওহীদ জ্ঞান 'দলিলী' অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে অর্জিত। এ ত্রিবিধ তাওহীদ জ্ঞান তো বুঝতে পারা তোমার পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু চতুর্থস্তরের তাওহীদ জ্ঞান আয়ত্ত করা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাওয়াক্কুল অর্জন করতে হলে চতুর্থ স্তরের তাওহীদ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তৃতীয় স্তরের তাওহীদ জ্ঞানই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি চতুর্থ স্তরের একত্ব জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি, তাকে তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়ে দেয়া এবং তার বিস্তৃত বিবরণ বুঝিয়ে দেয়া সুকঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার। তবে তুমি মোটামুটিভাবে নিম্নের তথ্যটুকু

https://kitabbhubon.com

বুঝিয়ে নিতে চেষ্টা কর। এমনও হতে পারে যে, তুমি অজস্রও অসংখ্য পদার্থ দেখতে পাচ্ছ। তৎসমুদয়ের মধ্যে হয়ত জাতিগত বা প্রকারগত এমন একটি গুণ বা অবস্থা আছে যা সমান সমানভাবে সমস্ত পদার্থের মধ্যে ব্যাপক রয়েছে এবং সে জাতিগত গুণ বা অবস্থার মধ্যে সমস্ত পদার্থের ঐক্য থাকা বশতঃ তাদেরকে এক পদার্থ বলা হয়েছে। আরেফ লোকেরা যেহেতু সে অবস্থা গুণের পরিপ্রেক্ষিতেই বস্তুসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকেন। সুতরাং সমস্ত পদার্থ তাঁদের দৃষ্টিতে এক বলেই বোধ হয়। এ কারণেই তাঁরা সৃষ্ট জগতের সমস্ত পদার্থকে এক পদার্থরূপে দেখতে পান। বহু সংখ্যক পদার্থরূপে তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, বহুবিধ পদার্থ বা অংশের সমাবেশে মানবদেহ সৃষ্টি হয়েছে। যথা-মাংস, চর্ম, অস্থি, মস্তক, হস্ত, পদ, উদর, হৃৎপিন্ড প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাগতিকভাবে মানুষ একটি পদার্থ। এ জন্যই বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি একজন মানুষকে দর্শন করে কেউ বলতে পারে– 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি।' তখন তার হস্তপদ, প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর কথা হয়ত তার কল্পনায়ও উদর হয় না। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, 'কি দেখলে ?' সে উত্তর করবে– 'আমি একটি পদার্থই দেখেছি, বেশি কিছুই দেখিনি। অর্থাৎ আমি একজন মানুষ দেখেছি। তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিনি। এরূপে কেউ তার প্রিয়জনের মনোহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি, গুণ বা অবস্থার কথা মনে পড়ে তৎসমুদয়ের বিষয় ভাবতে আরম্ভ করলে, যদি তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর কিসের ভাবনা ভাবছ ? সে উত্তর করবে- আমি কেবলমাত্র একটা বস্তু অর্থাৎ আমার প্রিয়জনের বিষয়ই চিন্তা করতেছি। আর কোন কিছুই চিন্তা করছি না। দেখ, প্রিয়জন একটিমাত্র পদার্থ হলেও তার মধ্যে ভালবাসার উপযোগী বহুবিধ পদার্থ রয়েছে। অথবা বহুবিধ পদার্থের সমাবেশে তার অস্তিত্ব। যথা, তার মুখমন্ডল, কণ্ঠস্বর, গুণ, অবস্থা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি। সুতরাং, লোকটি প্রিয় হলে তার মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থই প্রিয় হল এবং এ সমুদয়ের সমষ্টি একটি মাত্র বলে তার নিকট বিবেচিত হচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর করবে, আমি একটামাত্র পদার্থের বিষয় চিন্তা করছি। যা হোক, প্রিয়জনের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মিলে প্রথমত, দুনিয়ার সমস্ত পদার্থের চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র প্রিয়জনের চিন্তায়ই নিমগ্ন হয়। পরিশেষে নিজকেও ভুলে যায় এবং কেবলমাত্র প্রিয় জনের চিন্তা ব্যতীত আর কোন পদার্থের চিন্তাই তার কল্পনায় আসে না।

https://kitabbhubon.com

প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, মা'রেফৎ বা তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতির পথে এমন একটি 'মোকাম' বা উন্নতস্তর আছে, তথায় উন্নীত হলে আরেফ লোকেরা দেখতে পায় যে, বিশ্বজগতে যত কিছু আছে তৎসমুদয় পদার্থই কোন এক জাতিগত সম্পর্কে পরস্পরের সাথে যুক্ত ও মিলিত রয়েছে। তারা সকলে মিলিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে একটা প্রাণীর মতই তার দৃষ্টিগোচর হয়। আসমান রাজ্য, ভূমণ্ডলঃ তন্মধ্যস্থিত গ্রহ নক্ষত্রাদি' যাবতীয় পদার্থ অর্থাৎ বিশ্বজগতের সমস্ত অংশগুলো এমনি একটা সূত্রে পরস্পর গ্রন্থিত রয়েছে যে, তারা সকলে মিলে যেন একটা মাত্র জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থই এক হিসেবে এক বিশেষ সম্বন্ধে স্বীয় স্রষ্টা বা পরিচালকের সাথে জড়িত রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বিভিন্ন অংশগুলো আত্মা ও বুদ্ধির সাথে এক বিশেষ সম্বন্ধে জড়িত আছে। কেননা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতা'আলা যেমন-বিশ্বজগতের পরিচালক, আত্মা এবং বুদ্ধিও তদ্রূপ দেহরাজ্যের পরিচালক। অবশ্য যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে, কেবল কোন বিশেষ ক্ষেত্রেই তা বিশ্বজগতের সাথে বিশ্ব পরিচালকের সম্বন্ধে অনুরূপ বটে, সর্বদিক দিয়ে অনুরূপ নয়।

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

'আল্লাহতা'আলা আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এ বাক্যটির তাৎপর্য ও মর্মার্থ যে পর্যন্ত মানুষ বুঝতে না পারবে ততক্ষন পর্যন্ত উপরোক্ত এ সূক্ষ্ম বিষয়টির মর্মও সে বুঝতে পারবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলবার প্রয়াস না পেয়ে নীরব থাকাই উত্তম। কেননা এ শ্রেণীর উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা কেবল খোদাগত প্রাণ পাগল বৃন্দের শৃঙ্খল নাড়া দিয়ে তাঁদের উন্মাদনা বৃদ্ধি করতে পারে। খোদা প্রেমের শরাবে যারা মাতাল তাদেরকে উন্মত্তকর সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দিতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তা উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভব নয়।

তৃতীয় স্তরের তাওহীদ জ্ঞানই তাওয়াক্কুলের বুনিয়াদ

ইতোপূর্বে ওপরে বলা হয়েছে যে, মুনাফেকদের তাওহীদ শুধু মৌখিক; অন্তরের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। তারা কেবল মুছলমানদের তরবারি থেকে নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য মুখে মুখে আল্লাহ্তা'আলার

—৭

https://kitabbhubon.com

একত্বে বিশ্বাস করে বলে প্রকাশ করে থাকে। আর সাধারণ লোক ও যুক্তিবাদি দার্শনিকগণ কোন প্রকার দেখাদেখি ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নিজেদের অন্তরে তাওহীদ জ্ঞান উৎপন্ন করত দোযখের অগ্নি থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে নেয়। কাজেই এ দু'শ্রেণীর তাওহীদ জ্ঞানের সাথে তাওয়াক্কুলের কোনই সংস্রব নেই। অবশ্য এক শ্রেণীর উন্নত পর্যায়ের আরেফ লোক বিশ্বজগতের কার্যাবলী ও অবস্থানসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক জ্ঞান-চক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান যে, জগতের সৃজন, পালন ও রক্ষনাবেক্ষন প্রভৃতি কার্যের একমাত্র কারণ আল্লাহতা'আলা। এ তিন স্ত রের একত্ব জ্ঞান বুঝতে পারা যায়। কিন্তু চতুর্থ স্তরের একত্ব জ্ঞান বড় দুর্বোধ্য ও জটিল বিষয়। যা হোক, তাওয়াক্কুলের অভ্যাস করতে চতুর্থ শ্রেণীর একত্ব (তাওহীদ) জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তৃতীয় স্তরের তাওহীদ জ্ঞানই যথেষ্ট। সুতরাং তৃতীয় স্তরের একত্ব জ্ঞানকে তাওয়াক্কুলের প্রাথমিক ভিত্তি বলা যায়।

তৃতীয় স্তরের তাওহীদ জ্ঞানকে 'তাওহীদে ফেলী অর্থাৎ ক্রিয়া বিষয়ক তাওহীদও বলা হয়। এ সম্বন্ধে (ইমাম গায্যালী ছাহেবের) এহইয়া-উল-উলুম কিতাবে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানবানগণ উক্ত কিতাব দেখে সবিশেষ অবগত হতে পারেন।

কোন সৃষ্ট পদার্থই স্বাধীন ক্ষমতায় কোন কাজ করতে পারে না

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টিও বায়ু প্রভৃতি পদার্থ যাদেরকে তুমি জাগতিক যাবতীয় কাজের কারণ বলে মনে করে থাক, তৎসমুদয় আল্লাহতা'আলার হস্তে এমন অধীন হয়ে আছে। যেমন–লেখকের হস্তে কলম। লেখকের হস্ত সঞ্চালন ব্যতীত কলমের যেমন-লিখবার ক্ষমতা নেই; তদ্রূপ আল্লাহতা'আলার ইচ্ছা ও নির্দেশ ভিন্ন কোন পদার্থের এমন স্বাধীন ক্ষমতা নেই যে, তা নিজে নিজে কোন কাজ করে। কাজ করা তো দূরের কথা স্বেচ্ছায় এদের নড়াচড়ার ক্ষমতাও নেই। একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা মহাপ্রভু সৃষ্ট পদার্থসমূহের প্রত্যেকটিকে যথা সময়ে প্রয়োজনানুসারে সঞ্চালিত করে থাকেন। সৃষ্ট-জগতের কোন পদার্থই নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারে না। সুতরাং অমুক বস্তু বা অমুকগ্রহ অমুক কাজ সম্পন্ন করছে বলে মনে করা ভুল। কাউকেও পুরস্কার প্রদানে গৌরবান্বিত করার আদেশ কলমের সাহায্যেই কাগজের ওপর লিখিত হয়ে

https://kitabbhubon.com

থাকে। কিন্তু এস্থলে এরূপ মনে করা নিতান্তই অন্যায় হবে যে, কলম ও কাগজের ক্ষমতায়ই পুরস্কার হচ্ছে। তবে সৃষ্ট জীবের স্বাধীন ক্ষমতা বস্তুটি কি ? তা গভীরভাবে ভেবে দেখবার বিষয়।

স্বাধীন ক্ষমতায় মানুষ কোন কাজই করতে পারে না

সকলেই মনে করে থাকে, মানবের যাবতীয়' কাজ কর্মে তাদেরও কিছুটা স্বাধীন ক্ষমতা রয়েছে– নতুবা তাদের কাজের বিনিময়ে শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান নিতান্তঅযৌক্তিক হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবিক পক্ষে তদ্রূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও পরাধীন। ইতোপূর্বে বহুবার বলা হয়েছে যে, মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম তারই ক্ষমতাপ্রসূত। কিন্তু সে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তার ইচ্ছা শক্তির অধীন। অন্তরে ইচ্ছা উদয় হলে কাজের ক্ষমতা আপনাআপনি এসে উপস্থিত হয়। যেরূপ ইচ্ছা অন্তরে উৎপন্ন হয় কাজও তদ্রূপই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ইচ্ছা মানব-হৃদয়ে আপনা আপনি উৎপন্ন হয় না, আল্লাহতা'আলা সৃষ্টি করে থাকেন। তা সহজেই অনুমান করা যায় যে, আল্লাহতা'আলার মানব হৃদয়ে ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি করার সময় এতে তাঁর কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে এবং সে উদ্দেশ্যের অনুরূপ ইচ্ছাই মানব-হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখন বুঝা গেল যে, কার্যক্ষমতার অধীন, ক্ষমতা আবার ইচ্ছার বশীভূত, সে ইচ্ছাও আবার মানুষের হাতে নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতা'আলার ইচ্ছার অধীন। অতএব মানুষের সর্বপ্রকারের গতিবিধিই সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'আলার মুষ্টির মধ্যে রয়েছে। কোন কাজই মানুষের নিজের হাতে নেই। মানুষ নিতান্ত অসহায় এবং পরাধীন।

মানবের কার্যাবলী তিন প্রকার

প্রিয় পাঠক! মানুষের কার্যাবলী কত প্রকার এবং তা কি প্রকারের সম্পন্ন হয়ে থাকে, একথা ভালরূপে জানতে পারলে তুমি এও পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারবে যে, মানুষের কাজের ওপর তাদের কোনই হাত বা ক্ষমতা নেই। এ কেবল আল্লাহ্তা'আলার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারেই হয়ে থাকে। যা হোক, অবগত হও যে, মানুষের কর্যাবলী তিন প্রকার। প্রথম প্রকারের

https://kitabbhubon.com

নাম فِعْلِ طَبَعِىْ অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্য, এর দৃষ্টান্ত এরূপ মনে কর, যেমন পানির ওপর পা রাখলে তৎক্ষনাৎ পা পানির মধ্যে তলিয়ে যায়। তা দেখে দর্শক মনে করতে পারে যে, মানুষের পা পানিকে দ্বিধা বিভক্ত করে এক ভাগকে অপর ভাগ থেকে পৃথক করে ভিতরে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় প্রকারের নাম ঃ فِعْلِ اِرَادَتِىْ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত কার্য, লোকে বলে থাকে 'মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। লোকে মনে করে, এটা স্বেচ্ছা সম্পন্ন কাজ। তৃতীয় প্রকারের নাম فِعْلِ اِخْتِيَارِىْ অর্থাৎ স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্ম। চলাফেরা করা, কথাবার্তা বলা প্রভৃতি এ শ্রেণীর কাজ।

প্রথমে طَبَعِىْ অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাচ্ছে। স্বাভাবিক কার্যের ওপর লোকের কোন ক্ষমতা বা হাত না থাকা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। পানির ওপর পা রাখলে তার ভারে পানি আপনা আপনিই ফেটে দু'দিকে সরে যায়। এতে মানুষের ইচ্ছা বা ক্ষমতার কোনই হাত নেই। পানির স্বভাবই এরূপ যে, তার ওপর পদ স্থাপনকারীর ইচ্ছা থাকুক আর না-ই থাকুক পায়ের ভারে পানি দু'দিকে সরে যাবে এবং পাখানা পানির মধ্যে ডুবে যাবে। তুমি পানিতে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করলে পানির তরলতা হেতু প্রস্তরের ভার সহ্য করতে না পেরে পানি দু'দিকে সরে যাবে এবং প্রস্তর খণ্ড পানিতে ডুবে যাবে। অথচ এ ডুবে যাওয়া বা পানিকে দ্বিধা বিভক্ত করে দেয়া প্রস্তরের কাজ নয়। প্রস্তারের ভারের দরুন পানির মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটা স্বভাবেরই নিয়ম এবং তা অনিচ্ছা সম্পাদিত।

দ্বিতীয় প্রকারের কার্য ইচ্ছা-সম্পাদিত। এ সম্বন্ধে চিন্তা করলেও দেখা যায় যে, এতেও মানুষের কোন হাত নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ন্যায় যে সমস্ত কার্যকে ইচ্ছা-সম্পন্ন কার্য বলে মনে হয়, তাদের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে এর মধ্যেও মানুষের কোন ক্ষমতার প্রভাব দেখা যাবে না। কারণ, মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও একটা নিশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারবে না। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা একান্ত অনিবার্য। তজ্জন্য নিশ্বাস ত্যাগের ও গ্রহণের ইচ্ছা তার মধ্যে আপনা আপনিই বাধ্যতামূলকভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি একটা সূচ হাতে নিয়ে কারও চোখের প্রতি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ

https://kitabbhubon.com

করতে চাইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয় চোখের পলক বন্ধ করে ফেলবে। হাজার চেষ্টা করলেও তেমন সময় সে চোখের পাতা বন্ধ না করে কিছুতেই থাকতে পারে না। কেননা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবই এরূপ যে, ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তদ্রূপ ইচ্ছা তার মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে আপনা আপনি উৎপন্ন হয়ে থাকে। পানির ওপর দাঁড়ালে পানি দু'দিকে সরে গিয়ে মানুষের পা ডুবে যাওয়া যেমন সৃষ্টির অনিবার্য নিয়ম তদ্রূপ নিশ্বাস গ্রহণ করা এবং চোখের পাতা বন্ধ করাও সৃষ্টির বাধ্যতামূলক নিয়ম। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, স্বাভাবিক কার্য ও ইচ্ছা সম্পন্ন কার্য, এ উভয় শ্রেণীর কার্যই আল্লাহর সৃষ্টিগত নিয়মানুসারে বাধ্যতামূলক এতদুভয় শ্রেণীর কার্যের মধ্যে মানবের ইচ্ছা বা স্বাধীন ক্ষমতার কোনই অধিকার নেই।

তৃতীয় فِعْلِ اِخْتِيَارِىْ অর্থাৎ স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কার্য ঃ যথা- চলা-ফেরা করা, কথাবার্তা বলা প্রভৃতি কার্যে অবশ্য একটু জটিলতা রয়েছে। এ শ্রেণীর কার্যে মানুষের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে বলে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায়। মানুষ ইচ্ছা করলে এ সমস্ত কাজ করতেপারে এবং ইচ্ছা করলে বন্ধ রাখতে পারে। অতএব এ শ্রেণীর কাজে মানুষের ক্ষমতার বা ইচ্ছার কোন হাত নেই বললে তা মেনে নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হে প্রিয় পাঠক! তুমি এতটুকু বুঝতে চেষ্টা কর যে, মানুষের মনে তখনই কোন কাজের ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে থাকে যখন তার বিবেক বুদ্ধি তাকে নির্দেশ প্রদান করে যে, এ কার্যে তার মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সে কাজে মঙ্গল আছে কিনা তা নির্ণয় করবে কোন কোন সময় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন হয়ে থাকে। চিন্তার পর বিবেক নির্দেশ প্রদান করে যে, সে কাজে তার মঙ্গল রয়েছে, তৎক্ষণাৎ উক্ত কার্য সম্পন্ন করার জন্য হৃদয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ে কর্ম সম্পাদনকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সঞ্চালিত করার জন্য ক্ষমতাকে আদেশ করে। তখন কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ম সম্পাদনের চেষ্টার উদ্ভব হয়। যেমন– চোখে সূচ বিদ্ধ করবার ভয় দেখালে তৎক্ষনাৎ তড়িৎ গতিতে বিবেক বুঝতে পারে যে, সূচ বিদ্ধ হলে চোখের ক্ষতি হবে এবং চোখের পাতা বন্ধ করলে উক্ত ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত জ্ঞান আপনা আপনি উৎপন্ন হয়ে থাকে, চিন্তা করে স্থির করার প্রয়োজন হয় না। সূচ বা অন্য কিছুকে চোখের প্রতি আসতে দেখলে তৎক্ষণাৎ বিনা চিন্তাতেই বুঝতে পারে যে, চোখ বন্ধ করলে উপকার হবে। এ জ্ঞান তখন তাকে চোখ বন্ধ করবার জন্য নির্দেশ প্রদান করে এবং চোখ

https://kitabbhubon.com

বন্ধ করার ইচ্ছা মনে জন্মিয়ে দেয়। ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া মাত্র চোখ পলকের মধ্যে সঞ্চালন শক্তি এসে আপনা আপনি কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে যায় এবং চোখের পাতা দ্বারা চোখের গোলকটিকে আবৃত করে ফেলে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ন্যায় অন্যান্য ইচ্ছাসম্পন্ন কার্যেও মানুষ বিনা চিন্তায় তড়িৎগতিতে বুঝতে পারে, এ কার্য করলে উপকার এবং না করলে ক্ষতি হবে।

অতএব তা সম্পন্ন করার জন্য ইচ্ছা জন্মে। পলায়ন করা, কথা বলা প্রভৃতি ক্ষমাকৃত কার্যেও তদ্রূপ উপকার প্রাপ্তির আশা না পেলে তা করবার জন্য মানুষের মনে ইচ্ছার উদয় হয় না। অবশ্য এ শ্রেণীর কার্যে উপকার প্রাপ্তির জ্ঞান গভীর চিন্তার পরে কিছু বিলম্বে লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঐচ্ছিক কার্যে যথা শ্বাস-প্রশ্বাস জাতীয় কার্যে উপকার প্রাপ্তির জ্ঞান তড়িৎ গতিতে বিনা চিন্তায়ই উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু উভয়বিধ কার্যের মধ্যে বিলম্বের পার্থক্যটুকু বাদ দিলে উভয় ক্ষেত্রে উপকার প্রাপ্তির জ্ঞান থেকেই কর্মের ইচ্ছা জন্মিয়ে থাকে এবং ইচ্ছার প্রভাবেই ক্ষমতার উদয় হয়। সে ক্ষমতাই কার্য সম্পন্ন করে দেয়। অতএব দেখা যায়, এ উভয়বিধ কার্যেই কর্তার কোন স্বাধীন কোন ক্ষমতা নেই। কোন ব্যক্তিকে প্রহার করবার নিমিত্ত লাঠি উত্তোলন করলে সে ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারে যে, এখন পলায়নই মঙ্গল। এমনকি, ছাদের ওপর অবস্থিতিকালে কেউ তার প্রতি লাঠি উত্তোলন পূর্বক অগ্রসর হলে সেখানেও সে দৌড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করবে এবং ছাদের কিনারায় পৌঁছে যখন দেখতে পাবে যে, লাফিয়ে পড়া লাঠির আঘাত খাওয়া অপেক্ষা সহজ, তখন সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তেও দ্বিধা বোধ করবে না, কিন্তু যদি বিবেচনা করে দেখতে পায় যে, ছাদ খুব উঁচু, তথা থেকে লাফিয়ে পড়লে হাত পা-ভেঙ্গে যাওয়ার এমন কি প্রাণ বিনাশেরও আশঙ্কা আছে, তদপেক্ষা লাঠির প্রহার সহ্য করাই সহজ তখন সে লাফিয়ে না পড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার ধাবমান পদদ্বয়ের গতি আপনা আপনি থেমে যাবে, লাফিয়ে পড়বার ক্ষমতাই জন্মিবে না। কেননা পায়ের গতি বা স্থিতি সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার অধীন, ইচ্ছাশক্তি আবার বুদ্ধির আজ্ঞাবহ। বুদ্ধি বিচার পূর্বক যে কার্যকে হিতকর বা উপকারী বলে স্থির করবে ইচ্ছা সেদিকেই ঝুঁকে পড়বে এবং তদনুযায়ী কার্য করবে।

এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে, তবে যদ্যপি হাতে ক্ষমতা বিদ্যমান এবং ছুরিও নিকটেই রয়েছে তথাপি সে নিজের গলা কাটতে পারে না। এর কারণ এই যে, তার

https://kitabbhubon.com

হাতের ক্ষমতা ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছাও আবার বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি যা নির্দেশ বা সাব্যস্ত করে, ইচ্ছা তদনুযায়ী কাজ করে থাকে। বুদ্ধি যখন নির্দেশ করে যে, এ কাজ কর। এ তোমার জন্য হিককর এবং এ করার উপযোগী কাজ, তখন সে কাজ করবার জন্য ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। বুদ্ধিও আবার স্বাধীন নয়। কেননা বুদ্ধি বা বিবেক শক্তি একখানা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, কেবল উত্তম ও করণীয় কাজের প্রতিবিম্বই তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মন্দ এবং করবার অনুপযোগী কার্যের ছবি তাতে পড়ে না। যেহেতু নিজের গলা কেটে আত্মরক্ষা করা মন্দ কাজ; অতএব তার ছবি বুদ্ধিরূপ দর্পণের মধ্যে পতিত হয় না। এজন্যই বুদ্ধি ইচ্ছা শক্তিকে তা করবার জন্য পরামর্শ দেয় না। কাজেই সে ব্যক্তি ক্ষমতা এবং উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করতে পারে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি সাংঘাতিক বিপদে বা পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে এবং আত্মহত্যা করাকে বিপদের দুঃসহ যন্ত্রনা অপেক্ষা সহজ ও হিতকর বলে বিবেচনা করে, তখন বুদ্ধির দর্পণে আত্মহত্যার ছবি পতিত হয়, ফলে সে আত্মহত্যা করতে সক্ষমও হয়ে থাকে। বুদ্ধি, ইচ্ছা, কর্মক্ষমতা প্রভৃতি পরাধীন থাকা সত্ত্বেও এ শ্রেণীর কার্যগুলোকে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কার্য এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, বুদ্ধি স্বীয় বিচার ক্ষমতা বলে কার্যটির হিতকারিতা নির্ণয় করে লয় এবং সে উপকার প্রাপ্তির জ্ঞান মনে জন্মিয়ে দেয়। অন্যথায় এ কার্যটির হিতকারিতা যখন হৃদয় পটের মধ্যে আপনা আপনি প্রকাশিত হল, বুদ্ধির কোন কার্যকারিতা তাতে রইল না। তখন একে পূর্বোক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে লওয়া এবং সূঁচবিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চোখে বন্ধ করে ফেলা প্রভৃতি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটিত কার্যাবলির শ্রেণীভুক্তই বলা যায়। আবার শ্বাস গ্রহণ করা ও চোখ বন্ধ করা কার্যগুলো ও পা পানিতে ডুবে যাওয়ার ন্যায় আল্লাহতা'আলার সৃষ্টিগত নিয়মানুসারেই ঘটে থাকে। অতএব দেখা যায় ত্রিবিধ প্রকারের কোন শ্রেণীর কাজেই মানুষের কোন স্বাধীন ক্ষমতা নেই। সর্ববিধ কাজই আল্লাহতা'আলার সৃষ্ট নিয়মানুসারেই ঘটে থাকে। এ সমস্ত কারণগুলো পরস্পর জড়িত রয়েছে। কার্যকারণসমূহের পরস্পর মিলনে বহু দীর্ঘ শৃঙ্খলের সৃষ্টি হয়েছে। যত দীর্ঘই হোক না কেন, গোড়াতে দেখা যাবে যে, কোন কাজেই মানবের

https://kitabbhubon.com

কোন স্বাধীন ক্ষমতা নেই। আল্লাহতা'আলা মানুষের কর্মেন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে যে কর্ম ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন তা উক্ত শৃঙ্খলের কড়াসমূহের মধ্যকারই একটা কড়া বটে। এখান থেকে লোকে ধারণা করে যে, তার মধ্যে কর্ম ক্ষমতা আছে। এরূপ ধারণা করা মানুষের নিছক ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মানুষ যে বস্তুকে নিজস্ব ক্ষমতা বলে মনে করছে তা প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষমতা নয়। তা বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বপতি আল্লাহতা'আলার ক্ষমতা। মানুষের সাথে তার কেবল এতটুকু সম্পর্ক যে, মানুষের কেবল আল্লাহতা'আলার ক্ষমতা প্রবাহের জন্য একটা মধ্যবর্তী পদার্থ মাত্র। ফলকথা, মানুষ আল্লাহতা'আলার ক্ষমতা প্রবাহিত হওয়ার একটি পথ বা রাস্তা। আল্লাহতা'আলা মানুষের মধ্যে সে ক্ষমতা সৃষ্টি করে থাকেন। দেখ বায়ুর ধাক্কায় বৃক্ষ নড়ে, কিন্তু আল্লাহ্তা'আলা বৃক্ষের মধ্যে ক্ষমতা বা ইচ্ছা বলতে কোন পদার্থ সৃষ্টি না করার দরুন কেউ তাকে আল্লাহতা'আলার ক্ষমতা প্রবাহের স্থান বা রাস্তা বলে মনে করে না। অর্থাৎ বৃক্ষের মধ্যে কর্মশক্তি বা ইচ্ছা আছে বলে কেউ কোন দিন ধারনা করে না। বায়ু প্রবাহের কারণে বৃক্ষের সেই হেলে-দুলে পড়াকে স্বেচ্ছাকৃত স্বাধীন নড়াচড়া না বলে 'পর সঞ্চালিত' দোলন বলা হয়। আর আল্লাহ্ যা কিছু করেন নিজস্ব ক্ষমতায়ই করে থাকেন। তাঁর ক্ষমতার ওপর অপর কোন পদার্থেরই হাত নেই। অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতা অপর কোন বস্তুর অধীনে নয়; সুতরাং তাঁর কার্যকে اختراع অর্থাৎ 'সৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। মানুষের কার্য যেহেতু বৃক্ষের নড়াচড়ার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে পর সঞ্চালিত নয়, আবার আল্লাহতা'আলার কর্যের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্নও নয়, বরং মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছা অন্যান্য বহুবিধ কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে এবং সে সমস্ত কারণ বা উপকরণের ওপর মানুষের কোন হাত নেই। এ কারণে মানবের কার্য আল্লাহতা'আলার কার্যের ন্যায় স্বয়ংসিদ্ধ ক্ষমতা বলে সম্পন্ন নয় বলে তাকে اختراع وخلق অর্থাৎ সৃষ্টিও বলা যায় না, আবার বৃক্ষের নাড়াচড়ার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে পর সঞ্চালিত নয় বলে তাকে বাধ্যতামূলক বা পরাধীন কার্যও বলা যায় না; বরং মানুষের কার্যকে তৃতীয় এক নামে অভিহত করা আবশ্যক। এজন্য মানবের কার্যকে আরবী ভাষায় كسب 'কাছব' অর্থাৎ 'উপার্জন' নাম দেয়া হয়েছে। যা হোক, ওপরে

https://kitabbhubon.com

বর্ণিত এ সমস্ত কারণে বুঝা গেল যে, যদিও প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় কার্য মানুষের ইচ্ছা এবং স্বাধীন ক্ষমতায় সংঘটিত হচ্ছে বলে বুঝা যায়, তথাপি যেহেতু তাদের ইচ্ছা বা শক্তি তাদের হস্তগত নয়; বরং ইচ্ছা ও ক্ষমতার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে পরাধীন। সুতরাং বলা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে মানুষের কোন কার্যই তার নিজস্ব স্বাধীন ক্ষমতায় সম্পন্ন হয় না।

স্বাধীন ক্ষমতা বিহীন মানুষ পাপ পুণ্যের শাস্তি বা পুরস্কার কেন পাবে ?

প্রিয় পাঠক! এখন তুমি হয়ত বলতে পার, কার্যের ওপর যখন মানুষের কোন স্বাধীন ক্ষমতা নেই। তখন মানুষ নিজ কর্মের বিনিময়ে শাস্তি বা পুরস্কৃত লাভের উপযোগী কেমন করে হবে এবং তাদের জন্য শরীঅতের বিধিনিষেধ নির্ধারিত হওয়ারই বা অর্থ কি ? প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, 'তাওহীদের' এ স্থানটি বড় সঙ্কটময় স্থান, একে অতল সমুদ্রের ঘুর্ণিপাকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অধিকাংশ দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোক এ ঘুর্নিপাকের আবর্তনে ডুবে মরে। যে ব্যক্তি পানির ওপর দিয়ে চলবার ক্ষমতা রাখে কেবল সে ব্যক্তি এ দুস্তর ঘুর্ণিপাক পার হয়ে যেতে পারে। পানির ওপর দিয়ে চলতে না পারলে কেউ এ ভীষণ সঙ্কটময় স্থান পার হতে পারে না। তবে যারা অসাধারণ সাঁতারপটু তারা কখন কখন মরতে মরতে, বেঁচে যায়। অনেক লোক এরূপে এ আবর্তন থেকে বেঁচে যায় যে, ডুবে মরবার ভয়ে এর ত্রি সীমানার মধ্যেই পা রাখে না। সাধারণ শ্রেণীর লোক এ দুস্তর সমুদ্রের সন্ধানই জানে না। এ না জানাও তাদের প্রতি এক প্রকার মেহেরবাণী বলতে হবে। তারা এ মহা সংকটময় সমুদ্রের কাছেও আসবার সুযোগ পেল না। তারা এ সমুদ্রের সন্ধান জানতে পারলে, এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার কারণে হয়ত কিনারে এসে হঠাৎ ডুবে মারা যেত। অতএব সে ভীষন সমুদ্রের দিকে যেতে না দিয়ে তাদের প্রতি মহাঅনুগ্রহ করা হয়েছে। এ তাওহীদের দরিয়ার পা রেখে সন্তরণ পটু না হওয়ার দরুনই অধিকাংশ লোক মারা যায়। সম্ভবতঃ এরা সন্তরণ বিদ্যা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই রাখে না বলে কিংবা নিজের ক্ষমতার ধোকায় প্রতারিত হয়ে অনাবশ্যক বোধে সন্তরন শিক্ষার জন্য চেষ্টা করে না। কাজেই সন্তরনে অপটুতা বশতঃ সেই ভীষণ সমুদ্রের আবর্তনে ডুবে মরে। তাওহীদ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকে এরূপ মনে করে থাকে যে, মানব সম্পূর্ণরূপে

https://kitabbhubon.com

পরাধীন, ক্ষমতা বলতে তার কিছুই নেই। মানবের সমস্ত কার্যই আল্লাহতা'আলার ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। আবার তারা এও মনে করে যে, সৃষ্টির আদিকালে যার ভাগ্যে যেরূপ নির্ধারিত হয়েছে, তার ব্যতিক্রম কখনও হবে না। দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলে হাজার চেষ্টায়ও তা ফিরাতে পারবে না। আর সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলে তা লাভের্ জন্য কোন চেষ্টা বা পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। আপনা আপনিই তা সম্পন্ন হবে। এরূপ বিশ্বাস পোষণ করা নিতান্ত মুর্খতা, পথভ্রষ্টতা এবং ধ্বংস প্রাপ্তির কারণ। এ জাতীয় বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য যদিও কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা উচিত নয়, তথাপি কথা প্রসঙ্গে যখন এতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, তখন কিছু আভাস দেয়া সঙ্গত মনে করি।

প্রিয় পাঠক" তুমি যে বলেছ, অক্ষম মানব তার কার্যের বিনিময়ে ছওয়াব বা আযাব কেন প্রাপ্ত হয় ? এর উত্তরে এতটুকু কথা জেনে লও, পাপকার্য করলে আল্লাহতা'আলা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে শাস্তি প্রদান করবেন, একথাটি ঠিক নয়। অনুরূপভাবে তুমি সৎকার্য করলে আল্লাহতা'আলা তোমার প্রতি প্রসন্ন বা সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে ছওয়াব বা পুরস্কার প্রদান করবেন তাও ঠিক নয়। একবার সন্তুষ্ট আবার অসন্তুষ্ট হওয়া স্বভাবের পরিবর্তন বটে। আল্লাহতা'আলার স্বভাব সর্বপ্রকারের পরিবর্তন থেকে পবিত্র। তবে তোমার শাস্তিও শান্তির মমার্থ এই যে, তোমার দেহে রক্ত, পিত্ত বা অন্য কোন মৌলিক পদার্থ দুষিত হলে তাতে তোমার দেহে এক প্রকারের অবস্থা প্রকাশ পায়, তাকে রোগ বলে। রোগ প্রকাশ পাওয়ার উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করলে আবার ওষুধের ক্রিয়া এক প্রকারের অবস্থার আবির্ভাব হয় তাকে সুস্থতা বলে। এরূপে যখন তোমার অন্তরে লোভ ও ক্রোধের প্রাবল্য ঘটে এবং তুমি তাদের বশীভূত হয়ে পড়, তাতে তোমার হৃদয়ে এক প্রকারের অগ্নি উৎপন্ন হয়ে তোমার অন্তরের অন্তঃস্থল দগ্ধ করতে আরম্ভ করে দেয়, তা থেকেই তোমার বিনাশ সাধন হবে। এ মর্মেই হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْغَضَبُ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ ক্রোধ অগ্নির একটি টুকরা বিশেষ। এ উক্তিটির তাৎপর্য এই যে, যখন ক্রোধকে তুমি স্বীয়হৃদয়ের মধ্যে প্রবল করে নিবে, তখন তা অগ্নি খন্ডের ন্যায় তোমার হৃদয়কে দগ্ধ করতে থাকবে। আবার বুদ্ধির আলোক বর্ধিত হলে যেমন–

https://kitabbhubon.com

অন্তরের লোভ ক্রোধরূপ প্রজ্জলিত অগ্নিকে নির্বাপিত করে ফেলে তদ্রূপ ঈমানের আলোক দোযখের অগ্নি নির্বাপিত করে দেয়। এ কারণেই ক্বিয়ামতের দিন দোযখ ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবে–

جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَإِنَّ نُوْرَكَ أَطْفَأَ نَارِيْ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সরে যাও, তোমার ঈমানের আলোকে আমার অগ্নি নির্বান করে দিচ্ছে। দোযখ ঈমানের নিকট এই যে, ফরিয়াদ করে থাকে। তা কথাবার্তায় নয়, বরং অবস্থায় তা বুঝা যায়। ঈমানের আলোক দর্শন করবার সাধ্য দোযখের নেই। অতএব ঈমানের আলোক দেখামাত্র সে পালাতে আরম্ভ করে। মশা যেমন বায়ু প্রবাহ দেখলেই উড়ে পালায়। বুদ্ধির নূর দর্শন মাত্র অন্তরের ক্রোধ ও লোভ তদ্রূপ বেগে পলায়ন করে। যা হোক, প্রিয় পাঠক। তোমার শাস্তির জন্য অন্য কোন স্থান থেকে কোন পদার্থ আনয়ন করতে হবে না। তোমারই উপার্জিত দ্রব্য তোমাকে দেয়া হবে। এই মর্মেই বলা হয়েছে–

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ-

নিশ্চয়ই তৎসমুদয় তোমাদেরই কৃতকর্ম এখন তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফল কথা, তোমারই ক্রোধ এবং তোমারই লোভ তোমার দোযখ শাস্তির মূল কারণ। তা তোমারই সাথে তোমার অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তোমার অন্তরের সত্যিকারের জ্ঞান থাকলে তুমি অবশ্যই তা দেখতে পাবে। আল্লাহ্‌তা'আলাও এ মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন–

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ-

কখনই নয়, যদি তোমরা বাস্তব জ্ঞানে জানতে পারতে, তবে অবশ্যই তোমরা দোযখ দেখতে পেতে। (পারা ৩০ঃ সূরা তাকাসুর) যা হোক, প্রিয় পাঠক! এতটুকু কথা জেনে রেখ যে, বিষ পান করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অসুস্থতা মানুষকে কবরে নিয়ে যায়। বিষ পান করলে কেউ তার প্রতি ক্রুদ্ধও হয় না এবং বিষপানের জন্য তাকে শাস্তিও দেয় না। এরূপে মানবের পাপ কার্য এবং লোভ-লালসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলো তার হৃদয়কে পীড়িত করে দেয় এবং সে পিড়াই তার অন্ত রকে অগ্নির ন্যায় পোড়াতে থাকে। এ পাপাগ্নি দোযখ অগ্নির সমজাতীয়,

https://kitabbhubon.com

পার্থিব অগ্নির সমজাতীয় নয়। চুম্বক লৌহ যেমন তার জাতীয় লৌহকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয় এবং স্বীয় গর্ভে নিক্ষেপ করে। এতে কারও ক্রোধ বা অসন্তোষের কোন দখল নেই। ছওয়াবের অবস্থাও এর ওপর অনুমান করে নেয়া যেতে পারে বলে তৎসম্বন্ধে কিছু লেখ হল না। লিখতে গেলে বিবরণ বহু দীর্ঘ হয়ে যায়। এ হল, ছওয়াব আযাব কেন হয় ? প্রশ্নের উত্তর।

সংসারে পয়গম্বর প্রেরণ এবং শরীঅত প্রচারের উদ্দেশ্য

তুমি আরও একটা প্রশ্ন করেছিলে ঃ "অক্ষম' মানবের জন্য শরীয়তের বিধি নিষেধ কেন নির্ধারিত হয়েছে ? পয়গম্বরগণকে জগতে কেন প্রেরণ করা হয়েছে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলছি শোন ঃ এও আল্লাহতা'আলার এক প্রকার কঠিন শাসন এবং যবরদস্তী। মানুষকে যবরদস্তীভাবে শিকলে বেঁধে বেহেশতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা এ সম্বন্ধে হুযুর আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَتَعْجَبُ مِنْ قَوْمٍ يُّقَادُوْنَ اِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ-

'তুমি কি সে সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখে আশ্চর্যবোধ করছ, যাদেরকে শিকলে বেঁধে বেহেশতের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে ? আর যবরদস্তীর ফাঁদে আটকিয়ে দোযখে যেতে না দেওয়ার ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধেও হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَنْتُمْ تَتَهَافَتُوْنَ عَلَى النَّارِ وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ-

'তোমরা উম্মত হয়ে পতঙ্গের ন্যায় নিজেদেরকে দোযখের অগ্নিতে নিক্ষেপ করছ। আর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কোমর ধরে পশ্চাৎদিকে টানছি' যেন দোযখে পতিত হতে না পার। প্রিয় পাঠক! অবগত হও, আল্লাহ্তা'আলা যে যবরদস্তীর শিকলে আটকিয়ে মানুষকে দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে বেহেশতের দিকে টেনে নিচ্ছেন, পয়গম্বরগণের প্রত্যেকটি উপদেশমূলক উক্তি সেই শিকলের এক একটি কড়া বিশেষ। তাঁদের উপদেশ বাণীতে তোমাদের অন্তরে জ্ঞানের উদয় হয়, সে জ্ঞানের সাহায্যে তোমরা কুপথ এবং সুপথ বেছে নিতে পার আবার পয়গম্বরগণের ভীতিপ্রদর্শন বাণীতে তোমাদের হৃদয়ে ভয় ও ত্রাসের

https://kitabbhubon.com

সঞ্চার হয়। তাঁদের উপদেশ থেকে তোমাদের যে পথ পরিচয় জ্ঞান জন্মে এবং তাঁদের ভয় প্রদর্শন বাণী থেকে তোমাদের মনে ভয় জন্মে, সে পরিচয় জ্ঞানও ভয় একত্রে মিলিত হয়ে তোমাদের বুদ্ধিরূপ দর্পণের ওপর থেকে সমস্ত ধুলা-বালি দূরীভূত করে তাকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করে দেয়, যার ফলে তোমরা স্বচ্ছ বুদ্ধি দর্পণের দ্বারা পরিস্কার দেখতে ও বুঝাতে পার যে, সংসারের পথ অবলম্বন অপেক্ষা পরলোকের পথ অবলম্বন উত্তম। বুদ্ধি দর্পনের ওপর পরকালের পন্থা অবলম্বন উত্তম বলে প্রতিফলিত হলে যেন তোমাদের মনে পরকালের পথে চলবার ইচ্ছা বা আকাঙ্খা উৎপন্ন হয় এবং সে ইচ্ছার প্রভাবে তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৎকার্যানুষ্ঠানের জন্য প্রচেষ্টা দেখা দিতে পারে। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ইচ্ছা শক্তির অধীন। এখন বুঝতে পার পয়গম্বরগণের উপদেশবাণী থেকে আরম্ভ করে কর্মচেষ্টা পর্যন্ত কারণগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে কেমন এক বিচিত্র শৃঙ্খলের ন্যায় হয়েছে। দয়াময় আল্লাহতা'আলা সে শিকলে তোমাদেরকে বেঁধে কেমন যবর দস্তীর সাথে দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। পরগম্বরগণকে (আঃ) সেই বকরীপালের রাখালের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার ডান পার্শ্বে শ্যামল ও সতেজ তৃণক্ষেত্র লোভনীয়রূপে বিদ্যমান এবং বাম পার্শ্বে বাঘ-ভালুক পূর্ণ পর্বত-গুহা বর্তমান। প্রতি মুহূর্তে বকরীগুলো বাঘ-ভালুকের মুখে গিয়ে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব রাখাল গুহা মুখে লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান হয়ে লাঠি দ্বারা বকরীগুলোকে গুহার দিক থেকে তৃণক্ষেত্রের দিকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। লাঠি সঞ্চালন দেখে বকরীগুলোও সেদিক থেকে ফিরে তৃক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছে। পরগম্বরগণের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে তদনুরূপই বটে। তাঁরা দোযখের পথ আগলিয়ে দণ্ডায়মানপূর্বক দোযখের শাস্তির ভয় প্রদর্শনে উম্মতদেরকে দোযখের পথ থেকে তাড়িয়ে বেহেশতের পথে প্রেরণ করে থাকেন। পয়গম্বরদেরকে সংসারে প্রেরণ করবার এই উদ্দেশ্য।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য অদৃষ্ট লিপিতে আদিকালে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলে পরিশ্রমের ফল কি ?

প্রিয় পাঠক! তোমার আর একটা প্রশ্ন এই ছিল যে, সৃষ্টির প্রারম্ভকালে মানুষের ভাগ্যলিপিতে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলে তার পক্ষে কর্মচেষ্টা ও পরিশ্রম করে কি লাভ ? এক হিসেবে তোমার এ উক্তিটিকে

https://kitabbhubon.com

সত্য বলা যেতে পারে, অন্য হিসেবে একে ভুল বলা যেতে পারে। সত্য সত্য হলে এ সত্য কথা তোমার মহা ক্ষতিও সর্বনাশের কারণ। যার সম্বন্ধে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার লক্ষণ এই যে, আল্লাহতা'আলা তার মনের মধ্যে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করে দেন যে, চেষ্টা করলে কোন ফল নেই। এই ধারণা তার হৃদয়ে সত্য সত্যই বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তার ফলে সে কর্ম-চেষ্টা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে, সে বীজও বপন করে না। শস্যও কাটতে পারে না। আল্লাহতা'আলা যার ভাগ্যে মৃত্যু লিখেছেন, তার লক্ষন এই যে, তার হৃদয়ে এরূপ ধারণা দৃঢ় করে দেয়া হয়- না খেয়ে মরাই যখন আমার অদৃষ্ট লিপি তখন আর আহার গ্রহণে ফল কি ? এই ধারণায় সে আহার গ্রহণ ছেড়ে দিবে এবং পরিশেষে অনাহারে তার মৃত্যু ঘটবে। এইরূপে যার ভাগ্যে আল্লাহ্তা'আলা দারিদ্রতা লিপিবদ্ধ করেছেন সে এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়বে যে, দারিদ্রতাই যখন আমার ভাগ্যের লিখন, তখন আর বীজ বপনে ফল কি ? এই ধারণায় সে বীজও বপন করবে না শস্যও কাটতে পারবে না। আর যার ভাগ্যে আল্লাহ্তা'আলা সৌভাগ্য লিখেছেন, তাকে তিনি একথা বুঝিয়ে দেন যে,'আল্লাহ্তা'আলার যার ভাগ্যে ধনী হওয়া এবং দীর্ঘজীবী হওয়া লিপিবদ্ধ করেছেন তাকে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কৃষিকার্য ও বাণিজ্য করলে ধন লাভ হবে এবং আহার গ্রহণ করলে দীর্ঘ জীবী হওয়া যাবে। অতএব সে কৃষিকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনবান হয় এবং যথাযথভাবে খাদ্য গ্রহণ করে দীর্ঘজীবন লাভ করে। এরূপ লিপিবদ্ধ করা নিরর্থক নয়; বরং এ সমস্ত লিখন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। বিশেষতঃ আল্লাহ্তা'আলা যাকে যে কার্যের জন্য সৃষ্টি করেন তাকে সে কাজের উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়ে থাকেন। কারণ ও উপকরণ ব্যতীত কাকেও সরাসরি কার্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন না। এই মর্মেই হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ

"কাজ করতে থাক। যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে কাজ তার জন্য সহজ লভ্য বা সহজ সম্পাদ্য করে দেয়া হয়েছে।' প্রিয় পাঠক! বুঝে লও, দয়াময় আল্লাহ্পাক যবরদস্তী তোমার দ্বারা যে পর্যন্ত

https://kitabbhubon.com

কার্য করিয়ে এবং যবরদস্তী তোমাকে যে যে অবস্থায় রাখছেন তাতে তুমি তোমার পরিনাম সম্বন্ধে পূর্বাভাষ বুঝে লও, তোমার মনে বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ ও চেষ্টা প্রবল দেখতে পেলে এবং তৎসঙ্গে তোমার মধ্যে অটল অধ্যবসায়ও অবিচল কর্ম তৎপরতা বর্তমান আছে বুঝতে পারলে মনে করবে, আল্লাহতা'আলা তোমাকে বিদ্যান করে, ভবিষ্যতে সমাজের নেতা পরিচালক করবেন এবং তুমি সৌভাগ্যবান হবে বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু যদি কর্ম বিমুখতা এবং অলসতা তোমার ওপর প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, তোমার মনে উদিত পূর্বোক্ত মনোভাব সম্পূর্ণ নিরর্থক। আর তোমার মনে যদি এরূপ ভাব জাগিয়ে দেয়া হয় যে, আদি সৃষ্টিকালেই আমার অদৃষ্টে মূর্খতা লিপিবদ্ধ হয়েছে, বিদ্যা শিক্ষার জন্য চেষ্টা করে কোন ফল হবে না, তবে এ মনোভাবকেই তোমার 'মুর্খতা হুকুমনামা' বলে মনে করবে এবং এও জানবে যে, তুমি কখনও নেতা বা পরিচালক হতে পারবে না।

ওপরে সাংসারিক কার্যের উন্নতি অবনতি এবং সফলতা ও বিফলতা সম্বন্ধে যা কিছু বলা হল, পারলৌকিক ব্যাপারেও তদ্রূপই অনুমান করে নিবে এ সম্বন্ধে আল্লাহতা'আলা বলেছেন–

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ-

"তোমাদের সৃজন ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃজনের সদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। (পারা ২১ঃ সূরা লুকমান, রুকু ৩)

তিনি আরও বলেছেন–

سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ-

'তাদের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমান।' (পারা ২৫, সূরা জাসিয়া, রুকু ২)

প্রিয় পাঠক! তুমি উপরোক্ত এই তথ্যগুলো ভালরূপে বুঝে নিতে পারলে তোমার মনে উদিত পূর্বোক্ত কঠিন প্রশ্ন তিনটির সমাধান সহজ হয়ে পড়বে এবং আল্লাহতা'আলার তাওহীদ বা একত্বজ্ঞান তোমার হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে পড়বে এবং সাথে সাথে তুমি এও পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, চক্ষুষ্মান লোকের নিকট শরীঅত, বিবেক-বুদ্ধিও একত্ব বা তাওহীদ জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রভেদ বা বৈপরিত্য নেই। এই গ্রন্থে এতদপেক্ষা অধিক আর কিছু লেখা যায় না।

https://kitabbhubon.com

তাওয়াক্কুলের ভিত্তি দ্বিতীয় প্রকারের বিশ্বাস

প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর ওপর পূর্ণমাত্রায় তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা লাভ করতে হলে দু'প্রকারের বিশ্বাস দৃঢ়রূপে মনে জন্মিয়ে লওয়া কর্তব্য।

১. তাওহীদ- বিশ্বাস অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহ্তা'আলার সর্বময় ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহতা'য়ালার দয়ায়ই সবকিছু সম্পন্ন হচ্ছে, একথা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জেনে লওয়া। এতদুভয় প্রকারের বিশ্বাস মনে দৃঢ়রূপে জন্মিয়ে নিতে পারলেই তাওয়াক্কুল তোমার হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে। উপরে তাওহীদ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, এখন আল্লাহ্তা'আলার দয়া সম্বন্ধে বর্ণিত হবে।

২. আল্লাহর দয়া - আল্লাহর তা'আলার ব্যাপক দয়া সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উত্তমরূপে উপলব্ধি করা কর্তব্য। ১. তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে একথা জেনে রাখবে যে, আল্লাহই সকলের সৃষ্টি কর্তা। পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের 'কারণ' তিনি। তা থেকেই সর্ববিধ পদার্থের উৎপত্তি। ২. তাঁর অসীম দয়া সকলের ওপর অবারিত ভাবে বিতরিত হচ্ছে। তিনি সুকৌশলী ও করুণাময়। সুকৌশলে তিনি সকলকে যবরদস্তি টেনে নিয়ে সকলের ওপর করুণা বর্ষণ করেছেন। ৩. তাঁর দয়ার কোন ইতর বিশেষ নেই। প্রত্যেকটি পিপীলিকা ও মশা-মাছি প্রভৃতি কীট পতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে সৃষ্ট জীবের সেরা মানব জাতি পর্যন্ত সকলেই সমানভাবে তাঁরকরুনা লাভ করছে। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ ও মমতা যত প্রগাঢ় প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রতি তাঁর করুনা ও দয়া তদপেক্ষা বহু ও অধিক। এই মর্মের বিরবণ হাদীছ শরীফেও উল্লেখ রয়েছে। ৪. এও জেনে লও যে, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্তা'আলার সমগ্র জগৎ এবং তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় পদার্থকে এমন পূর্ণতার সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং এমন সুন্দর ও মনোরম বানিয়েছেন যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব বরং কল্পনাও করা যায় না।

৫. আরও বুঝে লও যে, আল্লাহ্তা'আলা জগতের কোন পদার্থকেই স্বীয় এবং করুনা থেকে বঞ্চিত করেননি। ৬. যা কিছু সৃষ্টি করেছেন– তা যেমন ভাবে সৃষ্ট হওয়া উচিত ঠিক তেমন ভাবেই সৃষ্টি করছেন। পৃথিবীর

https://kitabbhubon.com

সমস্ত বুদ্ধিমান লোককে একত্রিত করে যদি তাদেরকে পুর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও জ্ঞান শক্তি প্রদান করা হয় এবং তারা সকলে মিলে আল্লাহতা'আলার সৃষ্ট পদার্থগুলোকে তন্ন তন্ন করে দেখে তাদের মধ্যে খুঁত আছে কিনা যাঁচাই করতে প্রবৃত্ত হয়, তবে কোন একটা পদার্থের মধ্যেও কোন খুঁত বা ত্রুটি বের করতে পারবে না। একটি কেশাগ্র কিংবা মশকের পালক স্পর্শ করে বলতে পারবে না যে, তা এমন না হয়ে অমন হওয়া উচিত ছিল। কিংবা অমুক পদার্থই ছোট বা বড়, লঘু বা গুরু খাট কিংবা লম্বা হলে উত্তম হত এমন মন্তব্যও কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতই দেখবে ততই বুঝতে পারবে যে, প্রত্যেকটি পদার্থ ঠিক যেমনভাবে হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ৭. যে বস্তু নিতান্ত কুৎসিৎ কদকার, কদাকার হওয়ার মধ্যে তার পূর্ণতা নিহিত রয়েছে। কদাকার না হলেই বরং তা অপূর্ণ থেকে যেত এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সে পদার্থটিকে কদাকাররূপে সৃষ্টি করেছেন– কুৎসিৎরূপ না দিলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। দেখ জগতে কদাকার বলে কোন পদার্থ না থাকলে উৎকৃষ্ট ও সুগঠন দ্রব্যের কোন মূল্যই থাকত না এবং সুশ্রী ও সুগঠন দ্রব্য কেউ আরাম পেত না। বিশেষতঃ অপূর্ণ বস্তু সৃষ্ট না হলে পূর্ণ বলে কোন বস্তুই থাকত না। অপরপক্ষে স্বয়ং পূর্ণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি স্বীয় পূর্ণতা গুণের কোন স্বাদই পেতে না। কেননা অপূর্ণের সাথে তুলনা না করলে কোন বস্তুকে পূর্ণ বলে চিনা যায় না। দেখ, 'পিতা' নাম প্রাপ্ত হতে হলে তার সন্তান থাকা আবশ্যক। সন্তান না থাকলে পিতা নামটিও থাকত না। সুন্দর ও কদর্য সুশ্রী ও কুৎসিৎ পূর্ণ ও অপূর্ণ, পিতা ও সন্তান প্রভৃতি বিষয়গুলো একে অন্যের প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষতা দু'পদার্থের মধ্যেই হয়ে থাকে। যদি দু'পদার্থই না থাকল, তবে তুলনা কার সাথে চলবে ? সবাই মিলে এক হয়ে যাবে। তুলনা এবং তুলনার মুখাপেক্ষী পদার্থের অস্থিত্বই থাকবে না। সুতরাং কদাকার পদার্থ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন রয়েছে, না করলে সে প্রয়োজনে অপূর্ণ থেকে যেত। ৮. একথাটিও বুঝে লও যে, প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। সম্ভবতঃ আল্লাহতা'আলা কোন নিগুঢ় কারণের কার্যসমূহের উদ্দেশ্যে মানুষের আজ্ঞাত করে রেখেছেন।

কিন্তু তোমাদের পক্ষে এতটুকু বিশ্বাস রাখা ওয়াজেব যে, আল্লাহতা'আলা মানবকে যত প্রকারের কার্যের নির্দেশ প্রদান করেন তাদের

https://kitabbhubon.com

প্রত্যেকটির মধ্যে মানুষের মঙ্গল নিহিত আছে। এরূপক্ষেত্রে এমন নির্দেশই হওয়া উচিত ছিল, এর অন্যথা হলে অমঙ্গল হত। ইহ সংসারে রোগ, শোক, অক্ষমতা ও অথর্বতা এমন কি কাফেরী, পাপ, ক্ষতি, বিনাশ, দুঃখ, যাতনা প্রভৃতি যা কিছু আছে তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে মহাকৌশলী সৃষ্টিকর্তা কোন না কোন একটি হেকমৎ বা উদ্দেশ্য নিহিত রেখেছেন এবং যেটি যে অবস্থায় আছে তদবস্থায় থাকাই উচিত ছিল। যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপই তিনি করেছেন। যাকে তিনি অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র করে সৃষ্টি করেছেন অভাব এবং দরিদ্রের মধ্যে থাকাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল। সে দরিদ্র না হয়ে ধনী হলে তার বরবাদী এবং ক্ষতি হত। আবার তিনি যাকে ধনী করেছেন তদ্রূপ ধনী হওয়ার মধ্যেই তার মঙ্গল রয়েছে। তাওহীদ সমুদ্রের ন্যায়' এ কথাটির সূক্ষ্ম মর্মও অগাধ দুস্তার হয়েছে। বহু লোক এ সমুদ্রে ডুবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে। অদৃষ্টবাদের জটিল সমস্যা এর মধ্যে রয়েছে। সে সমস্যা সাধারণ লোকের নিকট খুলে বলার অনুমতি নেই। একথা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে বিবরণ বহু দীর্ঘ হয়ে যাবে। তথাপি পুনরায় বলতে হয় সাধ্যানুরূপ এ কথাটি উপলব্ধি করার ওপরই মানুষের ঈমান সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আল্লাহতা'আলার ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল অর্জন করতে হলেও এ উপলব্ধি একান্ত আবশ্যক।

তাওয়াক্কুলের প্রকৃত পরিচয় ঃ প্রিয় পাঠক! অবগত হও। মানবের হৃদয়ে যত প্রকারের অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাওয়াক্কুর তন্মধ্যে একটা উন্নততর অবস্থা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতা'আলার একত্ব এবং অপার করুণার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে হৃদয়ে এই তাওয়াক্কুলরূপ উন্নত অবস্থা জন্মে। এই অবস্থার পরিচয় এই যে, এরূপ অবস্থা হৃদয়ে জন্মিলে মানুষ কার্য নির্বাহক আল্লাহতা'আলার প্রতি প্রত্যেক কার্যেই অন্তরের সাথে ভরসা করে সে ভরসাকে অন্তরে দৃঢ় রাখার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকে এবং প্রত্যেক কার্যে আল্লাহ্তা'আলার প্রতি দৃঢ় নির্ভর থাকা বশতঃ অন্তরে কোন প্রকার উদ্বেগ স্থান পায় না; বরং শান্তি ও আরামের সাথে নিরুদ্বেগে পড়ে থাকে, উপজীবিকা সংগ্রহের চিন্তায় অন্তরকে লিপ্ত রাখে না। ঘটনাক্রমে জীবিকা সমাগমের বাহ্য উপকরণসমূহের মধ্যে কোন একটির ব্যতিক্রম ঘটলে এবং তদ্দরুন জীবিকা সংগ্রহে অকৃতকার্য হলে মনের উদ্যম নষ্ট হয় না; বরং আল্লাহ্তা'আলার অফুরন্ত করুণার উপর এতটুকু বিশ্বাস রেখে সন্তুষ্ট হয় যে, আল্লাহতা'আলা করুণাময় ও রিযিকের জিম্মাদার। তিনি অবশ্যই আমাকে প্রচুর রিযিক দান করবেন।

https://kitabbhubon.com

একথাটি উত্তমরূপে বুঝবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। মনে কর, কোন ব্যক্তি একজন দুর্বল সৎলোকের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনামূলকভাবে এক মিথ্যা মকদ্দমা দায়ের করল। দুর্বল ব্যক্তি প্রবঞ্চক ফরিয়াদীর মিথ্যা দাবী ব্যর্থ করবার উদ্দেশ্যে একজন উকীল নিযুক্ত করল। যদি এ উৎপীড়িত ব্যক্তি উকীলের নিম্নোক্ত তিনটি গুণের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ নির্ভর করতে পারে, তবে মকদ্দমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভার উকীলের উপর ন্যাস্ত করে সে একান্ত বিরুদ্বেগে ও শান্তিতে থাকতে পারে। ১. উকীল প্রতারকের প্রতারণা ও দুরভিসন্ধি সম্বন্ধীয় সর্ব প্রকারের অবস্থা অবগত আছেন এবং তৎপ্রতিকার সম্বন্ধে সবিশেষ দক্ষতা রাখেন। ২. প্রতারকের প্রতারণামূলক দাবী খণ্ডনের নিমিত্ত যে সমস্ত আইন ও যুক্তি উকীলের জানা আছে তা আদালতে পেশ করবার জন্য তার যথেষ্ট সাহসও আছে, যথেষ্ট বাক পটুতাও আছে। অনেক স্থলে দেখা যায়, উকীলের আইন কানুন যথেষ্ট জানা আছে, কিন্তু সাহস ও বাক্‌পটুতার অভাবে তা আদালতে প্রকাশ করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে মকদ্দমায় হেরে যায়। ৩. উৎপীড়িত লোকের প্রতি উকীলের যথেষ্ট দয়া এবং মযলুম লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য উকীল নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন, একথাও মোয়াক্কেলের দৃঢ়রূপে জানা আছে। যা হোক উকীলের এই ত্রিবিধ গুণের প্রতি উৎপীড়িত ব্যক্তির পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে মুয়াক্কেল নিজের সমস্ত কাজের ভার উকীলের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ হতে পারে এবং উকীলের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে অন্যান্য যাবতীয় উছিলা উপলক্ষ পরিত্যাগপূর্বক সর্ববিধ তদবীর থেকে বিরত থাকতে পারে। এরূপে যে ব্যক্তি–

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ-

অর্থাৎ 'আল্লাহতা'আলার উত্তম প্রভু এবং উত্তম কার্য নির্বাহক' বাক্যের অর্থ উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছেন এবং দৃঢ়রূপে একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে আল্লাহতা'আলার কারণেই ঘটে থাকে। তিনি ভিন্ন আর কোন কর্তা নেই; কার্যকরণ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার কোন প্রকার অপ্রতুলতা নেই, তাঁর দয়া ও করুণা এমন অপরিসীম যে, তদপেক্ষা অধিক হওয়া অসম্ভব;

https://kitabbhubon.com

আল্লাহতা'আলার একক ক্ষমতা ও একচ্ছত্র দয়ার প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে তাঁর দান ও করুণার উপর পূর্ণ অন্তরে নির্ভর করত অন্যান্য চেষ্টা তদবীর পরিত্যাগ করতে পারে; তখন তার মনে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, তার জীবিকা নির্দিষ্ট আছে। ঠিক সময়ে এসে পৌছবে, আল্লাহর দয়া ও করুণায় তার সর্ববিধ কার্য নির্বাহ হয়ে যাবে।

আল্লাহতা'আলার উক্ত ত্রিবিধ গুণের বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেলেও, স্বভাবতঃ মানুষের মন কাঁচা থাকতে পারে। এর কারণ এই যে, সাধারণত, দেখা যায়, মানুষ যা কিছু দ্রুব জ্ঞানে ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানে তার তবিয়ৎ বা প্রকৃতি কোন কোন সময় হঠাৎ তা গ্রহণ বা অনুমোদন করে উঠতে পারে না; বরং নিরর্থক কাল্পনিক ও অলীক খেয়ালের বশবর্তী হয়ে উক্ত দ্রুব জ্ঞানের অনুসরণ করতে পারে না। অথচ সে দৃঢ়রূপে জানে যে, সেই কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন, তথাপি সেই নিরর্থক ও অলীক কল্পনার বশীভূত হয়েই চলে।

দেখ, এক ব্যক্তি মিষ্ট ও সুস্বাদু হালুয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছে এমন সময়ে কোন একজন লোক এসে তা বিষ্ঠার সাথে তুলনা করল। এতে ভোজনরত ব্যক্তির মনে এমন এক ঘৃণা উদয় হয়ে যায় যে, সে ব্যক্তি পরে তা আর খেতেই পারে না; খাওয়া আরম্ভ করতেই বিষ্ঠার কথা মনে পড়ে এবং ঘৃণা বশতঃ খাওয়া থেকে বিরত হয়ে যায়। অথচ সে ভাল করে জানে যে, তার হালুয়ার সাথে বিষ্ঠার কোন সামঞ্জস্য নেই। এইরূপে মনের অলীক কল্পনা বশতঃ ভয়ে কেউ মৃতদেহের সাথে একাকী এক ঘরে বাস করতে পারে না। মিথ্যা ভয় এসে তাকে ভীত করে তোলে এবং সেই ভয়েই সে অনুসরণ করে থাকে, অথচ, সে দৃঢ়রূপেই জানে যে, প্রাণ বায়ু বহির্গত হওয়ার পর মৃত দেহ কাঁধ ও প্রস্তরবৎ নিতান্ত অক্ষম ও নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়, কোনই ক্ষতি করবার ক্ষমতা তার থাকে না। এই জ্ঞান বিশ্বাস তার নিতান্ত দৃঢ় এবং পরিপক্ক হলেও মিথ্যা অলীক ভয়ে সে এই দৃঢ় জ্ঞানের অনুসরণ করে শবদেহের সহিত একাকী এক ঘরে থাকতে পারে না।

যা হোক, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুল হাছিল করতে হলে, তাঁর প্রতি পূর্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকারের জ্ঞান বিশেষ শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক এবং তৎ সঙ্গে হৃদয়েও প্রচুর বল থাকা একান্ত প্রয়োজন, যাতে কোন প্রকার অলীক কল্পনা বা মিথ্যা ভয় এসে হৃদয়কে চঞ্চল ও দোদুল্যমান করতে না পারে। এরূপে যে পর্যন্ত আল্লাহতা'আলার প্রতি পূর্ণ নির্ভর জন্মে মনে পূর্ণ

https://kitabbhubon.com

শান্তি না আসবে সে পর্যন্ত মানুষ মুতাওয়াক্কিল অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার প্রতি ভরসাকারী ও নির্ভরশীল হতে পারে না। কেননা তাওয়াক্কুল শব্দের সারমর্ম হল সর্বপ্রকারের কার্যকলাপে মানুষের মন আল্লাহ্তা'আলার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা। হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) আল্লাহ্তা'আলার অসীম ক্ষমতার প্রতি অটল বিশ্বাস করতেন এবং পরিপক্ক ঈমান রাখতেন। তিনি নিবেদন করেছেন– 'হে আমার প্রভু। আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কেমন করে মৃতকে জীবিত করে থাকেন ? আল্লাহ্ বললেন– তোমার কি বিশ্বাস হয় না ?' ইব্রাহীম (আঃ) বললেন– হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার অন্তরের শান্তিলাভের জন্য দেখিয়ে দিন, (পারা-৩ ঃ সুরা বাক্কারা ঃ রুকু-৩৫) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বিশ্বাস তো আল্লাহতা'আলার অসীম ক্ষমতার প্রতি অতুলনীয়রূপেই দৃঢ় ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় অন্তরে শান্তি ও আরাম প্রাপ্তির জন্যই তদ্রূপ প্রার্থনা করেছিলেন। কেননা আল্লাহর প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাসের প্রাথমিক অবস্থার আন্তরিক শান্তি ও আরাম খেয়াল এবং কল্পনার বশীভূত থাকে। পরে উক্ত নির্ভর ও বিশ্বাস চরম পর্যায়ে উপনীত হলে সমগ্র হৃদয় রাজ্য নির্ভর ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ও প্রশান্ত হয়ে যায় এবং হৃদয় সে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে পড়ে, অতঃপর বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য আর প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রয়োজন হয় না।

মুতাওয়াক্কিলের শ্রেণী বিভাগ

প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলকারী (মুতাওয়াক্কিল) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলের অবস্থাকে সে ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ব্যক্তি কোন মকদ্দমায় পড়লে নিজের মকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভার একজন সুচতুর, অভিজ্ঞ আইন বিশারদ, বাক্পটু, সাহসী এবং দয়ালু উকীলের উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্তে ও প্রশান্ত মনে বাড়িতে বসে থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাথে তুলনা করা যায়, কোন বিপদ উপস্থিত হোক না কেন সে তার মাকে ভিন্ন আর কাউকেও জানে না। সে মনে করে, একমাত্র মাতাই তার আশ্রয়স্থল। ক্ষুধা অনুভব করলে মায়ের নিকট গিয়ে ক্রন্দন করে। কোন ভয়ের কারণ

https://kitabbhubon.com

উপস্থিত হলে মায়ের নিকট দৌড়িয়ে গিয়ে মায়ের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শিশুর স্বভাবের মধ্যে অপ্রকৃতি অবস্থার লেশ মাত্র নেই, নিতান্ত সরল। তার প্রকৃতির মনে যা আছে সরল ও সঠিকভাবে তাই প্রকাশ করে। কোন বাহ্যাড়ম্বরের ধার ধারে না। শিশু প্রকৃতির তুল্য মুতাওয়াক্কিল লোক কার্য নির্বাহক আল্লাহতা'আলার দয়ায় এত মুগ্ধ ও নিমজ্জিত থাকে যে, সে যে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে বসে আছে এ সংবাদটুকুও সে রাখে না। উকীলের উপর নির্ভরকারী লোক যেমন উকীলের গুণাবলী দেখে শুনে, বোধবিচার করে তার উপর নির্ভর করে, প্রথম মুতাওয়াক্কিলও তদ্রূপ আল্লাহতা'আলার কার্য নির্বাহন ও অসীম দয়া দর্শন করে আল্লাহর উপর নির্ভর ও তাওয়াক্কুল জন্মিয়ে নেয়।

তৃতীয় শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলের অবস্থা গোসলদাতার হাতে মৃতদেহ সদৃশ। নাড়লেই নড়ে নচেৎ অচল হয়ে পড়ে থাকে। এ শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিল নিজেদেরকে আল্লাহতা'আলার হাতে মৃত দেহের ন্যায় সম্পূর্ণ অক্ষম ও অচল মনে করে থাকেন। তাঁরা মনে করে থাকেন তাঁদের প্রত্যেকটি গতিবিধি ও কার্যকলাপ আল্লাহতা'আলার অসীম ক্ষমতা বলেই সম্পন্ন হচ্ছে। তাঁদের কোনই স্বাধীন ক্ষমতা নেই। মৃতদেহ যেমন গোসলদাতা ব্যক্তি নাড়লে নড়ে। তাঁরা আল্লাহ্তা'আলার কর্তৃক চালিত হলে চলেন, নিজেদের ইচ্ছা বা স্বাধীন ক্ষমতায় কিছুই করেন না বা করতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলগণ আপদেবিপদে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে থাকেন, যদ্রুপ ক্ষুধা বা কোন আপদ-বিপদ অনুভব করলে মাতাকে ডেকে দৌড়িয়ে তাঁর নিকট যায়। তৃতীয় শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলগণ কিন্তু আপদে-বিপদে আল্লাহকে ডাকারও প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁদের অবস্থা সে শিশুর ন্যায় যে শিশু উত্তমরূপে অবগত আছে যে, তার মাতাকে ক্ষধাও আপদ-বিপদের কথা জানাবার প্রয়োজন হয় না, শিশুর আহবান ব্যতীত মা নিজেই তার অনুসন্ধান করে তা মোচন করবার চেষ্টা করেন। এই তৃতীয় শ্রেণীর তাওয়াক্কুলকারীরাও মনে করে আল্লাহর সমীপে আমাদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজেই আমার অবস্থার সন্ধান নিয়ে আমার যাবতীয় অভাব পূরণ করবেন এবং বিপদ মোচন করবেন।

https://kitabbhubon.com

তিন শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলের তুলনা

যা হোক, তৃতীয় শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলের কোন স্বাধীন ক্ষমতা তো থাকেই না, এমন কি, তাঁরা যে আল্লাহতা'আলার উপর নির্ভর করে আছেন, এ চেতনাও তাদের থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর তাওয়াক্কুলকারীদেরও স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না বটে, কিন্তু নিজের অসহায়তা, প্রার্থনা এবং আল্লাহতা'আলার প্রতি নির্ভরে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। প্রথম শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলের ক্ষমতা অবশ্য কিছু থাকে, কিন্তু সে ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। উকীলের স্বভাব ও অভ্যাস দৃষ্টে যা করা এবং যে দ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়া আবশ্যক কেবল তা করা ও সংগ্রহ করে দেয়ার ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। যদি উকীলের অভ্যাস এরূপ হয় যে, মুআক্কিল উপস্থিত না হলে এবং তার দাবীর দলিল-পত্র দাখিল না করলে সে চূড়ান্ত জবাব দেয় না, তবে এমতাবস্থায় মুআক্কিলকে বাধ্য হয়ে তদ্রূপ ব্যবস্থা করতে হয়। নিজেরও হাজির্ হতে হয় এবং আবশ্যকীয় দলীলপত্রও সংগ্রহ করে দাখিল করতে হয়। এই সমস্ত আয়োজন-যোগাড় করে দিয়েও তাকে উকীলের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। উকীল কি করেন তার প্রতি তাকিয়ে থাকতে হয়। এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে যা কিছু করা হয় তা উকীলের কার্য বলেই জানে এবং মুআকিলের উপস্থিত হয়ে দলিল দাখিল করাকেও উকিলের কার্য বলে মনে করেন। কেননা উকীলের ইঙ্গিতেই সে তা করেছিল। যা হোক, প্রথম শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিল লোকেরা কৃষি বাণিজ্যাদি কার্যে এবং বাহ্য উপায় ও উপকরণাদি সংগ্রহে যে আয়োজন করে থাকে তা আল্লাহ্তা'আলার অভ্যাসগত রীতি ও নিয়ামানুসারে করা হয়। তাঁরা এ সমস্ত কার্যে আল্লাহতা'আলারই আদেশ প্রতিপালন করছেন বলে মনে করে থাকেন। এ কারণে তাঁরা কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য পরিত্যাগ করেন না। কিন্তু তথাপি তাঁরা মুতাওয়াক্কিল (তাওয়াক্কুলকারী) বলে গণ্য হন। কেননা তাঁরা নিজেদের এই কৃষি বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে না; বরং প্রত্যেক কাজ কর্মে কেবল আল্লাহতা'আলার দয়া ও করুণার ওপরই ভরসা রাখেন এবং মনে করেন যে, আল্লাহ্ কৃষি ও বাণিজ্য কর্মের জন্য আমার দ্বারা যা কিছু করিয়ে নিয়েছেন এবং যে উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়ে নিয়েছেন এবং কৃষি ও বাণিজ্য কর্মের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, অবশেষে এসমস্ত কার্যের ফলও তিনি প্রদান করবেন। তাঁদের চোখের সম্মুখে যা কিছু ঘটতে

https://kitabbhubon.com

দেখেন, তা আল্লাহতা'আলার তরফ থেকে আসছে ও ঘটছে বলে দেখতে পান। এসম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ সম্মুখের দিকে আসবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ভিন্ন কোন গতিবিধি এবং শক্তি হয় না। ওপরে বর্ণিত মর্মই এই বাক্যের অর্থ। কেননা حول 'হাওল' শব্দের অর্থ গতি এবং قوة 'কুওয়াৎ' শব্দের অর্থ শক্তি বা বল। মানুষ যখন দেখতে পায় যে, কোন প্রকারের গতিবিধি বা বল শক্তিই তার নিজস্ব নয়: বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে, তখন তার চোখের সম্মুখে যা ঘটতে দেখে সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটছে বলে দেখতে পায় এবং মনে করে যে, সে কেবল আল্লাহতা'আলার সেই কার্য প্রকাশ পাবার স্থান পাত্র। ফল কথা, যখন কার্যসমূহ বাহ্য উপকরণ ও উপাদানাদির প্রভাবে সংঘটিত হওয়ার কল্পনা মানুষের অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যায় এবং যাবতীয় কার্য কেবল আল্লাহতা'আলার ক্ষমতায় ঘটছে বলে দেখতে পায়। খোদা ভিন্ন অন্য কারও কোন ক্ষমতাই দেখতে পায় না। তখন সে ব্যক্তিকে মুতাওয়াক্কিল বলা যায়।

উন্নত পর্যায়ের মুতাওক্কিলের বিবরণ

উন্নতস্তরের মুতাওয়াক্কিলের পরিচয় সম্বন্ধে হযরত আবু ইয়াযীদ বাস্তামী রাহেমাহুল্লাহ যা বলেছেন তা নিয়ে বিবৃত হচ্ছে– হযরত আবু মূছা রাহেমাহুল্লাহ একদিন হযরত আবূ ইয়াযীদ বাস্তামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'তাওয়াক্কুলের পরিচয় কি ?' তিনি উত্তর করেছিলেন, 'তোমরা তাওয়াক্কুল বলতে কি বুঝে থাক ? হযরত আবু মূছা (রহঃ) উত্তর করলেন– 'বুযুর্গানে দ্বীনের মুখে শুনেছি, 'চতুর্দিকে কেবল বিষধর সর্প এবং অজগর দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে যদি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না ঘটে এবং কেশাগ্র পরিমাণও বিচলিত না হয়, তবে বুঝতে পারবে তার হৃদয়ে আল্লাহতা'আলার প্রতি তাওয়াক্কুল রয়েছে।' তা শ্রবন করে হযরত আবূ ইয়াযীদ বললেন, তবে তাওয়াক্কুল লাভ করা অতি সহজ। কিন্তু আমার বিবেচনায় যে ব্যক্তি দোযখীদেরকে দোযখের মধ্যে সর্বপ্রকারের কঠিন শাস্তিমগ্ন এবং ঠিক একই সময়ে বেহেশতের মধ্যে বেহেশ্‌তীদেরকে পূর্ণ

https://kitabbhubon.com

নেয়ামত ও শুখ শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত দেখেও তার মনে সামান্য প্রকার প্রভেদ ও বিবেচনার উদয় না হয়, তবে বুঝতে হবে, সে ব্যক্তি 'মুতাওয়াক্কিল' নয়। কিন্তু হযরত আবূ মূছা তাওয়াক্কুলের যে বিশ্লেষণ প্রদান করেছিলেন তাতে অতি উন্নত পর্যায়ের তাওয়াক্কুল ঘটে। তা অবশ্যম্ভাবী নয় যে, তাওয়াক্কুল উৎপন্ন হলেই মনে ভয় ভীতির লেশমাত্র থাকবে না। হযরত আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যে সময় হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছূর পর্বতের গুহায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি সর্প গর্তের মুখে পদ স্থাপন পূর্বক গর্তের মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। তখনও তাঁর হৃদয়ে অবিচল তাওয়াক্কুল বিরাজ মান ছিল। তিনি তখন সর্পের ভয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করেন নেই; সর্পের সৃষ্টিকর্তার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। তিনি ভয় করেছিলেন, কি জানি আল্লাহসর্পের হৃদয়ে দংশনেচ্ছা উৎপাদনপূর্বক তাকে দংশন ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন। এই শ্রেণীর তাওয়াক্কুলকারিগণ প্রত্যেক কার্যেই–

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

কলেমার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে থাকেন। হযরত আবূ ইয়াযীদ বাস্তামী (রাঃ) এর উক্তির মধ্যে সেই উন্নত পর্যায়ের ঈমানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে– যা তাওয়াক্কুলের মূলাধার। তদ্রূপ ঈমান একান্তই দুর্লভ। আল্লাহতা'আলার হেকমৎ ও ন্যায় বিচারে যে ক্ষেত্রে তদ্রূপ উন্নত পর্যায়ের উন্নীত হওয়া সঙ্গত বিবেচনা করা হয় এবং যার প্রতি আল্লাহর অপর অনুগ্রতও করুনা বর্ষিত হয় সে ক্ষেত্রেই তেমন উন্নত শ্রেণীর ঈমান উৎপন্ন হয়ে থাকে। তদ্রূপ ঈমানের ফলে মানুষ মনে করে যা কিছু যেভাবে করা উচিত আল্লাহতা'আলার ঠিক সেভাবে করতেছেন। এ কারণেই দোযখীদের কঠিন শাস্তি এবং বেহেশতীদের অনাবিল সুখ শান্তি পাশাপাশিভাবে দেখেও এই শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলের হৃদয়ে কোন প্রকার প্রভেদ জ্ঞানের উদয় হয় না।

তাওয়াক্কুল কার্যকরী করার প্রণালী

প্রিয় পাঠক! অবগত হও, আল্লাহতা'আলা ধর্মপথের মোকামগুলো অর্থাৎ অবস্থাসমূহকে তিনটি মৌলিক পদার্থের প্রতি নির্ভরশীল করেছেন। ১. জ্ঞান, ২. ভাব ও ৩. কর্মানুষ্ঠান। কোন প্রকারের জ্ঞান লাভ করলে তাওয়াক্কুল অর্জন করা যায় এবং তাওয়াক্কুল উৎপন্ন হলে হৃদয়ের ভাব বা

https://kitabbhubon.com

অবস্থা কিরূপ হয় তৎসমূদয়ের বর্ণনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে ; এখন কেবল তাওয়াক্কুল প্রসূত কর্মানুষ্ঠানের বিষয় বর্ণিত হবে। কেউ মনে করতে পারে– আল্লাহর নির্ভর করতে হলে মানুষের সর্ববিধ কার্যের ভার আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে হবে ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি খাটিয়ে বা শক্তি ব্যয় করে কিছু করতে হবে না। কামাই উপার্জন কিছু করতে হবে না ; আগামীকল্য খাওয়ার জন্য আজ কিছুই সঞ্চয় করে রাখতে হবে না। সর্প কিংবা ব্যাঘ্র ভল্লুক দেখলে দৌড়িয়ে পালাতে হবে না। পীড়াগ্রস্ত হলে ঔষুধ গ্রহণ করতে হবে না। এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল এবং শরীঅত বিরুদ্ধ কার্য। তাওয়াক্কুলের ভিত্তি শরীঅতের উপরই স্থাপিত; সুতরাং তাওয়াক্কুলের কারণে শরীঅত বিরুদ্ধ কার্য কেমন করে করা যেতে পারে ? বস্তুতঃ শরীঅত মানুষকে উপার্জনে সঞ্চয় আগামী বিপদ থেকে আত্মরক্ষা এবং বর্তমান বিপদ বিদূরণের অধিকার দিয়েছে। সেই কার্যগুলো করবার বেলায় তাওয়াক্কুলের ক্ষতি বৃদ্ধি, স্থায়িত্ব বা বিনাশ ঘটে; সুতরাং চতুর্বিদ কার্যের মধ্যে তাওয়াক্কুল কি প্রকারে স্থিতিবান রাখা যায় তাই বিবেচনা ও আলোচ্য। ১. উপার্জন অর্থাৎ যে বস্তু নেই তা সংগ্রহ করা। ২. সঞ্চয় অর্থাৎ উপার্জিত বা সংগৃহীত বস্তুর সংরক্ষণ। ৩. আগামী বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, অর্থাৎ যে বিপদ এখনও আসেনি অথচ আসবার সম্ভাবনা আছে, তাকে বাধাপ্রদান করা। ৪. বর্তমান বিপদ বিদূরণ। অর্থাৎ যে বিপদ মাথার ওপর এসে পড়েছে তা দূর করবার উপায় করা। এই চার প্রকার কার্য সম্পন্ন করবার সময় কোন পন্থা অবলম্বন করলে তাওয়াক্কুল বর্তমান থাকে। তার পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে ; সুতরাং উক্ত চতুর্বিধ কার্য সমাধা করার বিস্তারিত পরিমাণ বর্ণনা করা আবশ্যক। মানবের এই চার শ্রেণীর কার্য কি প্রণালীতে সমাধা করলে তাওয়াক্কুল রক্ষা পায় তাই সম্মুখের দিকে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপার্জনে তাওয়াক্কুল কার্যকরী করার প্রণালী

হিতকর দ্রব্য উপর্জন অর্থাৎ যা হাতে নেই তা সংগ্রহ করা। কি নিয়মে উপার্জন করলে তাওয়াক্কুল রক্ষা পায় তাই এস্থলে বর্ণনার বিষয়। জীবন ধারণ ও অভাব বিদূরণের নিমিত্ত যে সমস্ত কার্য করতে হয় তা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

https://kitabbhubon.com

করণীয় কার্যের প্রথম শ্রেণী ও তাওয়াক্কুল ঃ আল্লাহর স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে কার্য করা বা যা ব্যবস্থা করা অপরিহার্য বা যা না করলে নিস্তার নেই বলে জানা আছে কিংবা স্থির বিশ্বাস আছে এরূপ কার্য ত্যাগ করে বসে থাকাকে পাগলামি বলে, তাওয়াক্কুল আখ্যা দেওয়া যায় না। দেখ, ক্ষুধার্ত লোকের সম্মুখে আহার্য দ্রব্য স্থাপিত হলে যদি সে মনে করে যে, 'আমি তাওয়াক্কুলকারী লোক, আমার পক্ষে কোন কার্যই করা উচিৎ নয়। খাদ্যের প্রতি হস্ত প্রসারিত করা লোকমা প্রস্তুতপূর্বক মুখে তুলে দেয়া, দন্ত দ্বারা চিবিয়ে গলধঃ করণ করা প্রভৃতি এক একটা কার্য করতে গেলে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার কোন অর্থ হয় না, আমি তা করব না। আল্লাহ্ স্বয়ং আমার উদর পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। অন্ন হাতে তুলব না, মুখে পুরে দেব না, দন্ত দ্বারা চিবাব না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমি অন্নকে ডাকা মাত্র অন্ন আপন-আপনি আমার মুখে উঠতে পারে। এই মনে করে হস্ত সংকোচনপূর্বক অন্নকে ডাকতে লাগল, 'হে অন্ন! আমি ক্ষুধার্থ হয়েছি। আমার উদরে ঢুকে পড়।' এরূপ মনে করা নিতান্ত পাগলের কল্পনা।

আল্লাহ্ মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে অটল নিয়ম স্থাপন করেছেন তা কখনও লঙ্ঘন করা যায় না। এ সাধারণ জ্ঞান তার নেই। এরূপে বিনা চাষে, বিনা বীজ বপনে ক্ষেত্র থেকে শষ্যের আশা করা, বিয়ে বা স্ত্রী সহবাস না করে সন্তান প্রাপ্তির কামনা করা-সমস্তই পাগলের কাজ। এই প্রাকৃতিক নিয়ম ত্যাগ করে বসে থাকলে তাকে তাওয়াক্কুল বলা যাবে না। প্রকৃত পক্ষে এরূপ ধারণা ও কামনা পোষণ করা আহমকীর কাজ বরং যে সমস্ত কারণ অবলম্বন করা প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্য ও অপরিহার্য, তাতে কর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুল নয়। তথায় মানসিক ভাব বা অবস্থা ও জ্ঞানের দ্বারা তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিতে হয়, কর্মানুষ্ঠান দ্বারা নয়। তদ্রূপ ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল জ্ঞান এই যে, মানুষের জানা আবশ্যক আল্লাহ পেটে ক্ষুধা দিয়েছেন, তা নিবারণের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করেছেন। খাদ্য গ্রহণের জন্য হাত সৃষ্টি করেছেন। হস্ত সঞ্চালন পূর্বক খাদ্য গ্রহণ করে মুখে তুলবার জন্য হাতে প্রচুর শক্তি প্রদান করেছেন। চিবাবার জন্য

https://kitabbhubon.com

দাঁত এবং চোয়ালে শক্তি অর্পন করেছেন। এই সমস্ত কিছুই আল্লাহতা'আলার সৃষ্ট বলে জেনে নেয়াই তাওয়াক্কুল। এই প্রকারের জ্ঞানোদয় হলে মনে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। তার ফলে মন নিরুদ্বেগ হয়ে ভাবতে থাকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ দয়া করে খাদ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং তা ভক্ষণ করার নিমিত্ত হাতে ও মুখে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, আমার প্রতি আল্লাহর দয়ার অন্ত নেই। এই ভাবের উদয় হয়ে মনে যে নিরুদ্বেগ ও প্রশান্তির উৎপত্তি হয় তাই তাওয়াক্কুল।

হস্ত বা খাদ্যের উপর নির্ভর করলে তাওয়াক্কুল বিনষ্ট হয়ে যাবে। হস্ত ও খাদ্যের উপর কেমন করে নির্ভর করা যেতে পারে ? যে কোন মুহূর্তে হস্ত বিকল বা পক্ষাঘাত গ্রস্ত হতে পারে। মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষমতার উপরও নির্ভর করা যায় না। সামান্য বিপদের ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টও অকর্মন্য হয়ে পড়তে পারে। আবার সঙ্গীয় খাদ্যের প্রতিই বা কি ভরসা করা যেতে পারে ? সম্মুখে স্থাপিত খাদ্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে। অথবা তথায় কোন সর্প বা ব্যাঘ্র এসে উপস্থিত হলে নিজেই খাদ্য পরিত্যাগ পূর্বক ঊর্ধ্বশ্বাসে কোন দিকে পালাতে পারে।

যা হোক, খাদ্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন কিছুর উপরই নির্ভর না করে কেবল আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করা কর্তব্য। এরূপ মনে করবে যে, আল্লাহতা'আলা দয়াপূর্বক আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার প্রাণ রক্ষার জন্য নানাবিধ সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যের আয়োজন করে আমার হেফাযতের ব্যবস্থা করেছেন। বাহুবল এবং খাদ্য দ্রব্যের হেফাযতও তাঁরই দয়ার উপর নির্ভর করে। আমার প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে খাদ্য দ্রব্যের উপর কিংবা আমার বাহুবলের উপর নির্ভর করা চলে না। সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহতা'আলার দয়ার উপরই নির্ভর।

করণীয় কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণী ও তাওয়াক্কুল ঃ করণীয় কার্যসমূহের কতকগুলো উপকরণ এমনও আছে, যার অভাবে কার্য না হওয়া সুনিশ্চিত নয়। প্রকাশ্যতঃ দেখা যায়, তদভাবে সচরাচর কার্য সম্পন্ন হয় না কিংবা

https://kitabbhubon.com

হওয়া নিতান্ত কঠিন হয়। কিন্তু কদাচিৎ সে সমস্ত উপকরণ ছাড়াও কষ্টে সৃষ্টে কার্য নির্বাহ হওয়া সম্ভব হয়। এরূপ উপকরণের ব্যবস্থার প্রকারভেদে তাওয়াক্কুলের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। দেখ, লোকালয় ত্যাগ করে বিজনে অরণ্য ভ্রমণে গমন করলে তখন পথের সম্বল সঙ্গে লওয়া বা না লওয়ার সাথে তাওয়াক্কুলের কোনই সম্পর্ক নেই। কেননা ভ্রমণকালে পাথেয় সঙ্গে লওয়া রছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত এবং পূর্ব যুগের বুযুর্গানে দীনের চিরন্তন অভ্যাস। কিন্তু এরূপক্ষেত্রে পাথেয়ের প্রতি নির্ভর না করে পাথেয় সৃষ্টিকারী এবং তার হেফাযৎকারী আল্লাহ পাথেয়ের প্রতি সর্বান্তকরণের নির্ভর ও ভরসা রাখাই তাওয়াক্কুল, পাথেয় সাথে না লওয়া তাওয়াক্কুল নয়। পথের সম্বলের উপর কেমন করে নির্ভর করা যেতে পারে ? তাও পথিমধ্যে যে কোন সময়ে অন্যে কেড়ে নিতে পারে। তবে যে ব্যক্তি সপ্তাহকাল পর্যন্ত কোন কিছু আহার না করে ক্ষুধার যন্ত্রনা সহ্য করবার কিংবা অরণ্যের ঘাস-পাতা ভক্ষন করে জীবন ধারন করার অভ্যাস করে নিয়েছে-তদ্রূপ লোকের পক্ষে পথের সম্বল না নিয়ে অরণ্যে যাত্রা করা তাওয়াক্কুল বিরোধী কার্য নয়। বরং একে পূর্ণতম তাওয়াক্কুল বলতে হবে। তা তখন তার পক্ষে একেবারে খাদ্য গ্রহণ না করার ন্যায় শরীঅত বিরুদ্ধ কার্য বলে গণ্য হবে না। কেননা খাদ্য গ্রহণ না করা কখনও তাওয়াক্কুল নয়। সপ্তাহকাল অনাহারে থাকতে এবং ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি পাথেয় সঙ্গে না নিয়ে কেবল আল্লাহর অনুগ্রহের ভরসা করে অরণ্য যাত্রা করে, তবে বিজন বনে এমন অতর্কিত স্থান থেকে তার খাদ্য এসে পৌছতে পারে, যে স্থানের কথা সে কোন সময় কল্পনাও করে নেই। হযরত ইব্রাহীম খাওয়াছ কুদ্দেসা সিররুহু উন্নত পর্যায়ের মুতাওয়াক্কিল ছিলেন। তাঁর মধ্যে দীর্ঘকাল অনাহারে এবং শুধু তৃণলতা খেয়ে জীবনধারন করার শক্তিতে প্রচুর ছিল। তিনি পাথেয় সঙ্গে না নিয়ে অরণ্যে চলে যেতেন। কিন্তু নরুন, সূঁচ, বালতি ও রশি সাথে নিয়ে যেতেন। কেননা এই দ্রব্যগুলো তৎসংশ্লিষ্ট কার্যের অপরিহার্য উপকরণ। বিজন অরণ্যে নখ কাটবার প্রয়োজন হলে, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কিংবা কুপ থেকে পানি তুলবার প্রয়োজন হলে, তথায় নরুন, সূঁচ, বালতি ও রশি

https://kitabbhubon.com

পাওয়ার কোন উপায় নেই। অথচ এ সমস্ত উপকরণ ভিন্ন সে কার্যগুলো সম্পন্ন করার অন্য কোন উপায়ও নেই। সমস্ত উপকরণ সঙ্গে না নেয়াকে তাওয়াক্কুল বলা যায় না; বরং তদ্রূপক্ষেত্রে উপরোক্ত উপকরণগুলোর উপর ভরসা না করে কেবল আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করাকেই তাওয়াক্কুল বলা হয়।

বৃক্ষ-লতা ও ঘাস-পাতাবিহীন নির্জন গুহার অভ্যন্তরে, যথায় কোন লোক জনের যাতায়াত নেই, কোন প্রকার ঘাস-পাতাও নেই এমন স্থানে বসে যদি মনে করে, এখানে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করছি, আমার আহারের বন্দোবস্ত তিনি করে দিবেন, তবে তার এরূপ স্থানে বসে থাকা হারাম হবে। এরূপ স্থানে নিশ্চেষ্ট বসে থেকে অন্ন জল ব্যতীত তার প্রাণ বিনষ্ট হলে তা আত্মহত্যা বলে গণ্য হবে। আত্মহত্যা শরীঅতের দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ বা জঘন্যতম পাপ। সৃষ্টি প্রতিপালনের আল্লাহর অভ্যাস বা প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এরূপ ক্ষেত্রে বিনা উপকরণে আল্লাহর উপর নির্ভরকারীকে সেই মুআক্কিলের সাথে তুলনা করা হয়, যে মুআক্কিল সবিশেষ অবগত আছে যে, দলিল নিয়ে উপস্থিত না হলে মোকদ্দমা করাতো দূরের কথা মুআক্কিলের সাথে কথা বলা ও উকীলের স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ক্ষেত্রে বিনা দলিলে উকিলের নিকট গেলে মোকদ্দমা বিনষ্ট হবে।

পুরাতন যুগে কোন একজন দরবেশ লোকালয় ত্যাগপূর্বক কোন এক তৃণলতা বিহীন বিজন পর্বত গুহায় আল্লাহর তরফ থেকে আহার পাবার আশায় তাঁর প্রতি নির্ভর করে বসে রইলেন। সপ্তাহ কাল উক্ত গুহায় কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু কোন স্থান থেকেই কোন খাদ্যের ব্যবস্থা হল না। অবশেষে দরবেশ লোকটি অনাহারে মৃতবৎ হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তৎকালীন পয়গম্বরকে ওহী দ্বারা জানালেন যে, অমুক দরবেশকে অমুক গুহায় গিয়ে বলে দাও যে, আমার ইজ্জতের কসম, সে লোকালয়ে ফিরে গিয়ে জন সমাজে বাস না করা পর্যন্ত আমি তাকে রিযিক প্রদান করব না।' এই কঠোর ঘোষনা শ্রবণে দরবেশ লোকটি তৎক্ষনাৎ লোকালয়ে এসে মানুষের সাথে বসবাস আরম্ভ করতেই নানা স্থান থেকে বহু 'হাদইয়া'

https://kitabbhubon.com

আসতে লাগল, এতে দরবেশের মনে বিষম খট্‌কা বাধল। আল্লাহ্‌তা'আলা পয়গম্বরের মাধ্যমে ওহী দ্বারা তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি স্বীয় বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টি পালনের কৌশল ওলট পালট করতে চেয়েছিলে। তোমার এতটুকু জ্ঞান নেই যে, আমি আমার বান্দাগণকে যে রিযিক প্রদান করে থাকি তা আমার অন্যান্য বান্দাগণের হাত দ্বারা পৌঁছিয়ে দেওয়া আমি পছন্দ করি। আমার নিজ হাতে প্রদান করা আমার পছন্দীয় নয়। এরূপে শহরের মধ্যে অর্থাৎ লোকালয়ে নিজের গৃহাভ্যন্তরে লুকিয়ে দ্বার রুদ্ধ করতঃ আল্লাহর তরফ থেকে রিযিক পাবার আশায় তাওয়াক্কুল করে বসে থাকাও 'হারাম'। এর কারন এই যে, অপরিহার্য উপকরণ থেকে দূরে সরে থাকা নিতান্ত অন্যায়। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ না করে আল্লাহতা'আলার তরফ থেকে জীবিকা প্রাপ্তির আশায় তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল করে গৃহাভ্যন্তরে বসে থাকা জায়েয। তাও এই শর্তে যে, দরজা দিয়ে কেউ কিছু নিয়ে ঘরে ঢুকছে কিনা তা দেখবার জন্য উৎসুক নেত্রে বার বার সেদিকে যেন দৃষ্টি করা না হয় বরং তার অন্তর মানুষের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কেবল আল্লাহর সাথে লাগিয়ে এবাদৎ কার্যে মশগুল থাকে। তৎসঙ্গে এরূপ পূর্ণ বিশ্বাসও যেন মনে রাখে যে, আমি যখন অপরিহার্য আসবাব বা উপকরণ থেকে দূরে সরে যাইনি। বরং আল্লাহর উপরই নির্ভর করেছি, তখন অবশ্যই আমি রিযিক থেকে বঞ্চিত থাকব না। এস্থলে বুযুর্গানে দ্বীনের সেই কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে, তাঁরা বলেছিলেন– 'বান্দা যদি রিযিক থেকে দূরে পলায়ন না করে, তবে জীবিকা তার পশ্চাৎ ঘুরে তাকে অন্বেষণ করবে। কেউ যদি আল্লাহর সমীপে এরূপ প্রার্থনা করে যে, 'হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দিও না।' তখন আল্লাহ্‌ বলেন, ' রে নিরোধ! আমি কি তোকে রিযিক না দিবার জন্য সৃষ্টি করেছি ? তা কখনই হবে না– আমি তোকে রিযিক দিবই।' যা হোক, প্রকৃত তাওয়াক্কুলের পরিচয় 'এই যে, মানুষ যেন কার্য সম্পাদনের অপরিহার্য আসবাব ও উপকরণ থেকে পলায়ন না করে কিংবা আসবাব অবলম্বন না করে কেবল তাকে রিযিক প্রাপ্তির কারণ মনে করে; বরং আসবাব সৃষ্টিকারী একমাত্র আল্লাহকেই রিযিকদাতা বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং সমস্ত বান্দা এমন কি, সমস্ত সৃষ্ট জীব তাঁরই প্রদত্ত রিযিক খেয়ে

https://kitabbhubon.com

জীবন ধারন করছে যদিও তন্মধ্যে কেউ কেউ লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করত ভিক্ষা করে খাচ্ছে, কেউ বা দেহপাপ, পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করতঃ দোকানদারী ও ব্যবসা করে খাচ্ছেন। আবার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরকারী দরবেশগণ নিজ নিজ খান্কায় বসে ইজ্জতের সহিত আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক খাচ্ছে। তাঁরা সকলেই আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন। যা কিছু তাঁদের নিকট উপস্থিত হয় সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে আসতে দেখতে পান। মধ্যস্থলে কোন মানুষের বা কোন সৃষ্ট পদার্থের হাত আছে বলে মনে করেন না।

করণীয় কার্যের তৃতীয় শ্রেণী ও তাওয়াক্কুল ঃ কার্য সম্পাদনে যে সমস্ত উপকরণ বা আসবাব সুনিশ্চিতরূপে অপরিহার্য নয়, সেগুলো ছাড়াও কোন কোন সময় কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়েই তদ্রূপ উপকরণের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। সেই শ্রেণীর উপকরণগুলোকে ছল-চাতুরী ও কলা- কৌশলের অন্তর্গতই বলা যায়। বরং সেগুলোকে আসবাব অর্থাৎ কার্য সম্পাদনের উপকরণ মনে করার কোন প্রকাশ্য যুক্তি নেই। তদ্রূপ আবশ্যকীয় আসবাব ব্যবহার করলে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থাকে না। যেমন– রোগ চিকিৎসার জন্য ওষুধ সেবন করা রোগ দূরীকরণের অপরিহার্য কারণ। তা না করে মন্ত্র-তন্ত্র, ফাল, দাগ প্রভৃতির আশ্রয় নেয়া আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলকে বিনষ্ট করে দেয়। এমন কি, ঈমান নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা হয়। হযরত রছূলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে বলেছেন– 'যারা মন্ত্র-তন্ত্র বা ফালও দাগের আশ্রয় গ্রহণ করে না তারাই প্রকৃত মুতাওয়াক্কিল।' কিন্তু যারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষি কর্ম পরিত্যাগ করে লোকালয় ত্যাগ পূর্বক জঙ্গলে বনে আল্লাহর তরফ থেকে আহার প্রাপ্তির আশায় তাকিয়ে থাকে, তাদেরকে তিনি মুতাওয়াক্কিল বলেন নি।

উপার্জন কার্যে তাওয়াক্কুলকারীর শ্রেণী বিভাগ

উপার্জন কার্যে তাওয়াক্কুলকারীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী- এই শ্রেণীর মুতাওক্কিলগণ আল্লাহর বিশিষ্ট ও উন্নত স্তরের বান্দা। এরা পথের সম্বল না নিয়ে বিজন বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করেন।

https://kitabbhubon.com

এদের তাওয়াক্কুল সর্বাপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের তাওয়াক্কুল। এই শ্রেণীর লোক দীর্ঘকাল ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করবার অভ্যাস করে নিয়েছেন। সপ্তাহকাল বা তদপেক্ষা অধিক সময় ব্যাপিয়া কোন কিছু না খেয়ে সন্তোষের সাথে কাল যাপন করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। অরণ্যের ঘাস, পাতা ও তৃণ লতা খেয়ে নিরুদ্বেগে ও স্বচ্ছন্দে জীবন ধারন করতে পেরেছেন। ঘাস-পাতা না পেলে মৃত্যুভয়ে বিচলিত না হয়ে অনাহারে মৃত্যুকে আনন্দের সাথে আলিঙ্গন করতেও প্রস্তুত থাকেন। মৃত্যু ঘটার ব্যাপারে তাঁরা সম্বলহীন ও সম্বলশালী লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না। তাঁরা মনে করেন যে, সম্বলের উপরই কেমন করে নির্ভর করা যায় ? যে কোন মুহূর্তে কেউ এসে সম্বল কেড়ে নিতে পারে। তখন সম্বলশালী লোকও তো বিজন অরণ্যে মৃত্যুরই সম্মুখীন হবে। তবে সম্বল সাথে নিয়ে আর কি লাভ ? বরং সম্বল সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহকেই তারা প্রধান সম্বলরূপে অবলম্বন করে বের হন। তাঁরা মনে করেন, বিনা সম্বলে বের হলে ঘাস পাতা পর্যন্ত না পেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ভ্রমন পথে কৃচিৎক্রমেই ঘটে থাকে, কাজেই এমন কচিৎ সম্ভাবনার ভয়ে সম্বল নিয়ে ভ্রমণে যাত্রা করা ও জায়েয নয়। বিশেষত- জীবন ধারনের জন্য নিশ্চিত উপকরণ অন্ততঃপক্ষে ঘাস-পাতা থেকে তাঁরা দূরে পলায়ন করছেন না। আবার দীর্ঘকাল অনাহারে থাকার অভ্যাসও আছে। এরূপক্ষেত্রে বিনা সম্বলে বের হলে মৃত্যু ঘটবার আশঙ্কা থাকবে কেন ? আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে মৃত্যু-ভয়ের প্রতিবিধান করার কোনই প্রয়োজন বিবেচনা করেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণী- এই শ্রেণীর মুতাওয়াক্কিলগণ জীবিকা উপার্জনের নিমিত্তে কোন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশা অবলম্বন করেন না। আবার লোকালয় ত্যাগ করে তাওয়াক্কুল রক্ষার জন্য বিজন অরণ্যেও চলে যান না। শহরের কোন মসজিদে নির্জনে বসে এবাদতে মশগুল থাকেন। অথচ লোকের নিকট থেকে জীবন ধারনের মত কিছু পাওয়ার জন্যও প্রত্যাশী থাকেন না; বরং কেবল আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহের ভিখারী হয়ে মসজিদে পড়ে থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী- এই শ্রেণীর তাওয়াক্কুলকারীগণ জীবিকা উপার্জনের নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করে বাইরে যান বটে; কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য আসবাব

https://kitabbhubon.com

গ্রহণ ও নিয়ম প্রতিপালন সম্বন্ধে শরীঅতের যে বিধান আছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে কাজ করেন। উপার্জনকালে কোন প্রকার অন্যায় কলা-কৌশল বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাঁরা ছল-চাতুরী প্রতারণা প্রবঞ্চনার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করাকে বিশেষ ভয় করে থাকেন উপার্জনকালে ছল-চাতুরী ও অন্যান্য কৌশল অবলম্বন করলে তার অবস্থা সেই রোগীর ন্যায়ই হবে, যে ব্যক্তি রোগে ওষুধ সেবন না করে তন্ত্র-মন্ত্র ও ফাল বা দাগের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এতদুভয় ক্ষেত্রেই তাওয়াক্কুল বিনষ্ট হয়ে যায়।

শিল্প বাণিজ্য থেকে বিরত থাকা তাওয়াক্কুলের শর্ত নয়

তাওয়াক্কুল অর্জনের জন্য জীবিকা অর্জনের অপরিহার্য পন্থা কৃষি-কর্ম বা শিল্প-বাণিজ্য পরিহার করা শর্ত নয়। এর প্রমাণ এই যে, হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রা) চরম উন্নত পর্যায়ের তাওয়াক্কুলকারী মহাপুরুষ ছিলেন। তথাপি তিনি মুসলিম বিশ্বের খলীফা থাকাকালেও কাপড়ের বস্তা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে বাজারে যেতেন। লোকে জিজ্ঞেস করত, 'হে আমীরুল মুমেনীন! খলীফা হয়ে আপনি কেন ব্যবসা করছেন ? তিনি উত্তর করতেন–'আমি নিজ পরিবারের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করছি। যদি ব্যবসা না করি তারা বিনাশ প্রাপ্ত হবে। নিজ পরিবারবর্গকে যদি বিনাশ করি, তবে অন্যান্য লোকদেরকেও শীঘ্রই বিনাশ করে ফেলব।' অবশেষে জনসাধারণ বাইতুলমাল থেকে তাঁর জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তদবধি তিনি ব্যবসায় বাণিজ্য পরিত্যাগপূর্বক নিশ্চিন্ত মনে একান্ত মনোযোগের সাথে তাঁর সমস্ত সময়টুকু খেলাফৎ অর্থাৎ রাজ্য শাসনও প্রজাপালন কাজে ব্যয় করাবার অবসর পেয়েছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা কালেও তাঁর তাওয়াক্কুল এমন উন্নত স্তরের ছিল যে, ব্যবসায় লব্ধ ধনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। ব্যবসায়ে যা কিছু লাভ দেখতেন তাকে নিজের মূলধন বা নিজের চেষ্টা প্রসূত বলে মনে করতেন না; বরং এই মনে করতেন যে, কেবল মাত্র আল্লাহ্পাকের দয়া ও অনুগ্রহের ফলেই ধনের সমাগম হচ্ছে। নিজের অর্জিত ধনকে তিনি সর্বসাধারণ মুছলমানের ধন সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয় বা অধিক হিতকর বলে জ্ঞান করতেন না।

https://kitabbhubon.com

যা হোক, ফল কথা এই যে, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাব ব্যতীত তাওয়াক্কুল লাভ হয় না। তাওয়াক্কুলের জন্য সংসারের মোহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা শর্ত। কিন্তু সংসার বিরাগী হওয়ার জন্য তাওয়াক্কুল শর্ত নয়। হযরত আবূ জাফর হাদ্দাদ, খাজা হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহেমাহুমাল্লাহুর পীর ছিলেন। তিনি একজন অতি উচু পর্যায়ের তাওয়াক্কুলকারী মহাপুরুষ ছিলেন। হযরত আবুজাফর (রহঃ) বলেছিলেন– "আমি স্বীয় তাওয়াক্কুল ভাবটি ২০ (বিশ) বছর যাবৎ গোপন রেখেছিলাম। বাজারে গিয়ে প্রতিদিন আমি এক দীনার উপার্জন করতাম। তা থেকে একটি মাত্র কীরাত (কপর্দক) ব্যয় করেও কোন সময় হাম্মাম খানায় গিয়ে গোসল করতাম না; বরং উপর্জিত সম্পূর্ন অর্থই দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ বা ছদকা করে দিতাম। হযরত জুনাইদ (রহঃ) কখনও পীরের সম্মুখে তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে কোন কথা বলতেন না। তিনি বলতেন– 'তাওয়াক্কুল আমার পীর মহোদয়ের নিজস্ব মোকাম, সে সম্বন্ধে তাঁর সম্মুখে কোন কথা বলতে আমি লজ্জাবোধ করতাম।

যে সমস্ত সূফী দরবেশ লোক খানকায় নির্জনে বসে এবাদতে লিপ্ত থাকেন আর তাঁদের মুরীদগণ জীবিকার্জনের জন্য খান্কার বাইরে থাকে, তাঁদের তাওয়াক্কুল জীবিকা সংগ্রহের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বনকারীদের তাওয়াক্কুলের ন্যায় দুর্বল। তাওয়াক্কুল পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যদি কোন ব্যক্তি 'ফতুহ' বা কাশ্ফ্ হাছিল হওয়ার উমীদ ওয়ারীতে বসে থাকেন, তবে তাঁর তদ্রূপ অবস্থানকে ঠিক তাওয়াক্কুল না বলে তাওয়াক্কুলের কাছাকাছি অবস্থা বলা যেতে পারে। তাঁর তদ্রূপ অবস্থিতির স্থান যদি বহু লোকের নিকট পরিচিত হয় এবং তদুপায়ে তিনি বহু লোকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান এবং তাতে তাঁর জীবিকা সমাগম বিষয়ে মনে কিঞ্চিৎ ভরসার উদয় হয়, তবে তাঁকে বাজারী দোকানদারের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় যদি তাঁর মন লোক সমাজে পরিচিত হওয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং তৎসাহায্যে জীবিকা বিষয়ে মনে ভরসার সঞ্চার না হয়, তবে তাঁর তাওয়াক্কুল ব্যবসায়ী লোকের তাওয়াক্কুলের সমতুল্য। এসম্বন্ধে আসল কথা এই যে, উপার্জন বিষয়ে মানুষ যেন কোন সৃষ্ট পদার্থের প্রতি ভরসা না

https://kitabbhubon.com

রাখে; বরং কেবল যাবতীয় আসবাব ও উপকরণের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।

হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস বলেছেন– 'একদা আমি হযরত খিযির (আঃ)-কে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে অবস্থান করতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু এই ভয়ে আমি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলাম যে, আমি তাঁর সঙ্গে থাকলে সর্ববিষয়ে তাঁর উপর কিছু কিছু নির্ভর করে আমার অন্তরে শান্তিলাভ করব এবং তার ফলে আল্লাহর প্রতি আমার নির্ভর দুর্বল হয়ে পড়বে। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) একদিন জনৈক শ্রমিককে নিজের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। কার্য শেষে তিনি তাঁর একজন শিষ্যকে বললেন, এই শ্রমিককে তার শ্রমের ন্যায্য আজুরা অপেক্ষা কিছু বেশি দিয়ে দাও। শিষ্য অধিক আজুরা দিতে চাইলে শ্রমিক তা থেকে নিজের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিয়ে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিয়ে চলে যায়। ইমাম ছাহেব স্বীয় শাগরেদকে পূনরায় বললেন– 'শ্রমিকের পিছু পিছু ধাবিত হয়ে অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে আস।' শাগরেদ এতে প্রতিবাদ করে বলেছিল– 'সে যখন প্রথমেই অতিরিক্ত পরিশ্রমিক গ্রহণ করেনি। এখন সে তা পূণরায় নিবে কেন ? ইমাম সাহেব বললেন, 'তখন হয়ত অতিরিক্তের প্রতি তার লোভ হয়েছিল এবং সে লোভ সংবরণের জন্য তার উল্টা চলবার সংকল্পে সে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণে সম্মত হয়নি। এখন হয়তো তার লোভ দূরীভূত হয়েছে, কাজেই এখন আপত্তি নাও করতে পারে।

যা হোক, ফল কথা এই যে, মূলধনের কিংবা উপার্জিত অর্থের প্রতি বিন্দুমাত্র নির্ভর না করে কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি ভরসা রাখাই উপার্জনরত লোকের তাওয়াক্কুল। তার লক্ষণ এই যে, এ মূলধন চুরি কিংবা বিনষ্ট হয়ে গেলে তাতে সে কিছুমাত্র বিচলিত বা বিমর্য হয় না এবং রিযিক প্রাপ্তি সম্বন্ধে তার মনে কোন প্রকার হতাশা বা অস্থিরতাও আসে না। আল্লাহর প্রতি অটল ভরসা রাখে বলে তার মনে এমন স্থির বিশ্বাস আছে যে, তার রিযিক প্রাপ্তির উছিলা বিনষ্ট হয়ে থাকলেও আল্লাহ এমন স্থান থেকে তার রিযিক সংগ্রহ করে দিবেন যা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই। যদি একান্তই কোন স্থান থেকে তার রিযিক না আসে তখন তার এরূপ অগাধ বিশ্বাস থাকে যে, হয়ত রিযিক না পাওয়ার মধ্যেই আমার মঙ্গল নিহিত আছে।

https://kitabbhubon.com

রিযিক দেওয়া বা না দেওয়া আল্লাহর মঙ্গল বিধান, এরূপ মনোভাব জন্মাবার উপায়

প্রিয় পাঠক! জেনে লও, আল্লাহ মানুষকে রিযিক দিলেও মঙ্গল, না দিলেও মঙ্গল, এরূপ মনোভাব খুবই দুর্লভ। ধনবান ব্যক্তির ধন চুরি হয়ে গেল কিংবা কোন উপায়ে বিনষ্ট হয়ে গেল অথচ তাতে তার মন কিছু মাত্র বিচলিত হল না, সম্পূর্ণ প্রশান্ত ও সুস্থির রইল। এরূপ অবস্থা দুষ্প্রাপ্য হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। এমন উন্নত অবস্থা এরূপে লাভ করা যায় যে, প্রথমে আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ নির্ভর ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে নিতে হয়। অতঃপর পূর্ণ বিশ্বাসে ও নিঃসন্দেহে একথা বুঝে নিতে হয় যে, অসংখ্য রিক্ত হস্ত ও পূঁজিবিহীন প্রাণীকে আল্লাহ সদা সর্বদা প্রচুর জীবিকা প্রদান করছেন। মানুষের মধ্যেও বহুলোক কোন পূঁজি ব্যতীত কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে নানাবিধ উপায়ে রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছে। আর পুঁজিপতি লোকের মধ্যে এমন অনেক আছে, পূঁজির কারণে তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন বিনষ্ট হচ্ছে। পূঁজি না থাকলে হয়ত তাদের জীবন নষ্ট হত না। সুতরাং পুঁজি বিনষ্ট হওয়াতেই আমার মঙ্গল।

জনাব রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'সচরাচর এমন অনেক ঘটনা ঘটে, মানুষ রাতের বেলায় এরূপ কার্যের কামনা করে যা কার্যে পরিণত হলে তার বিনাশ অবধারিত ছিল। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর থেকে তার প্রতি করুনার দৃষ্টিপাত করেন, ফলে তার সে কাজ বানচাল হয়ে যায়। প্রাতঃকালে সে ব্যক্তি নিদ্রা থেকে গাত্রোখান করে যখন দেখতে পায় যে, তার পরিকল্পিত কার্যটি বিগড়িয়ে গিয়েছে, তখন সে খুবই দুঃখিত ও বিষন্ন হয় এবং কাজটি বিগড়িয়ে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকে যে, আমার কাজটি কেন বিগড়িয়ে গেল ? অবশেষে সে ভুল অনুমানে স্থির করে নেয় যে, হয়ত তার কোন প্রতিবেশী বিগড়িয়ে দিয়েছে কিংবা তার চাচাত ভাই কাজটিকে নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু সে ঝুঝতে পারছে না যে, স্বয়ং আল্লাহর রহমত তার অবস্থার সাথী হয়ে তার ক্ষতিকর সে কাজটিকে বিনষ্ট করেছে ও তার

https://kitabbhubon.com

যথেষ্ট হিত সাধন করেছে। এই কারণেই আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলতেন– 'প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে আমি নিজকে সর্বস্বান্ত ফকীর রূপে দেখতে পাব, কি মহা প্রতাপশালী আমিরুল মুমেনীন রূপে দেখতে পাব, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দু মাত্র চিন্তা বা ভয় নেই। কেননা আমার জানা নেই যে, কোন অবস্থার মধ্যে আমার মঙ্গল রয়েছে।

যা হোক, উপরোক্ত বিষয়গুলো বুঝে লওয়ার পর মানুষকে এত জেনে লওয়া আবশ্যক যে, মানবের মহাশত্রু শয়তানই মানুষকে ইত্যাকার দারিদ্র্যের ভয় এবং দুশ্চিন্তার প্রেরণা দিয়ে থাকে। এই মর্মে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন–

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ-

'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখাচ্ছে।' (পারা ৩ঃ সূরা-বাকারা, রুকু-৩৭)

আল্লাহ্‌র দয়াদৃষ্টির উপর নির্ভর এবং ভরসা রাখাই মারেফাত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতা । বিশেষ করে একথা জেনে নেয়া আবশ্যক যে, মানুষের রিযিক অনেক সময় এমন গুপ্ত স্থান থেকে এসে থাকে যা কোন দিন কেউ কল্পনাও করেনি। তাই বলে আবার সেই গুপ্ত আসবাব বা উপকরণের প্রতি নির্ভর করাও সঙ্গত নয়; বরং এরূপ নির্ভর রাখাই কর্তব্য যে, আসবাবসমূহের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আমাদের রিযিক প্রদানের যিম্মাদার রয়েছেন। কেবল তাঁর উপর নির্ভর করাই কর্তব্য।

একজন তাওয়াক্কুলকারী দরবেশ লোক কোন এক মসজিদে বাস করতেন, মসজিদের ইমাম তাঁকে কয়েকবার বলেছিলেন– 'হে দরবেশ! আপনাকে নিঃস্ব ও দরিদ্র বলে মনে হয়, আপনি যদি জীবিকা নির্বাহের জন্য শিল্পাদি কোন কার্য অবলম্বন করতেন, তবে তা আপনার জন্য ভাল হত।' দরবেশ বলল– 'আমার প্রতিবেশী জনৈক ইহুদী আমাকে প্রত্যেহ দু'খান করে রুটি প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তা শ্রবন করে ইমাম ছাহেব বললেন– 'যদি তাই স্থির হয়ে থাকে, তবে কোন ব্যবসা অবলম্বন না করাই সঙ্গত।' দরবেশ বললেন– 'হে ভাই ইমাম! তোমার পক্ষে ইমামত পদ ত্যাগ করাই উচিত। তোমার নিকট একজন ইহুদীর অঙ্গীকার আল্লাহর যিম্মাদারী অপেক্ষা শ্রেয় ঃ এবং দৃঢ়তম বলে বিবেচিত হল।'

https://kitabbhubon.com

অপর এক মসজিদের ইমাম তথায় অবস্থিত এ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমরা রুটি কোথা থেকে এসে থাকে ?' সে ব্যক্তি বলল– 'একটু অপেক্ষা করুন, আপনার পশ্চাতে যে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করেছি তা কাযা করে নেই, তৎপরে আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। কেননা, দেখতে পেলাম, আল্লাহ্ সকল জীবের জীবিকার জিম্মাদার এক কথায় আপনার বিশ্বাস নেই। কাজেই আপনার পশ্চাতে নামায জায়েয হয়নি।

কল্পনাতীত স্থান থেকেও আল্লাহ্ রিযিক দান করে থাকেন

যা হোক, যাঁরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করে ও পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁরা এমন স্থান থেকে কার্য সিদ্ধি দেখতে পেয়েছেন যার প্রত্যাশা কোন দিন করেননি। তাঁদের ঈমান ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর এত দৃঢ় হওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা নিম্নোক্ত আয়াতটির তাৎপযার্থ উত্তমরূপে অনুধাবন করেছিলেন এবং আয়াতটির মর্মের প্রতি তাঁদের ঈমান খুব দৃঢ় ও মজবুত হয়েছিল। আল্লাহতা'আলা এ সমন্ধে বলেছেন–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا-

'ভুপৃষ্টের উপর যত প্রাণী বিচরণ করছে তাদের প্রত্যেকের রিযিকের দায়িত্বই আল্লাহতা'আলার উপর রয়েছে।' (পারা ১২; সূরা হুদ ঃ রুকু-১)

হযরত হুযাইফা গাশীর্কে লোকে জিজ্ঞেস করেছিল– 'আপনি দীর্ঘকাল ব্যাপি হযরত ইব্রাহীম আদহামের সংসর্গে ছিলেন। তাঁর মধ্যে কি কি অলৌকিক বিষয় দর্শন করেছিলেন ? হযরত হুযাইফা বললেন– 'একবার আমরা উভয়ে মক্কা শরীফের দিকে গমন করছিলাম। পথিমধ্যে আমরা উভয়ে অতিশয় ক্ষুধাতুর হয়ে পড়লাম। কুফা শহরে পৌঁছলে ক্ষুধার লক্ষণ আমার মধ্যে বড় ভীষণ ভাবে প্রকট হয়ে পড়ল। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন– 'ক্ষুধার কারণে তুমি কি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছ ?' আমি বললাম–'হ্যাঁ' তখন তিনি আমাকে বললেন– 'কাগজ, কলম ও দোয়াত আন।' আমি তাঁর আদেশ পালন করলে তিনি কাগজের মধ্যে লিখলেন– 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, হে খোদা! তুমিই প্রত্যেক

https://kitabbhubon.com

অবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য। সকলের লক্ষ্য তোমারই দিকে, আমি সর্বদা তোমার প্রশংসা, শোকর গুযারী ও যেকের করছি, কিন্তু বিবস্ত্র, নিরন্ন ও তৃষ্ণাতুর অবস্থায় দিনাতিপাত করছি। তোমার প্রশংসা করা শোকর গুযারী করা এবং যিকির করা এ তিন কার্য আমার কর্তব্য তজ্জন্য আমি দায়ী রইলাম। অন্ন, পানি ও বস্ত্র এ তিনটি বস্তু আমাকে সরবরাহ করা তোমার কর্তব্য, তজ্জন্য তুমি দায়ী থাক।' এ কথাগুলো লিখে কাগজ-খানা আমার হাতে দিয়ে বললেন–'এ নিয়ে, বাইরে যাও, কোন কিছুতে মন লাগবে না। প্রথমেই যার প্রতি তোমার দৃষ্টি পতিত হবে তারই হস্তে এ কাগজ খন্ড প্রদান কর। আমি কাগজ খন্ড নিয়ে বাইরে আসতেই দেখলাম, এক ব্যক্তি উষ্ট্রারোহনে পথ অতিক্রম করছে, তার হস্তে সে কাগজ খন্ড প্রদান করে দাঁড়িয়ে রইলাম, কাগজখানি পাঠ করে উষ্ট্রারোহী ব্যক্তি রোদন করতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– "এই চিঠির লেখক কোথায় আছেন ? আমি বললাম–'তিনি নিকটই এই মসজিদে আছেন। তৎক্ষনাৎ তিনি ছয়শত দীনার পূর্ণ একটি থলে আমার হাতে দিলেন। আমি পার্শ্ববতী লোকের নিকট সেই উষ্ট্রারোহীর পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তিনি একজন খ্রিষ্টান। অতপর আমি হযরত ইব্রাহীম আদহামের সমীপে গমন পূর্বক সমস্ত কথা তাঁকে জ্ঞাপন করলাম। তিনি বললেন– 'থলিতে হাত লাগিও না, এই থলির মালিক শীঘ্রই এখানে আসছে। ইতোমধ্যে সেই খ্রিষ্টান লোকটি এসে উপস্থিত হল এবং হযরত ইব্রাহীম আদহামের পদচুম্বন পূর্বক তাঁর হস্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলেন।

২. হযরত আবু-ইয়াকুব বসরী (রহঃ) বলেছেন–"এক সময় মক্কা শহরে আমি একাধারে দশ দিন ব্যাপি উপবাস ছিলাম, অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে বাইরে গিয়ে পথের উপর একটা শালগম পতিত রয়েছে দেখে মনে মনে ভাবলাম, এ কুড়িয়া নিয়ে আহার করা যাক। এমন সময় আমার মনের মধ্য থেকে ধ্বনি আসল–'দশদিন অনাহারে থাকার পর তোমার অদৃষ্টে কি একটা পঁচা শালগম জুটল ? একথামনে উদিত হওয়া মাত্র তৎক্ষনাৎ আমি হস্ত সংকুচিত করে নিলাম এবং পুনরায় মসজিদে গিয়ে প্রবেশ করলাম, একটু পরেই এক ব্যক্তি এক পেটরা টিকিয়া কাবাব, মিশ্রী ও বাদামের শাঁস নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হল এবং হস্তস্থিত

https://kitabbhubon.com

দ্রব্যগুলো আমার সম্মুখে স্থাপন পূর্বক বলতে লাগল–সমুদ্রে ভ্রমনকালে হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠে আমার জাহাজ বিপন্ন করে তুললে সে বিপদে আমি মানত করেছিলাম নিরাপদে সমুদ্র পার হতে পারলে এ সমস্ত দ্রব্য দরবেশকেই প্রদান করব যাঁকে সর্বপ্রথমে দেখতে পাই।" এ শুনে আমি প্রত্যেক দ্রব্য থেকে এক এক মুষ্টি তুলে নিয়ে অবশিষ্টগুলো তার হাতে দিয়ে বললাম 'এ আমি তোমাকে দান করলাম। অতপর মনে মনে বলতে লাগলাম, হে মন! ভেবে দেখ, আল্লাহ কেমন সুকৌশলে রিযিক প্রদান করে থাকেন, চিন্তা করে বুঝতে চেষ্টা কর। এখানে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছি, আমার রিযিক প্রদানের জন্য কেমন সুন্দর কৌশল করলেন। তিনি আমার রিযিকের ব্যবস্থার জন্য বায়ুকে আদেশ করলেন, বায়ু ভীষন তুফানে পরিণত হয়ে এই ব্যক্তিকে সমুদ্রের বুকে বিপন্ন করে তুলল। আর সেই সুযোগে তোমার খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে গেল। তুমি কিছুই বুঝতে পার না। অন্ধের মত প্রকৃত স্থান না দেখে এদিকে সেদিকে খুঁজে মরছ। যা হোক, এই প্রকারের দুর্লভ ও বিচিত্র উপখ্যান শ্রবন করলে অন্তরে ঈমান মজবুত হয়ে থাকে।

পোষ্যবর্গ বিশিষ্ট লোকের তাওয়াক্কুলের বিবরণ

প্রিয় পাঠক! অবগত হও, পোষ্যবর্গ বিশিষ্ট লোকের পক্ষে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি জীবিকা উপার্জনের উপায় থেকে হাত গুটিয়ে অরণ্যের দিকে চলে যাওয়া সঙ্গত নয়। এতে তাওয়াক্কুল হয় না, বরং পরিবার বিশিষ্ট লোকের তাওয়াক্কুল এই যে, তৃতীয় শ্রেণীর উপার্জন সম্বন্ধীয় বিবরণে ইতোপূর্বে ব্যবসায়ী লোকের উপর্জন ও তাওয়াক্কুল সমন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে তদনুযায়ী উপার্জনে রত থাকাই পরিবার বিশিষ্ট লোকের তাওয়াক্কুল। যেমন– হযরত আবুবকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন।

বস্তুতঃ তাওয়াক্কুল করে থাকা সে ব্যক্তির পক্ষেই সঙ্গত হয়, যে ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি গুণ বিদ্যমান। ১. ক্ষুধা সহ্য করবার ক্ষমতা এবং আবশ্যক বোধে যতক্ষণ সম্ভব ঘাস-পাতা প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য ভক্ষণে জীবন ধারনের ক্ষমতা থাকা। ২. আল্লাহ তা'আলার বিধানে এবং

https://kitabbhubon.com

স্বীয় ভাগ্যলিপিতে নির্ধারিত জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকার ক্ষমতা। নিরবচ্ছিন্ন অনাহার সহ্য করতে হলে কিংবা শেষ পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যুৎ ঘটবার উপক্রম হলে তাতেই নিজের জন্য আল্লাহতা'আলার নির্ধারিত বলে এবং তাতেই স্বীয় মঙ্গল নিহিত রয়েছে বলে দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করতে হবে। এ দুটি গুণ মানুষ নিজের পরিবারস্থ লোকদেরকে স্বতন্ত্রভাবে বাধ্য করতে পারে না, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের নাফসাকেও পরিবারস্থ একজন লোকের ন্যায় মনে করতে হবে। যদি মনে কর যে, নিজের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রনা সহ্য করার উপযোগী ক্ষমতা নেই। তাওয়াক্কুল করে অনাহারে থাকলে নাফ্স ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়বে। ঘাস-পাতার ন্যায় সামান্য পদার্থ ভক্ষনে প্রবৃত্তি হবে না। তদবস্থায় নিজের নাফ্সকেও উপার্জন ত্যাগ পূর্বক তাওয়াক্কুল করতে বাধ্য করা যাবে না। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে উপার্জন পরিত্যাগ করে আল্লাহর তরফ থেকে খাদ্য প্রাপ্তির আশায় বসে থাকা জায়েয নয়। এরূপে পরিবারস্থ লোকেরা যদি ক্ষুধা সহ্য করতে ও ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণের ক্ষমতা না রাখে এবং অনাহারে থাকলে ব্যাকুলও অস্থির হয়ে পড়ে, তবে পরিবার পরিচালকের পক্ষে উপার্জন পরিত্যাগ করা জায়েয নয়, কিন্তু পরিবারস্থ লোকরাও যদি পরিচালকের ন্যায় উক্ত দু'গুনের অধিকারী হয়ে থাকে এবং উপার্জন পরিত্যাগ পূর্বক তাওয়াক্কুল অবলম্বন করতে পরিচালক ব্যক্তিকে সম্মতি ও অনুমতি প্রদান করে, তবে তার পক্ষে ব্যবসায় বা উপার্জন পরিত্যাগ করা জায়েয আছে। নিজের নফ্স এবং পরিবারস্থ অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নিজের নাফ্সকে যবরদস্তী অনাহারে রাখা দুরস্ত আছে, কিন্তু পরিবারস্থ লোকদেরকে তাদের অনুমতি ও সম্মতি ভিন্ন যবরদস্তী অনাহারে রাখা দুরস্থ নয়।

মানুষকে জীবিকা প্রদানের কৌশল

মানুষের ঈমানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে এবং সে অতঃপর তাক্বওয়া পরহেযগারীর কার্য আরম্ভ করলে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞান, অপার ক্ষমতা এবং বিশ্বজনীন দয়া বিশেষভাবে বুঝে নিয়ে কেবল তাঁর উপর নির্ভর করতঃ তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে আদেশ ও নিষেধাবলী যথযথভাবে

https://kitabbhubon.com

পালনে প্রবৃত্ত হলে মানুষের পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি জীবিকা নির্বাহের উপায় পরিত্যাগ করা সঙ্গত। কেননা যখন স্বয়ং আল্লাহতা'আলা তার জীবিকা সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকেন অর্থাৎ তার জীবিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে থাকেন অর্থাৎ তার জীবিকা সংগ্রহের বাহ্য উপকরণ ও আসবাবসমূহ আপনা আপনি জুটে যায়, চেষ্টা বা পরিশ্রম পূর্বক তাও সংগ্রহ করতে হয় না। একথাটি পরিস্কারভাবে বুঝবার জন্য একটা উপমা দেয়া যাচ্ছে। দেখ, শিশু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম থাকে, এমনকি নিজের খাদ্য নিজে গ্রহণ করার ক্ষমতাও থাকে না। অতএব করুণাময় আল্লাহ তদবস্থায় শিশুর খাদ্য নাভী-নাড়ীর সাহায্যে তার উদরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। আবার শিশু মাতৃ-উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হলে তার খাদ্য মাতৃবক্ষ থেকে দুগ্ধাকারে বের করে থাকেন, এ সময়ে শিশুর দাঁত থাকলে মাতার পক্ষে শিশুকে দুগ্ধ প্রদান করা কষ্টকর হত। এ কারণে যখন শিশু নিজের খাদ্য চর্বন করে ভক্ষন করার উপযোগী হয়, ঠিক সেই সময়ে কঠিন খাদ্য চর্বন করে খাওয়ার জন্য শিশুর মাড়িতে দন্ত উৎপন্ন করে থাকেন। তখন পিতামাতা চেষ্টা ও পরিশ্রম পূর্বক শিশুর খাদ্য সংগ্রহের জন্য তৎপর থাকেন। সেই পিতা-মাতার বিয়োগ ঘটলে শিশু যখন এতিম হয়ে যায়, তখন করুণাময় আল্লাহতা'আলা পিতা-মাতার পরিবর্তে তার পরিবারস্থ কিংবা আত্মীয় প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে বহু লোককে তার প্রতিপালনের নিমিত্ত দাঁড় করে দেন। পিতা মাতার হৃদয়ে শিশুর প্রতি স্নেহ মমতা প্রবল করে দেয়ার কারণে তারা যেমন–অতি আদর ও যত্নের সাথে তাকে প্রতিপালন করত, পিতা-মাতার বিয়োগের পর সেই স্নেহ মমতাকে আল্লাহ্ অন্যান্য লোকের অন্তরে প্রবল করে থাকেন। এর ফলে বহু নর-নারী সেই অসহায় অনাথ শিশুর প্রতি স্নেহ ও মমতাশীল হয়ে পিতা-মাতার ন্যায় তাকে অতি যত্নের সাথে প্রতিপালন করতে আরম্ভ করে। অতঃপর শিশু বড় হয়ে যৌবন অবস্থায় পৌছলে করুণাময় আল্লাহ তাকে জীবিকা উপার্জনের জন্য নানাবিধ ক্ষমতা প্রদান করত উপার্জনেচ্ছাকে তার হৃদয়ে প্রবল করে থাকেন এবং আত্ম প্রতিপালনেচ্ছা তার হৃদয়ে দণ্ডধারী প্রহরীর ন্যায় নিযুক্ত করে দেন। এর ফলে নিজের প্রাণের জন্য নিজের মনে প্রচুর মমতার উৎপত্তি হয়ে সর্বদা আত্ম-প্রতিপালনে আত্ম সুখ-শান্তি অর্জনে একান্ত তৎপর হয়ে ওঠে। শৈশবকালে যেমন মাতৃহৃদয়ে সন্তান বাৎসল্য

https://kitabbhubon.com

উৎপন্ন করে দিয়ে স্নেহ ও মমতার সাথে তার প্রতিপালন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছেন, এখন যৌবন কালে তার নিজের হৃদয়ে আত্মপ্রতিপালন ও আত্ম সুখ-শান্তি লাভের আকাঙ্খা জাগিয়ে নিজের দ্বারা নিজের প্রতিপালন ও সুখ শান্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে শিল্প-বাণিজ্য কিংবা অন্যবিধ কোন উপায়ে জীবিকা অর্জনপূর্বক নিজের প্রাণরক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে থাকে। পিতা-মাতা একাকী হলেও তাঁদের হৃদয়ে সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ও মমতা অতুলনীয়। কাজেই তাঁরা অনুপম ভালবাসা ও মমতার সাথে শিশুর প্রতিপালন করতে থাকেন। আবার যখন তাঁদের মৃত্যু ঘটলে শিশুর প্রতিপালনের সেই একটা মাত্র পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তৎপরিবর্তে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক অনাথায় শিশুর প্রতিপালনের নিমিত্ত শত শত পথ খুলে দেন। নিজের পরিবারস্থ লোক, আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশিগণের মধ্য থেকে বহু লোকের মনে উক্ত অনাথ শিশুর প্রতি মমতা জাগিয়ে দেয়া হয়। সে সমস্ত মমতা সমষ্টিগতভাবে এক হয়ে শিশুর পক্ষে মাতৃস্নেহ অপেক্ষা অধিক হয়ে যায়। ফলে কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, অনাথ শিশু পিতৃমাতৃবিশিষ্ট শিশু অপেক্ষা অধিক সুখে লালিত-পালিত হচ্ছে। ভেবে দেখ, আল্লাহ কেমন কৌশলে অনাথ শিশুর লালন-পালন করিয়ে নেন। যৌবনে আত্ম-প্রতিপালনেচ্ছা ও আত্ম সুখ-শান্তি লাভের বাসনা এসে মানুষকে কোন ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে দেয় এবং সেই ব্যবসাই বাহ্যতঃ মানুষের প্রতিপালনের উপায় হয়ে থাকে। নিজের প্রতি নিজের যত্নের সাথে অপরের যত্নের কোন তুলনাই হতে পারে না। কিন্তু উপার্জনক্ষম ও আত্ম-প্রতিপালনের তৎপর যুবক যখন আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংসার বৈরাগ্য ও পরহেযগারী অবলম্বন পূর্বক স্বীয় জীবিকা নির্বাহের উপায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করে প্রতিপালনের উপায় থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ সমাজের হাজার হাজার লোকের মনে তার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা উৎপন্ন করে দেন। ফলে সকলে তার প্রতিপালনে খোলা হাতে দান করতে আরম্ভ করে। দশের দান একত্র হয়ে তার নিজের একাকী উপার্জন অপেক্ষা অনেক বেশি হয়ে যায়। এই কৌশল উপর্জনহীন দরবেশ লোকের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা দয়াময় আল্লাহ করে দিয়ে থাকেন।

https://kitabbhubon.com

সাধক দরবেশগণের প্রতিপালনের ভার অপরে নিবে কেন ?

কেউ বলতে পারে অনাথ শিশু উপার্জনে অক্ষম বলে দশজনে তার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যারা বয়স্ক, উপার্জনের যথেষ্ট শক্তি আছে তাদের প্রতিপালনের ভার অপরে গ্রহণ করবে কেন ? আসল কথা এই যে, সুস্থ ও বলবান যুবা পুরুষ উপার্জনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তাক্কওয়া পরহেযগারীতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং প্রতি নিয়ত আল্লাহর এবাদতে ও অজ্ঞ লোকের হেদায়ৎ কার্যে মশগুল থাকে, কিংবা মসজিদের খেদমতে অথবা দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা প্রদানের রত থাকে এবং তজ্জন্য জীবিকা উপার্জনের অবসর পায় না, তার গ্রাসাচ্ছদনের ভার সমাজ নিজেদের ওপর গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয় না, বরং সকলের হৃদয়ে এই ভাবের উদর হয় যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সংসার বিরাগী হয়েছেন। ইনি আল্লাহর প্রিয় এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত বান্দা। আমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু তাঁকে প্রদান করা কর্তব্য, তাতে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্ম কর্মে শিথিল অথচ অলস ও নিষ্কর্মা বসে থেকে অপরের উপর নির্ভর করে তার প্রতি কারও মনে ভালবাসা বা সহানুভূতির উদর হয় না। সুতরাং তদ্রূপ ব্যক্তির পক্ষে উপার্জনের পন্থা পরিত্যাগ পূর্বক তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাজের মশগুল না হয়ে নিজের নফসের সুখ-শান্তি ও ভোগ বিলাসের মধ্যে লিপ্ত আছে, তখন তার নিজের জন্য নিজেই চিন্তা করা এবং চেষ্টা করা কর্তব্য। আল্লাহর কাজে রত ব্যক্তির পক্ষে লোকালয় ত্যাগ পূর্বক বিজন অরণ্যে বা পর্বতে কন্দরে চলে যাওয়া সঙ্গত নয় কিংবা শহরে থেকে জন সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকাও উচিত নয়। লোকালয় অবস্থান পূর্বক এবাদতে মশগুল থাকলে, সর্ব সাধারণের মনে আল্লাহ তাদের প্রতি ভক্তি ও ভালবসাা উৎপন্ন করে জনসমাজের দ্বারা তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে দিবেন। কোন আল্লাহওআলা লোক শহরে অবস্থান করে আল্লাহর কাজে আত্মোৎসর্গ করতঃ অনাহারে মারা গেছে এমন ঘটনা কখনও কেউ শ্রবণ করেনি।

https://kitabbhubon.com

বিশ্বরাজ্য প্রতিপালন ও ব্যাপক জীবিকা বন্টন ব্যাপারে বন্দোবস্ত কৌশল উপলব্ধি করলেই তাওয়াক্কুল আপনা আপনি এসে যায়

পরম দয়াময় আল্লাহ জড় জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের যাবতীয় কার্যাবলীকে কেমন আশ্চর্য কৌশলের সাথে পরিচালনা করে কেমন চমৎকার শৃঙ্খলা বিধান করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার সে চমৎকার বন্দোবস্ত কৌশল ও সুচারু শৃঙ্খলা বিধান উপলব্ধি করতে পারবে সে ব্যক্তি –

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا-

ভূপৃষ্টে বিচরণকারী সর্ববিধ প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহতা'আলার উপরই রয়েছে" মর্মার্থের বহিঃপ্রকাশ চাক্ষুষভাবে দেখতে ও বুঝতে পারবে। বিশ্বপালক আল্লাহ নিতান্ত দয়া ও কৌশলের সাথে সর্ববিধ জীবজন্তুর জীবিকা নির্বাহের উপকরণ ও আসবাব যুগিয়ে থাকেন। সে ব্যক্তি আরও বুঝতে পারবে যে, কেউ আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল করলেই তিনি তাকে বিনা পরিশ্রমে আকাশ থেকে প্রচুর খাদ্য সম্ভার ও বিচিত্র বেশ ভূষা এবং মনোহর যানবাহন প্রদান করেন না। যারা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে অবিরত তার এবাদতে নিমগ্ন থাকে। সাধারণতঃ তাদেরকে সপ্তাহান্তে শাক-পাতা শুষ্ক অন্ন প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট ধরনরে খাদ্য অবশ্যই মানব সমাজ কর্তৃক প্রদান করে থাকেন। তবে এদের মধ্যে কোন কোন আবেদকে যে তিনি উৎকৃষ্ট ধরনের জীবিকাও দিয়ে থাকেন তা অতি বিরল এবং স্বতন্ত্র। সপ্তাহকাল মধ্যে সামান্য জীবিকা প্রাপ্তির আশা পোষণ করা আল্লাহর বিশ্ব পালনের বিধানের অনুরূপ। তবে যারা সর্বদা সুখ ভোগে লোলুপ, বিলাস-বাসনের অভিলাষী, উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি অনুরক্ত তারা অবশ্য সেই সাধারণ বিধানে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকতে পারে না। ইত্যাকার ভোগাকাঙ্খা আল্লাহ প্রীতির লক্ষণ নয় বলে তা পুরণের জন্য কারও সাহায্য বা সহানুভূতির আশা করা যায় না; বরং বিনা পরিশ্রমে ভোগ বিলাস লাভ করার কোন উপায় নেই। অনেক ক্ষেত্রে পরিশ্রম করেও তা লাভ করা যায় না। আবার কোন কোন সময় বিনা পরিশ্রমেও আশাতীতরূপে সুখ ভোগের বস্তু অতর্কিতে এস

https://kitabbhubon.com

উপস্থিত হয়। কাজেই যাদের জ্ঞান চোখ খুলেছে তারা যত্ন ও চেষ্টাকে নিতান্ত অকর্মণ্য বলে বুঝতে পেরেছে। তারা কখনো তদবীর তথা উপাদান, উপকরণ এবং যত্ন ও চেষ্টার উপর নির্ভর করতে পারে না। তারা কেবল বিশ্ব প্রতিপালকের করুনার উপরই নির্ভর করে থাকে। আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি জগতের প্রতিপালনার্থে এমন কৌশলময় বন্দোবস্ত করে বলেছেন যে, কোন প্রাণীহি স্বীয় জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে ধ্বংস ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কৃচিৎক্রমে দু'একটা প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হলেও বুঝতে হবে যে, উক্ত বিনাশ এবং ধ্বংসের মধ্যেই তার মঙ্গল নিহিত রয়েছে। উপার্জন থেকে হস্ত সঙ্কুচিত করে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়েছে বলে ধ্বংস হয়নি। অর্থাৎ ধ্বংস ও বিনাশ যে কেবল উপার্জনহীন তাওয়াক্কুলধারী লোকের ভাগ্যেই জুটে নয়। কেননা যারা স্বকীয় বুদ্ধি, চতুরতা ও ক্ষমতা বলে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সম্পদ উপার্জন করেছে তেমন সাংসারিক লোকদেকেও সময় সময় ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হয়। অতএব বুঝতে হবে যে, উপার্জনহীনতা এবং জীবিকার উপকরণ ও আসবাবের অনুপস্থিতিই ধ্বংসের কারণ নয়, চোক্ষুষ্মান জ্ঞানী লোকের হৃদয়পটে এসমস্ত কথায় তাৎপর্য যখন সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে যায়, তখন তারা আল্লাহ কর্তৃক বিশ্বজগতের সর্বত্র জীবিকা বণ্টনের বিচিত্র কৌশল দেখে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল না করে থাকতে পারে না এবং তাঁদের হৃদয়ে প্রচুর বল ও আত্ম-বিশ্বাস উৎপন্ন না হয়ে যায় না। এ কারণেই হযরত হাছান বছরী (রহঃ) বলেছেন– 'বছরা নগরীর সমস্ত অধিবাসী যদি আমার পোষ্যবর্গ হয় এক একটা গমের বীজ যদি এক দীনার মূল্যে বিক্রি হয়, তথাপি আমি তাদের প্রতিপালনের একটু ভীত এবং পশ্চাৎপদ হব না।

আর এ কারণেই হযরত ওহ্হাব ইবনুল-ওয়ার্দ বলেছিলেন–"যদি আকাশ লৌহ নির্মিত হত (তথা থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষিত না হত) এবং জমিন কাঁসার পাত হত, (তথায় কোন প্রকার উদ্ভিদই উৎপন্ন না হত) তখনও আমি জীবিকা প্রাপ্তির উপায় না দেখে যদি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতাম, তবে আমি মুশরিক হয়ে যাওয়ার ভয় করতাম। কেননা প্রকৃতপক্ষে জীবের জীবিকা সম্বন্ধে এ সমস্ত আসবাবের কোনই দখল নেই। মহা কোশলী আল্লাহ্ উচ্চ আসমানের উপর জীবিকার ভার দিয়ে রেখেছেন– যাতে লোকে উপলব্ধি করতে পারে যে, তা মানব ক্ষমতার অতীত।

https://kitabbhubon.com

কতিপয় লোক হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল– 'হযরত! আমরা স্ব-স্ব জীবিকা অন্বেষণ করে নিব কি ? তিনি বললেন– 'যদি জানতে পেরে থাক যে, জীবিকা কোথায় আছে, তবে অন্বেষণ করতে পার।' আবার তারা বলল– 'তবে কি আল্লাহর সমীপে জীবিকার জন্য প্রার্থনা জানাব ? তিনি উত্তর করলেন– 'হাঁ, যদি বুঝে থাক যে, তিনি তোমাদেরকে ভুলে গেছেন, তবে প্রার্থনা তাঁকে স্মরণ করে দিতে পার।' পরিশেষে তারা বলল– 'তবে কি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করব যে, তিনি কি করেন ?" হযরত জুনাইদ (রহঃ) বললেন, 'পরীক্ষামূলক ভাবে তাওয়াক্কুল করলে সন্দেহ করা হয়। তখন তারা বলল– তবে আমরা জীবিকার জন্য কি তদবীর করব ? তিনি বললেন– 'তদবীর থেকে হস্ত সঙ্কুচিত করাই তাওক্কুল লাভের জন্য একমাত্র তদবীর।' ফল কথা এই যে, জীবিকার ব্যাপারে জীবিকা-দাতার দায়িত্বই যথেষ্ট। যার জীবিকার প্রয়োজন, তার কর্তব্য একমাত্র আল্লাহতা'আলার নিকট প্রত্যাশী হওয়া।

সঞ্চয়ে তাওয়াক্কুল অবলম্বনের প্রণালী ঃ সঞ্চয় অর্থ উপার্জিত বস্তু (কিয়দাংশ) সংরক্ষণ। প্রিয় পাঠক! অবগত হও, যে ব্যক্তি এক বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখে, সে তাওয়াক্কুলের স্তর থেকে বহিঃস্কৃত হয়ে যায়। এর কারণ এই যে, সে ব্যক্তি অদৃশ্যও প্রকৃত কারণের পরিত্যাগ করে বাহ্য কারণের উপর ভরসা করেছে। অর্থাৎ যে খাদ্যদ্রব্যগুলোকেই সারা বছরের জীবিকা নির্বাহের কারণ বলে মনে বিশ্বাস করে নিয়েছে। অতএব আল্লাহই যে জীবিকার একমাত্র মূল কারণ তা সে বুঝতে পারে নি। নির্দিষ্ট কাল পরে বছর ঘুরে আসে। প্রত্যেক বছরই যদি খাদ্য দ্রব্যের উপর নির্ভর হয়, তবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কখন হবে ? যে ব্যক্তির ক্ষুধার সময় উদর পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ খাদ্য এবং শরীর ঢাকবার প্রয়োজন হলে তখন সে পরিমাণ বস্ত্রখন্ডে পরিতুষ্ট থাকতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য কোনই চিন্তা করেন না, তার তাওক্কুল পূর্ণ হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

https://kitabbhubon.com

পরিবারবিহীন একাকী লোকের সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল

একাকী লোক ৪০ (চল্লিশ) দিনের খরচের উপযোগী খাদ্য সঞ্চয় করে রাখলে তার তাওয়াক্কুল বিনষ্ট হবে কি না এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হযরত ইব্রাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেছেন– তার তাওয়াক্কুল বিনষ্ট হবে না। কিন্তু তদক্ষেপা অধিক কালের জন্য সঞ্চয় করলে তাওয়াক্কুল রইল না।' হযরত সাহাল তাস্তারী (রহঃ) বলেন, 'যে পরিমানই হোক না কেন সঞ্চয় করে রাখলেই তাওয়াক্কুল বিনষ্ট হবে। হযরত আবু তালেব মক্কী বলেছেন– 'চল্লিশ দিনের অধিক সময়ের জন্য সঞ্চয় করেও যদি সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা না রেখে, তবে তার তাওয়াক্কুল নষ্ট হবে না।' হযরত হোছাইন মাগাযেনী (রহঃ) হযরত বেশর হাফী রাহেমাহুল্লাহর মুরিদ ছিলেন, তিনি বলেছেন– 'একদিন জনৈক অর্ধ বয়স্ক লোক আমার পীর হযরত বেশর হাফীর (রহঃ) সমীপে আগমন করলেন। পীর ছাহেব কেবলা এক মুষ্টি রৌপ্য মুদ্রা আমার হস্তে প্রদান পূর্বক আদেশ করলেন– এর দ্বারা বাজার থেকে অতি উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য ক্রয় করে আন।' অথচ ইতোপূর্বে উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য সংগ্রহের আদেশ আমি তাঁর মুখে কখনো শ্রবন করেনি। যা হোক, আদেশানুযায়ী আমি উত্তম খাদ্য ক্রয় করে এনে তাঁর সম্মুখে দস্তর খানের উপর রাখলাম। তিনি উক্ত আগন্তুক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে আহারে প্রবৃত্ত হলেন। ইতোপূর্বে আমি তাঁকে কোন সময় অন্যের সাথে একত্রে আহার করতেও দেখিনি। তাঁরা আহার সমাপ্ত করলে দেখা গেল, তন্মধ্যে বহু খাদ্য দ্রব্য উদ্ধৃত্ত রয়েছে। আগন্তুক ব্যক্তি তা পুটলি বেঁধে নিয়ে প্রস্থান করলেন। বিনা অনুমতি গ্রহণে সে ব্যক্তিকে এমন কাজ করতে দেখে আমি বিস্ময় বোধ করলাম। হযরত বেশরহাফী (রহঃ) বললেন– 'তুমি বিস্মিত হলে ?' আমি উত্তর করলাম হাঁ ! ইনি কে এসেছিলেন এবং এরূপ কেন করলেন ? তিনি বললে– 'আগন্তুকের নাম ফতেহমুসেলী। অদ্য তিনি মুসেল শহর থেকে আমার সাথে সাক্ষাৎ মানসে এখানে এসেছিলেন। আর তিনি তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্যই অবশিষ্ট খাদ্যগুলো পুটলি বেঁধে নিয়ে গেলেন। তাঁর কার্য দ্বারা তিনি

https://kitabbhubon.com

আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল পূর্ণ ও দৃঢ় হয়ে গেলে খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখলেও ক্ষতি নেই।' যা হোক, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আশাকে সংক্ষিপ্ত করাই তাওয়াক্কুলের মূল বস্তু। এর সাধারণ পন্থা এই যে, নিজের জন্য আদৌ সঞ্চয় করা সঙ্গত নয়। সঞ্চয় করলেও তা নিজের ধন মনে না করে আল্লাহর ধন বলে জ্ঞান করবে এবং সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা না করে কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। এ প্রণালীতে সঞ্চয় করলে তাওয়াক্কুলের কোনই ক্ষতি হয় না। এ পর্যন্ত যা কিছু বর্ণিত হল তা পরিবার বিহীন একাকী লোকের তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে প্রতিপাল্য নিয়ম।

পরিবার বিশিষ্ট লোকের সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল

পরিবার পোষ্যবর্গ বিশিষ্ট লোক এক বছরের খাদ্য সংগ্রহ করে সঞ্চিত রাখলেও তাতে তাওয়াক্কুল নষ্ট হবে না। কিন্তু এক বছরের অধিক সময়ের জন্য সঞ্চয় করলে অবশ্যই তাওয়াক্কুল নষ্ট হবে। হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো স্বীয় পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে দিতেন। তদ্রূপ সঞ্চয় কেবল তিনি পরিবারবর্গের জন্যই করতেন। কেননা পরিবারবর্গের অন্তর তাঁর অপেক্ষা অনেক দুর্বল ছিল। তিনি অবশ্য নিজের জন্য সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থাই কোন দিন করেননি। তিনি সন্ধ্যাকালের খাদ্যও প্রাতঃকাল সংগ্রহ করে রাখতেন না। যখন যা সংগৃহীত হত খেয়ে এবং বিতরণ করে সে বেলায়ই তা নিঃশেষ করে দিতেন। পরবর্তী বেলার জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। অথচ তাঁর মানসিক অবস্থা তথা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল এত প্রবল ছিল যে, সঞ্চয় করলেও তাঁর তাওয়াক্কুল কিছুমাত্র ক্ষতি হত না। কেননা পার্থিব সম্পদের প্রতি তিনি এতই অনাসক্ত ছিলেন যে, সঞ্চিত দ্রব্যকে নিজের হাতে থাকা আর পরের হাতে থাকাকে তিনি সমান মনে করতেন। নিজের দ্রব্য ভেবে একটুও আসক্ত হতেন না। তবে জনসাধারণকে তাদের হৃদয়ের দুর্বলতার তারতম্যানুসারে সঞ্চয়ের জন্য উপদেশ দিতেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, আহলে ছুফ্ফাহ অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভর

https://kitabbhubon.com

করে মসজিদে নববীর মধ্যে অবস্থানকারী সংসারবিরাগী ছাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন ছাহাবীর ইন্তেকাল হলে লোকে অনুসন্ধান করে তাঁর বস্ত্রের ভিতরে দুটি স্বর্ণ মুদ্রা পেয়েছিল। তা দেখে হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'তার শরীরে দুটি দাগ হবে।' এই দাগ হওয়ার দু'প্রকারের সম্ভাবনা আছে। হয়ত মৃত ব্যক্তির প্রকৃতপক্ষে পরিবার বিশিষ্ট লোক ছিল কিন্তু ধোকাবাজি করে নিজকে সংসার বিরাগীরূপে প্রকাশ করত এবং গোপনে গোপনে পরিবারের জন্য সঞ্চয় করত। এই ধোকাবাজির শাস্তি স্বরূপ পরলোকে দু'দীনারের পরিবর্তে তার দুটি দাগ কিংবা সে কোন ধোকাবাজি করেনি। কিন্তু সঞ্চয় করার কারণে তার পারলৌকিক মর্যাদা কমে গেছে। যেমন- মানুষের মুখমন্ডলের উপর দাগ হলে মুখশ্রী হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তদ্রূপ সঞ্চয়ের কারণে এই লোকটির উজ্জল মর্যাদার দীপ্তিমান আলো নিঃস্প্রব হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে আর একজন সংসার বিরাগী তাওয়াক্কুলকারী ছাহাবার মৃত্যুর পর হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন– পরলোকে এর মুখমন্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। কিন্তু যদি তার স্বভাবের মধ্যে একটা ত্রুটি না থাকত, তবে সূর্যের ন্যায় প্রখর দীপ্তিমান হত। সে অভ্যাসটি এই যে, সেই ছাহাবী এক শীতের বস্ত্র অন্য শীতের জন্য রেখে দিতেন এবং এক গ্রীষ্মকালের বস্ত্র অন্য গ্রীষ্মকালের জন্য উঠিয়ে রাখতেন। হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে আরও বলেছেন– 'আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং ধৈর্য্য এ দুটি গুণ অন্যান্য গুণ অপেক্ষা তোমরা অনেক কম পেয়েছ। এক মৌসুমের পরিচ্ছদ অপর মৌসুমের জন্য সঞ্চয় করে রাখার একমাত্র কারণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর কম হওয়া। কিন্তু দস্তরখান, কলসী, লোটা ও পেয়ালা প্রভৃতি যে সমস্ত তৈজস-পত্র বা ভান্ডবাসন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, তৎসমুদয় সঞ্চিত রাখাতে বিশ্বাস বা তাওয়াক্কুলের হানি হয় না। এর কারণ এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে রুটি, অন্ন ও বস্ত্রের উপকরণ প্রতি বছর উৎপন্ন হয়ে থাকে। এমন কি, কোন কোন বস্তু প্রতি ঋতুতেও জন্মিয়ে থাকে এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনানুযায়ী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে কোন কোন স্থানে দুর্লভ হলে, বিভিন্ন দেশের লোক

https://kitabbhubon.com

সমাগমে একস্থানে বসে অন্য স্থানের দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঘটি, বাটি, কলসী, পেয়ালা প্রভৃতি তৈজস-পত্রাদি প্রত্যেক সময়ে উৎপন্ন হয় না কিংবা প্রয়োজন মত অন্য স্থান থেকেও পাওয়া যায় না। অথচ অন্ন-বস্ত্রের ন্যায় এগুলোও নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য; সুতরাং আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মে যা প্রয়োজন মত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ এবং যা দুর্লভ তা সঞ্চয় রাখা সঙ্গত। এ জন্য নির্জনে অরণ্যে বালতি, দড়ি, নরুন, সূঁচ ইত্যাদি সাথে রাখা আবশ্যক। কিন্তু গ্রীষ্মের মৌসুমে ব্যবহার্য বস্ত্রাদি শীতের মৌসুমে কাজে লাগে না। এ জন্য তা অন্য গ্রীষ্মকালের জন্য রেখে দেয়া দুর্বল ঈমান ও ক্ষণভঙ্গুর বিশ্বাসের লক্ষণ।

প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, যদি কোন ব্যক্তির মনোভাব এরূপ হয় যে, সঞ্চয় করে না রাখলে মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে ইতস্ততঃ ছুটা ছুটি আরম্ভ করে দেয় এবং জীবিকার জন্য অপরের প্রত্যাশী হতে হয়, এমন ব্যক্তির জন্য কিছু সঞ্চয় রাখাই উত্তম। আবশ্যকীয় পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি না রাখলে যাদের মন উদ্বিগ্ন থাকে, এবাদতে ও যিকির ফেকেরে মন বসে না তাদের পক্ষে সেই পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি অধিকারে রাখাই উত্তম। কেননা পার্থিব ও পারলৌকিক সর্ববিধ কার্যে মনের শান্তি নিরবচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। মন প্রশান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকলে এবাদতে ও যিকির ফিকেরে একনিষ্ঠভাবে ডুবে থাকতে পারা যায়। জীবিকা নির্বাহের উপকরণ হস্তগত থাকলে উদ্বেগ দূরীভূত হয়ে মন প্রশান্ত থাক্‌তে পারে বটে; কিন্তু কোন কোন লোকের মন এমনও আছে যে, অতিরিক্ত ধন সম্পদ হস্তগত হলে তারা আল্লাহকে ভুলে যায়; পক্ষান্তরে অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করলে অন্তরে শান্তি পায় এবং নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে। এই শ্রেণীর মন অতীব প্রশান্ত ও উচ্চ। তাদের পক্ষে ধন সম্পদ সঞ্চয় না করাই উত্তম। আবার কতকগুলো লোক আছে আবশ্যক পরিমাণ ধন সম্পদ হস্তগত না থাকলে তাদের মন প্রশান্ত থাকে না। চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে এবাদতে বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে, তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভূসম্পত্তি রাখাই উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু যারা পার্থিব শোভা, জাঁকজমক ও আড়ম্বর বৃদ্ধির আকাঙ্খী, তদভাবে মনে শান্তি ও আরাম পায় না, এদের মন ধার্মিক মনের সমশ্রেণীর মন নয়, এদের অবস্থা বড় জঘন্য।

https://kitabbhubon.com

৩. আগামী বিপদ প্রতিষেধক কার্যে তাওয়াক্কুল ঃ মানব জীবনে যে সমস্ত বিপদ ঘটা অবধারিত কিংবা প্রায়শ ঘটে থাকে, পূর্বাহ্নেই তাতে বাধা প্রদান করে ঘটতে না দিলে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হয় না। তাওয়াক্কুলকারী লোক যদি এই ভয়ে নিজ গৃহের দরজা তালা বদ্ধ করে রাখে যে, খোলা থাকলে চোর ঢুকে তন্মধ্যস্থ মাল-আসবাব চুরি করে নিতে পারে, তবে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হবে না। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে অস্ত্র ব্যবহারে আত্মরক্ষা করলেও তাওয়াক্কুল নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে শীতবস্ত্র ব্যবহার পূর্বক শীতের প্রকোপ থেকে প্রাণ রক্ষা করলেও তাওয়াক্কুলের হানি হবে না। কিন্তু যদি আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করে শীতের আক্রমন এড়াবার উদ্দেশ্যে পেট ভরে গুরু ভোজন করে নেয়, তবে তাতে দাগ ও মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহারের ন্যায় তাওয়াক্কুল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। কেননা তদ্রূপ সূক্ষ্ম উপায় অবলম্বনে উপকার না হয়ে বরং বিপরীত ফল ফলবার আশঙ্কা রয়েছে কিন্তু যে সমস্ত আসবাব মূলত বিপদের কারণ নয়; তবে প্রকাশ্যত বিপদের কারণ বলে বুঝা যায়, বিপদ আসবার পূর্বে সে সমস্ত আসবাব থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলে তাওয়াক্কুল থাকে না। হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে জনৈক বেদুঈন এসে উপস্থিত হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি তোমার আরোহনের উষ্ট্র কি করলে ?" সে উত্তর করল– 'ইয়া রছূলাল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তা ত্যাগ করেছি।' হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'তাকে বাঁধ এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।' কিন্তু মানুষের তরফ থেকে কোন বিপদ আসলে তার কোন প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত না হয়ে ধৈর্য সহকারে সহ্য করে যাওয়া এক প্রকারের তাওয়াক্কুল বটে। এই মর্মে আল্লাহতা'আলা বলেছন–

وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

'আর তাদের কষ্ট প্রদান্তে প্রতিবিধান ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। (পারা ২২: সূরা আহযাক , রুকু ৬) আল্লাহতা'আলা আরও বলেছেন–

https://kitabbhubon.com

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

'আর আমরা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ছবর করতে থাকব সে সমস্ত দুঃখ-কষ্টে যা তোমরা আমাদেরকে প্রদান করতেছে এবং আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুলকারিগণের তাওয়াক্কুল করা উচিত। (পারা ১৩; সূরা ইবরাহীম রুকু ২)

মানুষ ব্যতীত অপর কোন হিংস্র প্রাণী যথা– সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি থেকে যে বিপদ আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে তদ্রূপ বিপদ আগমনের পূর্বাহ্নেই তা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

যা হোক শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারন করলে, সেক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল রক্ষার উপায় এই যে, নিজের বাহুবল এবং অস্ত্রের উপর ভরসা না করে আল্লাহরতা'আলার উপর ভরসা করবে।

গৃহ-সামগ্রী অপহরণের ব্যাপারে গৃহস্বামীর কর্তব্য ও তাওয়াক্কুল

গৃহদ্বারে তালা লাগিয়ে তার দৃঢ়তার উপর নির্ভর না করে একমাত্র সর্বরক্ষক আল্লাহর উপর ভরসা রাখা কর্তব্য। কেননা অনেক তালাই চোরের কৌশল থেকে নিস্তার পায় না। তাওয়াক্কুলের লক্ষণ এই যে, তালাবদ্ধ গৃহে গিয়ে দেখতে পায় যে, চোর ঘরে ঢুকে গৃহের দ্রব্যাদি চুরি করে নিয়েছে। এতে দুঃখিত না হয়ে আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তালাবদ্ধ করে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় মনে মনে এরূপ বলা কর্তব্য যে, হে খোদা! তোমার ইচ্ছা ও বিধান পাল্টাবার মানসে আমি গৃহদ্বারে তালা লাগাইনি। কেবল তোমারই নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করছি মাত্র তুমি যদি এ মাল উঠিয়ে নেয়ার জন্য কাউকে ক্ষমতা প্রদান করে থাক, তবে আমি তোমার বিধানে সম্মত আছি। কেননা আমার জানা নেই, তুমি এ মাল আমারই জীবিকার জন্য সৃষ্টি করেছ না অন্য কারও জীবিকার জন্য সৃষ্টি করে আমার জিম্মায় রেখেছে। গৃহের দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে যাওয়ার পর পুনরায় গৃহে ফিরে যদি দেখতে পায় যে, গৃহের দ্রব্যাদি চুরি হয়ে গিয়েছে তখন যদি তজ্জন্য তার মনে দুঃখ

https://kitabbhubon.com

হয়, তবে বুঝতে হবে, তার তাওয়াক্কুল সঠিক ছিল না। গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় তার মনে তাওয়াক্কুলের যে ভাবটুকু উদিত হয়েছিল– তা তার মনের ধোঁকা ছিল, প্রকৃত তাওয়াক্কুল ছিল না। কিন্তু যদি সে অপহৃত দ্রব্যের জন্য দুঃখ বা শোক না করে বা চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে নীরব থাকে, তবে অন্তত পক্ষে এমতাবস্থায়ও ছবরের ছওয়াব লাভ করবে। আর যদি সে চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ইচ্ছায় নিয়ে চোরের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হয়, তবে ছবরের শ্রেণী থেকেও বহিস্কৃত হল। তখন তাকে বুঝতে হবে যে, মাল অপহৃত হয়েছে দেখে আমার অন্তরে দুঃখ ও শোক আসার কারণে আমার তাওয়াক্কুলের দাবী বিনষ্ট হল এবং চোরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণে ছবর বিনষ্ট হল। অতএব এখন তাওয়াক্কুলকারীদের শ্রেণীতেও আমার স্থান নেই, ছবরকারীদের দলেও আমার স্থান নেই। কাজেই তাওয়াক্কুল ও ছবরের দাবী করা আর আমার পক্ষে শোভা পায় না। যা হোক, এরূপ ক্ষেত্রে চোরের সাহায্যে তার এতটুকু উপকার হল যে, সে তার ভ্রান্ত দাবীর অসারতা বুঝতে পারল।

প্রশ্ন- গৃহস্বামী ধনের মুখাপেক্ষী বা অভাবগ্রস্ত বলেই ধন সঞ্চয় পূর্বক গৃহে রেখে তার নিরাপত্তার জন্য গৃহদ্বারে তালা লাগিয়ে মালের হেফাযত করেছিল, এমতাবস্থায় গৃহদ্বার খুলে মাল অপহৃত হয়েছে দেখতে পেয়ে সে দুঃখিত ও শোকাতুর না হয়ে কেমন করে থাকতে পারে ?

উত্তর– মানুষের পক্ষে এরূপ বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, আল্লাহ্ মানুষের সম্বন্ধে যা কিছু করেন তার মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। কোন কার্যে মানুষের মঙ্গল হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। ধন-সম্পদ হাতে থাকা যতদিন মানুষের জন্য হিতকর হয় ততদিন আল্লাহ মানুষকে ধন সম্পদ প্রদান করে থাকেন। আবার যখন ধন-সম্পদ হাতে না থাকা মানুষের জন্য হিতকার মনে করেন, তখন তার ধন তুলে নিয়ে যান। গৃহস্বামীও নিজের মাল অপহৃত হয়েছে দেখে এরূপ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল করে নিতে পারে যে, আমার হাতে ধন সম্পদ বিদ্যমান থাকা যতদিন আল্লাহ্ আমার জন্য মঙ্গলজনক মনে করেছেন, ততদিন তিনি ধন আমার হাতে রেখেছেন। আবার যখন মনে করেছেন যে, এখন আমার হাতে ধন বিদ্যমান থাকা আমার পক্ষে ক্ষতিকর তখনই তিনি আমার হাত থেকে তা তুলে নিয়ে আর একজনের হাতে স্থাপন করেছেন।

https://kitabbhubon.com

এরূপ বিশ্বাস মনে দৃঢ় করে নিতে পারলে ধন থাকা বা অপহৃত হওয়া উভয় অবস্থাতেই তার মনের প্রফুল্লতা সমভাবে থাকতে পারে। কোন অবস্থাতেই তার মনে দুঃখ কষ্ট স্থান পেতে পারে না।

মনে কর, একটি পীড়িত বালকের স্নেহময় পিতা স্বয়ং একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক। তিনি নিজেই স্বীয় পুত্রের চিকিৎসার ভার নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় পিতা হিতকর মনে করে যদি পীড়িত পুত্রকে গোস্ত ভক্ষণ করতে দেন তাতে বালকটিও এ ভেবে সন্তুষ্ট হবে যে, গোস্ত ভক্ষণে আমার শরীরের উন্নতি হবে মনে করেই আমার দয়ালু পিতা আমাকে গোস্ত ভক্ষণ করতে দিয়েছেন, অন্যথায় কিছুতেই দিতেন না। রোগের অবস্থা দৃষ্টে যদি পিতা মনে করেন যে, গোস্ত খাওয়া বালকের পক্ষে অহিতকর হবে, তখন বালককে গোস্ত ভক্ষন করতে দেখলে তৎক্ষনাৎ তিনি তা বালকের হাত থেকে কেড়ে নেন। বালক তখন গোস্ত ভক্ষন করতে না পেয়ে বিন্দু মাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং পিতার প্রতি সন্তুষ্টই থাকে। কেননা সে বুঝতে পারে গোস্ত আমার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর না হলে স্নেহময় পিতা কখনও আমার হাত থেকে গোস্ত কেড়ে নিতেন না।' মানুষের মনেও যে পর্যন্ত এ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে উৎপন্ন না হবে যে, আল্লাহ আমাদের জন্য যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন, সে পর্যন্ত মানুষের মনে তাওয়াক্কুল উৎপন্ন হতে পারে না। আল্লাহর প্রতি এরূপ বিশ্বাস দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াক্কুলের দাবী করা বাতুলতা মাত্র।

গৃহ-সামগ্রী অপহৃত তাওয়াক্কুলকারীর প্রতিপাল্য ছয়টি

প্রিয় পাঠক! জেনে রেখ, গৃহ-সামগ্রী অপহৃত হলে তাওয়াক্কুলকারীকে নিম্নোক্ত ছয়টি নিয়ম প্রতিপালন করতে হয়। এক– ধনের নিরাপত্তার জন্য গৃহ দ্বারে তালা লাগিয়ে রাখা উচিত বটে। কিন্তু বহু শিকল কিংবা অনেকগুলো তালা লাগাতে বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয়। তালা লাগিয়ে আবার প্রতিবেশীগণকে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করাও উচিত নয়: বরং সহজ ও সাধারণ ভাবে গৃহদ্বার বন্ধ করে কেবল আল্লাহতা'আলার হেফাযতের প্রতি নির্ভর রাখা কর্তব্য। হযরত মালেক ইবনে-দীনার রাহেমাহুল্লাহ সাধারণ এক খন্ড রশি দ্বারা স্বীয় গৃহদ্বারা বন্ধ করে বলতেন– 'যদি কুকুরের ভয় না থাকত, তবে আমি রশি দ্বারাও বন্ধ করতাম না।'

https://kitabbhubon.com

দুই- যে প্রকারের দ্রব্য গৃহে রাখলে নিশ্চিতরূপে জানা আছে যে, এর লোভে চোর অবশ্যই গৃহে প্রবেশ করবে তদ্রূপ দ্রব্য গৃহে রাখবে না। সে প্রকার দ্রব্য গৃহে রাখলে চোরকে চুরি করতে উৎসাহিত করা হয়।

আমীর মুগীরা একদিন হযরত মালেক ইবনে-দীনারের নিকট কিছু যাকাতের মাল প্রেরণ করেন। হযরত মালেক ইবনে-দীনার কিছুক্ষণ পরেই উক্ত মাল মুগীরার নিকট ফেরত পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, 'তোমার মাল তোমার কাছেই থাক। শয়তান আমার মনে কুমন্ত্রনা জাগিয়ে দিচ্ছে যে, এই মাল গৃহে থাকলে চোরে নিয়ে যাবে। আমি ইচ্ছা করি না যে, আমার মনে সন্দেহ থাকুক এবং এও চাই না যে, আমার গৃহ থেকে মাল চুরি করে কেউ পাপে নিমগ্ন হোক।' হযরত আবু ছুলাইমান দারানী এ সংবাদ শ্রবন করে বলেছিলেন- 'তা ছুফীদিগের মনের দুর্বলতা মাত্র। মালেক ইবনে দীনার তো সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিরাগীই রয়েছেন। তাঁর মাল গৃহে রইল কি চোরে নিল তাতে তাঁর কি ? ধনের আকর্ষণ তো তাঁর মনের ত্রিসীমায়ই ঘেষতে পারে না, তবে এরূপ সতর্কতা তাঁর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের লক্ষণ।'

তিন- গৃহ থেকে বাইরে যাবার কালে এরূপ নিয়ত রাখবে যে, আমার দ্রব্য চোরে চুরি করে নিল তার যেন মঙ্গল হয়। অপহৃত দ্রব্যে আমার কোন দাবী নেই। চোরের জন্য তা হালাল ও মুবাহ করে দিলাম। তাতে ফল এই হবে যে, হয়তো চোর অভাবগ্রস্ত, দারুন অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, অপহৃত দ্রব্য দ্বারা তার অভাব পূরণ হবে। আর যদি চোর ধনবান হয়ে থাকে, তবে হয়ত আজ আমার মাল চুরি করার কারণে অন্য কোন মুছলমান ভ্রাতার মাল চুরি করার সুযোগ পেল না। তাতে সেই মুছলমান ভাইয়ের মাল রক্ষা পেল। তিনি সেই মাল অপর একজন অভাবগ্রস্ত মুছলমান ভ্রাতাকে দান করতে পারবেন। এতে তিন প্রকারের মঙ্গল হবে। ১. চোরের অভাব বিদূরিত হবে, ২. আমার কৃপণতা দোষ দূরীভূত হয়ে হৃদয় পবিত্র হবে। ৩. অপর একজন মুছলমান ভ্রাতার ধন রক্ষা পেয়ে আর একজন দরিদ্র মুছলমানের কাজে লাগবে। অথচ আমার দ্রব্যগুলো চুরি না হয়ে গৃহে আবদ্ধ থাকলে এতগুলো মঙ্গল থেকে আমি বঞ্চিত থাকব। অপর মুছলমান লোকও অভাবে কষ্ট পাবে। আর এও জেনে রাখবে যে, এরূপ নিয়ৎ করলে চোরে নিশ্চয়ই চুরি করবে তা অবধারিত নয়। চুরি করতেও

https://kitabbhubon.com

পারে, নাও পারে। তার এরূপ নিয়তের কারণে আল্লাহতা'আলার অভিপ্রায়ের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। তার ধন অপহৃত হওয়া আল্লাহতা'আলার অভিপ্রায় হলে চুরি হবেই। তাঁর অভিপ্রায় না হলে কখনই চুরি হবে না। কিন্তু তাঁর মাল চুরি হোক আর না-ই হোক উভয় অবস্থাতেই সে ছদকার ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ এক পয়সার পরিবর্তে সাতশ পয়সার ছওয়াব পাবে। কেননা তার কর্তব্য ছিল নিয়ত দুরস্ত করা, তা সে করেছে। তজ্জন্য সে অবশ্যই ছওয়াব লাভ করবে। চুরি হওয়া বা না হওয়া আল্লাহতা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়ে থাকে, কাজেই চুরি হোক বা না হোক উভয় অবস্থায়ই তার ছওয়াবের কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। গৃহস্বামী ঘর থেকে বের হবার সময় ছদকার নিয়ত করেছিল, অর্থাৎ মাল চুরি হলে চোর যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তার জন্য ছদকা, আর চোর ধনী হলে অন্য মুছলমান ভাইয়ের মাল রক্ষা পেয়ে তা আর একজন দরিদ্র মুছলমান ভাইয়ের জন্য ছদকা। অতএব আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে তার মাল চুরি না হলেও উক্ত নিয়তের কারণে গৃহস্বামী ছদকার ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে– স্ত্রী সহবাস কালে যে ব্যক্তি স্বীয় শুক্র বাইরে নিপতিত না করে একটি সু-সন্তান লাভের নিয়তে স্ত্রী গর্ভে নিপতিত করে, তবে সে শুক্রে কোন সন্তান না জন্মিলেও সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তের দরুন তার আমলনামায় এমন একজন সু-সন্তানের ছওয়াব লিখিত হবে, যে সন্তান বড় হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে কাফেরদের হাতে শহীদ হয়ে যায়। এরূপ ছাওয়াব পাবার কারণ এই যে, যতটুকু কর্তব্য কার্য করার ভার লোকটির উপর ছিল তা সে পুরোপুরি পালন করেছে। সন্তান জন্মিলেও তাকে সৃষ্টি করা এবং জীবিত রাখা তার আয়ত্তে ছিল না। যার কারণে ছওয়াব প্রাপ্তি বা আযাব ভোগ করতে হলে তার কার্যের প্রয়োজন পড়ত। অতএব ছওয়াব প্রাপ্তির জন্য তার নিয়তই যথেষ্ট তা সে করেছে।

চার- ধন অপহৃত হয়ে গেলে দুঃখিত ও শোকাতুর হওয়া উচিত নয়; বরং এরূপ বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, ধন চোর কর্তৃক অপহৃত হওয়ার মাধ্যমেই আমার মঙ্গল ছিল। চুরি হয়ে গেলে যদি গৃহস্বামী বলে ফেলে যে, 'তা আমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করলাম, তবে আর সে অপহৃত ধনের অনুসন্ধান করা উচিত নয়। এমনকি, চোর উক্ত দ্রব্য ফিরিয়ে দিতে

https://kitabbhubon.com

চাইলেও তা গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি গ্রহণ করে, তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা তা তারই ধন। শুধু মনে মনে নিয়ত করার কারণে সেই মালে তার আধিপত্য নষ্ট হয় নি, কিন্তু ফিরিয়ে নেয়া তাওয়াক্কুল ব্যাপারে ভাল কথা নয়। একদা হযরত ইবনে-ওমর (রাঃ)-এর একটি উষ্ট্র চুরি হয়ে যায়। তিনি তা অনুসন্ধান করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বললেন– 'আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।" এ বলে তিনি মসজিদে প্রবেশ পূর্বক নামাযে মশগুল হলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল– "আপনার উটটি অমুক স্থানে দেখে এসেছি।" তৎক্ষণাৎ তিনি উটের তালাশে যাওয়ার ইচ্ছায় এক পা জুতোর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, এমন সময় তাঁর মনে হল তিনি উটটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে ফেলেছেন। একথা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি আস্তাগফিরুল্লাহ বলে বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন– 'আমি যখন 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলে ফেলেছি তখন আর তার নিকটেও যাব না।'

কোন এক বুযুর্গ লোক বলেছিলেন– "আমি স্বপ্নযোগে একজন মুছলমান ভ্রাতাকে বেহেশতের মধ্যে বিষন্ন বদনে বসে থাকতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন– 'আমার সেই দুঃখ এত ভীষণ যে, তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকবে। কেননা ইল্লিইয়ীন নামক বেহেশতে এমন বহু উন্নত স্থান আমাকে দেখান হয়েছে সমগ্র বেহেশতে যার তুলনা নেই। আমি আনন্দিত হয়ে সে সমস্ত উন্নত স্থানের দিকে অগ্রসর হলে অদৃশ্য হতে শব্দ আসল, 'এই ব্যক্তিকে এখান থেকে দূর করে দাও। 'ইল্লিইয়ীন' বেহেশতের উন্নত স্থানসমূহ কেবল ঐ সকল লোকের জন্যই নির্ধারিত যারা আল্লাহর রাস্তা জারী রেখেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাস্তা জারী রাখার অর্থ কি ? উত্তর আসল, তুমি একদিন বলেছিল-'আমি অমুক বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। কিন্তু পরে তুমি তোমার সে বাক্য পূর্ণ করনি। তুমি যদি তোমার সে বাক্য পূর্ণ করতে তবে এই সমুদয় উন্নত স্থানই তোমাকে প্রদান করা হত।'

এক ব্যক্তি মক্কা-মআযযমায় বাইতুল্লাহ শরীফের পার্শ্বে নিদ্রা গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেল তার টাকা পূর্ণ থলিটি অপহৃত হয়ে গিয়েছে। তার পার্শ্বেই একজন আবেদ লোক উপবিষ্ট ছিলেন, টাকার মালিক সেই আবেদ লোকটিকেই টাকা অপহরণ

https://kitabbhubon.com

করেছেন বলে দোষারোপ করল। আবেদ ব্যক্তি টাকার মালিককে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- 'তোমার থলিতে কত টাকা ছিল ? সে ব্যক্তি যত টাকা বলল, আবেদ তাকে তত টাকাই দিয়ে দিলেন। সে ব্যক্তি টাকা নিয়ে বাইরে এসে শুনতে পেল যে, তার কোন একজন বন্ধু কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে তার থলি লুকিয়ে রেখেছিল। তা শুনে লোকটি টাকা নিয়ে পুনরায় আবেদের নিকট ফিরে গেল এবং টাকাগুলো ফিরিয়ে নিবার জন্য যতই তাঁকে অনুরোধ করল কিন্তু তিনি কিছুতেই তা পুনরায় গ্রহণ করলেন না, তিনি বললেন- 'আমি তোমাকে টাকা দিবার সময়, 'এই টাকাগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম, তিনি বললেন- আমি তোমাকে টাকা দিবার সময় 'এই টাকাগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম, বলে নিয়ত করে ফেলেছি। অতএব এখন তা আমি পুনরায় গ্রহণ করতে পারি না।' বহু পীড়াপিড়ীর পর তিনি বললেন- "আচ্ছা তবে টাকাগুলো অভাবগ্রস্ত দরবেশের মধ্যে বিতরণ করে দাও।' ' তদনুযায়ী সে সমস্ত টাকা দরবেশদেরকে দান করে দিল।

এরূপে যদি কেউ দরিদ্রকে দান করবার উদ্দেশ্যে অন্ন কিংবা রুটি নিয়ে বাইরে এসে দেখতে পায় যে, দরিদ্র লোকটি চলে গিয়েছে, তবে উক্ত অন্ন বা রুটি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে ভক্ষন করা বুযুর্গানে দ্বীন মাকরূহ মনে করেছেন। তাঁরা উক্ত রুটি অপর কোন মিসকীনকে দান করাই উত্তম বলে বিবেচনা করেছেন।

পাঁচ- যালিম চোরকে 'বদদো'আ' করা সঙ্গত নয়, তাতে সংসার-বৈরাগ্য এবং তাওয়াক্কুল উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা যে ব্যক্তি হৃত ধন-সম্পদের জন্য আক্ষেপ করে, সে ব্যক্তি সংসার বিরাগী হতে পারে না। কথিত আছে, হযরত রবী ইব্নে-খাসীমের (রাঃ) কয়েক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের একটি অশ্ব চোর কর্তৃক অপহৃত হলে তিনি লোকের নিকট বলেছিলেন যে- 'ঘোড়াটি চোরে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি স্বচোখে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন লোকে জিজ্ঞেস করল- 'তবে আপনি চোরকে ঘোড়া নিয়ে চলে যেতে কেন দিয়েছিলেন ? তদুওরে তিনি বলেছিলেন- 'তখন আমি যে কাজে 'মশগুল' ছিলাম তা অশ্ব অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। অর্থাৎ তখন তিনি নিতান্ত মনোযোগের সাথে নামাযে মগ্ন ছিলেন। পার্শ্ববর্তী লোকেরা তখন চোরের উদ্দেশ্যে বদ দো'আ করতে আরম্ভ করলে

https://kitabbhubon.com

হযরত রবী (রহঃ) তাদেরকে বললেন- বদ দো'আ করো না।' কেননা আমি সে অশ্বটি চোরের নিমিত্ত হালাল ও মুবাহ করতঃ তাকে ছদকা করে দিয়েছি।'

এক নরাধম লোক একজন বুযুর্গ লোকের প্রতি যুল্‌ম করেছিল। লোকে তাঁকে স্বীয় অত্যাচারীর জন্য বদ দো'আ করতে পরামর্শ দিলে বুযুর্গ লোক বলেছিলেন– 'অত্যাচারী আমাকে অত্যাচার করে নিজের উপরই অত্যাচার করেছে আমার উপর করেনি। তার জন্য সেই অত্যাচারের দুর্ভোগই যথেষ্ট, আমি আবার বদ দো'আ করে তার উপর অতিরিক্ত শাস্তির বোঝা চাপাতে পারি না।

হাদীছ শরীফে উক্ত হয়েছে- কোন মানুষের উপর কেউ অত্যাচার করলে উৎপীড়িত ব্যক্তি উৎপীড়নকারীকে বদ দো'আ করে ও গালি গালাজ করে, এমন কি তার প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ পুরাপুরি গ্রহণ করে। আবার কখন কখন এমনও হয় যে, অত্যাচারের অপেক্ষা অতিরিক্ত বদ দো'আ ও গালি-গালাজ করে তার নিজের উপরই উল্টো অত্যাচারের ভার টেনে আনে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সে নিজেই অত্যাচারের দায়ে দায়ী হয়ে পড়ে।

ছয়- চোরের পরিণাম ফলের প্রতি লক্ষ্য করে তার অবস্থার প্রতি সদয় চিত্তে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। কেননা চোর চুরি করে যে জঘন্য পাপে-পাপী হল তজ্জন্য পরলোকে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে গৃহস্বামী একথা মনে করে আল্লাহর শোকরগুযারী করা উচিত যে, আমার মাল অপহৃত হওয়ায় আমি মজলুম শ্রেণীভুক্ত হয়েছি, যালিম শ্রেণীভুক্ত হইনি। তাতে আমার ক্ষতি যা কিছু হয়েছে মালের উপর দিয়েই গিয়েছে, আমার ধর্ম ও ঈমানের কোন ক্ষতি হয়নি। চোরের পরিণাম ফল চিন্তা করে ধণী-স্বামীর এজন্য দুঃখিত হওয়া উচিত যে, চোর চুরির ন্যায় মহা পাপ কার্যকে সহজ ও সঙ্গত কার্য মনে করে জঘন্য শাস্তির উপযোগী হয়েছে, তদ্রূপ লোকের ভীষণ দুরবস্থা ও শোচনীয় পরিনাম স্মরণ করত যার মনে দয়া ও সহানুভূতির সঞ্চার না হয়, তার মনে মানব জাতির প্রতি ভালবাসা এবং মানব জাতিকে সদুপদেশ প্রদানের শুভেচ্ছা নেই বলে বুঝতে হবে। হযরত ফুযাইল (রহঃ) স্বীয় পুত্র আলীকে (রহঃ) দেখলেন,

https://kitabbhubon.com

তাঁর ধন চোর কর্তৃক অপহৃত হওয়ার কারণে তিনি বসে বসে ক্রন্দন করছেন। তখন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন- 'তুমি কি তোমার অপহৃত মালের জন্য ক্রন্দন করছ ? তিনি উত্তর করলেন- 'না, আমি মালের শোকে ক্রন্দন করছি না। আমি সেই বেচারা চোরের ভয়াবহ পরিনাম ফলের কথা ভেবে রোদন করছি। সে এমন জঘন্য কাজ করেছে যে, পরকালে বিচারের দিন তার কোন ওযর আপত্তি করবার পথ থাকবে না।'

রোগের চিকিৎসা, উপস্থিত বিপদ বিদূরণ প্রচেষ্টা ও তাওয়াক্কুল

মানব জীবনে যে সমস্ত আপদ-বিপদ উপস্থিত হয়ে থাকে তন্মধ্যে রোগ-ব্যাধি এক প্রকার প্রধান বিপদ। রোগাক্রান্ত হলে তা বিদূরণের নিমিত্ত যে বস্তু ব্যবহার করা হয়, তাকে 'ইলাজ বা চিকিৎসা বলা হয়। রোগের প্রযোজ্য ঔষুধকে তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

প্রথম শ্রেণী- নিশ্চিত প্রযোজ্য ওষুধ। তা ব্যবহারে রোগ দূরীভূত হওয়া অবধারিত। যেমন- ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় ঠান্ডা পানি। এরূপে কোন স্থানে আগুন লাগলে সেই বিপদের ওষুধ পানি ইত্যাকার যে সমস্ত বিপদে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োগে নিশ্চিত ফল দর্শে সেক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার না করে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে বসে থাকা হারাম। এই ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার না করলে তাওয়াক্কুল থাকে না।

দ্বিতীয় শ্রেণী- অনিশ্চিত ওষুধ- অর্থাৎ যে ওষুধ প্রয়োগে রোগ দূরীভূত হওয়া নিশ্চিত তো নয়ই, দূরীভূত হবে বলে কল্পনাও করা যায় না। যেমন- মন্ত্র-তন্ত্র ফাল ও দাগ ব্যবহার করা। এই শ্রেণীর ওষুধ ব্যবহার না করাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, 'এই শ্রেণীর ওষুধ ব্যবহার করলে আল্লাহর ওপর ভরসা থাকে না। 'আসবাব' ও উপকরণকে প্রাধান্য দেওয়া সে সমস্ত পদার্থের উপর ভরসা করার লক্ষণ। এদের মধ্যে 'দাগ' লাগান সর্বাপেক্ষা জঘন্য। তৎপরবর্তী স্তরে 'মন্ত্র' সর্বশেষ স্তরে 'ফাল'। ফালকে সাধারণের ভাষায় শকুন বা কাক চরিত্র বলা হয়।

তৃতীয় শ্রেণী-ওষুধ উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী। তা প্রথম শ্রেণীর ন্যায় নিশ্চিতও নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর ওষুদের ন্যায় অনিশ্চিত

https://kitabbhubon.com

এবং কল্পনা বহির্ভূতও নয়। এই শ্রেণীর ওষুদের ক্রিয়াও অবশ্য সুনিশ্চিত নয়, তবে আল্লাহ প্রত্যেক রোগের জন্য পৃথক পৃথক ওষুধ সৃষ্টি করে প্রত্যেক পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ প্রদান করেছেন। রোগ বিশেষে এদের প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। কাজেই সকলের ধারণা এসমস্ত ওষুধে রোগ দূরীভূত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। যেমন- রক্তাধিক্যে শিরা কর্তন পূর্বক রক্ত বের করা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হলে 'জুলাব' জাতীয় সারক ওষুধ সেবন। শীতাধিক্যে উষ্ণ দ্রব্য এবং উষ্ণাধিক্যে শীতল ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদি। এ শ্রেণীর ওষুধ ব্যবহার করা হারামও নয়; ব্যবহার করলে তাওয়াক্কুলেরও হানি হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর ওষুধ বর্জন না করে সেবন করাই উত্তম। আবার কোন কোন সময় সেবন করা অপেক্ষা বর্জন করাই উত্তম। ফল কথা, এই শ্রেণীর ওষুধ ব্যবহার না করা তাওয়াক্কুলের জন্য শর্ত নয়। এসমস্ত ব্যবহার করলে যে তাওয়াক্কুলের ক্ষতি হয় না তার প্রমাণ এই যে, হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পীড়ার অবস্থায় নিজেও ওষুধ সেবন করেছেন এবং উম্মতগণকেও সেবন করতে বলেছেন-

ওষুধ ব্যবহারের পোষকতায় হাদীছের বাণী

হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'হে, আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা রোগে ওষুধ সেবন কর।' তিনি আরও বলেছেন- 'জগতে মৃত্যু ভিন্ন এমন কোন রোগ নেই যার ওষুধ নেই। তবে মানব কখনও বা সে ওষুধের সন্ধান জানতে পারে কখনও বা জানতে পারে না।' এক সময় হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকে জিজ্ঞেস করেছিল- "ইয়া রছূলাল্লাহ ! ওষুধ ও মন্ত্র-তন্ত্র কি আল্লাহর বিধান উল্টিয়ে দিতে পারে ?' তিনি বলেছিলেন- ওষুধ ও আল্লাহর বিধান। তিনি আরও বলেছেন- "আমি ফেরেশতাগণের যে দলের সম্মুখ দিয়েই অতিক্রম করেছি তারাই আমাকে বলেছেন- "ইয়া রছূলাল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতগণকে সিঙ্গালাগিয়ে রক্ত বের করে ফেলতে উপদেশ দিবেন।

হুযুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক সময়ে বলেছেন- 'তোমরা মাসের, ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখে শিঙ্গা লাগিয়ে নিজেদের শরীর

https://kitabbhubon.com

থেকে রক্ত বের করে ফেলবে। পাছে এমন না হয় যে, রক্তাধিক্য তোমাদেরকে বিনাশ করে ফেলে। তিনি আরও বলেছেন-'আল্লাহর আদেশে রক্ত বিনাশের কারণ হয়ে থাকে। শরীর থেকে রক্ত বহিস্করণ, পরিহিত বস্ত্রাভ্যান্তর থেকে বিষধর সর্প ঝেড়ে ফেলা এবং ঘরে আগুন লাগলে নিবিয়ে ফেলা সমান পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ তিন প্রকার কার্য থেকে ক্ষান্ত থাকাই বিনাশ প্রাপ্তির কারণ। এসমস্ত কার্য পরিত্যাগ করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকা তাওয়াক্কুল নয়।

তিনি আরও বলেছেন-মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবারে সিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করে ফেললে সারা বছরের জন্য শরীর থেকে রোগ পীড়া দূর হয়ে যায়। আর এক সময় তিনি হযরত সা'আদ ইবনে-মোআয (রাঃ) কে 'ফসদ' লাগিয়ে অর্থাৎ শিরা কেটে রক্ত বের করে ফেলতে আদেশ করেছিলেন। একদিন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর চোখে বেদনা হলে হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন- 'তা খেও না; অর্থাৎ তাজা খোরমা খেওনা এবং ইহা খাও অর্থাৎ চকন্দর শাকের সাথে যবের আটা সংযোগে পাকিয়ে আহার কর।'

হযরত সাহাব (রাঃ)-এর চোখে বেদনা হয়েছিল, তদবস্থায় তাঁকে খোরমা ভক্ষন করতে দেখে রছূলে মাকবূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন- 'তোমার চোখে ব্যথা আর তুমি খোরমা খাচ্ছ ?' হযরত সাহাব একটু কৌতুকের সুরে বললেন- 'ইয়া রছূলুল্লাহ ! আমার যে চোখে ব্যথা হয়েছে তার বিপরীত দিকের মাড়ি দ্বারা খোরমা চিবিয়ে খাচ্ছি। যে দিকের চোখে ব্যথা সেদিকের মাড়ি দ্বারা চিবাচ্ছি না।' এ কথা শুনে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন।

হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওষুধ ব্যবহার

হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রোগে ওষুধ ব্যবহার করতেন। তিনি প্রতি রাতে তাঁর পবিত্র চোখে সুরমা লাগাতেন। প্রতি মাসে একবার সিঙ্গা লাগিয়ে শরীর থেকে রক্ত বের করে ফেলতেন এবং প্রতি বছর ওষুধ সেবন করতেন। ওহী নাযিল হবার সময় তাঁর পবিত্র মস্তকে ব্যথা হত। পরক্ষণেই তিনি ব্যথিত মস্তকে মেহেন্দী লাগাতেন।

https://kitabbhubon.com

দেহ মোবারকের কোন স্থানে ব্যথা অনুভব করলেও তিনি সেস্থানে মেহেন্দী লাগাতেন। শরীরের কোন স্থান ক্ষত হলে সময় সময় তিনি তাতে মৃত্তিকা চুর্ণ লাগিয়ে দিতেন। রোগের সময় তিনি যে যে ওষুধ সেবন করেছেন এবং পৃথক পৃথক রোগে বিভিন্ন মানুষকে তিনি যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন তৎসমুদয় সংগ্রহ করে আলেমগণ 'তিববুন্নবী' নামক একখানা গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

রোগে ওষুধ সেবন সম্বন্ধে পূর্ব যুগের আম্বিয়ায়ে কেরাম বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী

একবার হযরত মূছা কালিমুল্লাহ (আঃ) কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে বনি ইসরাঈল বংশীয় অভিজ্ঞ লোকেরা তাঁকে বলেছিলেন- 'অমুক দ্রব্য এই রোগের অমোঘ ওষুধ, আপনি তা সেবন করুন।' তিনি বলেছিলেন-'আমি ওষুধ সেবন করব না। আল্লাহতা'আলাই রোগ দিয়েছেন তিনি তা আরোগ্য করে দিবেন।" তাঁর পীড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ভীষণ আকার ধারণ করল, সকলে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করতে লাগল, 'সেই ওষুধটি এ রোগের বিখ্যাত ওষুধ এবং বহু রোগীকে সেবন করিয়ে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে, আপনি ব্যবহার করুন।' তিনি উত্তর করলেন-'আমি কিছুতেই ওষুধ সেব করব না, আল্লাহই আমার রোগ নিরাময় করে দিবেন। কিন্তু তাঁর পীড়া বেড়েই চলল। ইতোমধ্যে ওহী নাযিল হল ঃ 'হে মূছা আমি ইয্যতের শপথ করে বলছি, যতদিন তুমি ওষুধ সেবন না করবে, ততদিনে আমি কিছুতেই তোমার রোগ নিরাময় করব না।' অতঃপর তিনি ওষুধ সেবন করে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। এই ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করে হযরত মূছার মনে বিষম খট্‌কা বাধল। আবার তাঁর প্রতি ওহী আসল- 'হে মূছা ! তুমি কি নিজের তাওয়াক্কুল দ্বারা আমার সৃষ্টি প্রতিপালনের হেকমত বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছিলে ? ওষুধসমূহের মধ্যে রোগ নিরাময় করার গুণ আমি ভিন্ন আর কে স্থাপন করেছে ?'

পুরাতন যুগের কোন একজন নবী (আঃ) আল্লাহতা'আলার সমীপে-স্বীয় শারীরিক দুর্বলতার অভিযোগ করলে 'ওহী' এসেছিল 'মাংস ভক্ষন ও দুগ্ধ পান কর।' আর একজন নবী (আঃ) দুর্বলতার অভিযোগ করলে ডিম খাওয়ার জন্য নির্দেশ এসেছিল। পুরাকালে কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে

https://kitabbhubon.com

সুন্দর ও সুশ্রী সন্তান জন্মিত না। তারা তৎকালীন নবীর সমীপে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ পেশ করলে আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসল; উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলে দাও, তাদের গর্ভবতী স্ত্রীগণ যেন গর্ভকালেও উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য আহার করে। তাতে তারাও সুশ্রী সন্ত ান লাভ করতে পারবে। তখন থেকে তাদের গর্ভিনী স্ত্রীগণ গর্ভকালে উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য এবং সন্তান প্রসবান্তে 'নেফাসের সময় তাজা খোরমা আহার করতে আরম্ভ করল। ফলে তারা সুন্দর ও সুগঠন সন্তান লাভ করতে লাগল। এসমস্ত বিবরণ থেকে বুঝা যায়, উত্তম ও উপাদেয় পান আহার একদিকে যেমন পরিতৃপ্তি দান করে অপরদিকে তা ওষুধরূপে শরীরে বল, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের বিধান করে থাকে। এই সমস্ত উপকারিতা বা গুণ, সর্ব কারণের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই সৃষ্টি কৌশল।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূছা নবী আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- 'ইয়া আল্লাহ! রোগ কিসের কারণে এবং তার আরোগ্য কার কারনে ঘটে থাকে ? উত্তর আসল উভয় কার্যই আমার আদেশে ঘটে থাকে। অতঃপর মূছা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ডাক্তার চিকিৎসক তবে কোন কাজের জন্য ? উত্তর আসল চিকিৎসক শ্রেণী চিকিৎসা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং আমার বান্দাগণকে রোগ্য ব্যাধিতে প্রফুল্ল রাখবে এই উদ্দেশ্যেই চিকিৎসক সৃষ্টি করা হয়েছে।'

যা হোক, ওষুধ ব্যবহার সম্বন্ধেও 'তাওয়াক্কুল' জ্ঞানমূলক, অনুষ্ঠানমূলক নয়। মানুষের কর্তব্য ওষুধ ও চিকিৎসকের উপর কিছু মাত্র ভরসা না করে ওষুধ ও চিকিৎসক সৃষ্টিকারী আল্লাহর উপর নির্ভর করা। কেননা দেখা যাচ্ছে যে, বহুলোক ওষুধ সেবন করেও মারা পড়েছে। অতএব বুঝতে হবে, ওষুধের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতা'আলার হস্তে রয়েছে।

রোগে 'দাগ' লওয়া অনুচিত কেন ?

পাঠক! অবগত হও, রোগ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য 'দাগ' লওয়া অনেকের অভ্যাস আছে। কিন্তু দাগ ব্যবহার করলে তাওয়াক্কুলের শ্রেণী থেকে বের হয়ে পড়তে হয়। বরং হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি

https://kitabbhubon.com

ওয়াসাল্লাম দাগ ব্যবহার করতে মানুষকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার ব্যাপারে তত কঠোরতার সাথে নিষেধ করেননি। এর কারণ এই যে, অগ্নি দ্বারা পুড়িয়ে দাগ দিলে ক্ষত ভয়াবহ আকার ধারন করতে পারে। এত ভিন্ন অগ্নির প্রদাহ শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ারও আশঙ্কা রয়েছে। শরীরের অগ্নিদগ্ধ করে দাগ লাগান রগ ফেঁড়ে বা সিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করার ন্যায় সহজ কার্যও নয়, এর উপকারিতাও "ফসদ' খোলা কিংবা সিঙ্গা লাগানোর উপকারিতার ন্যায় নয়। অধিকন্তু দাগ লাগাবার পরিবর্তে অন্য ওষুধ ব্যবহার করলেও সে রোগ দূরীভূত হতে পারে।

হযরত ওমর ইবনুল-হাদীছ রাহেমাহুল্লাহ পীড়িত হয়ে পড়লে লোকে তাঁকে শরীরে দাগ নিবার জন্য বহু অনুরোধ করতে লাগল। প্রথমত- তিনি তাদের অনুরোধের প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেননি। অবশেষে লোকের অবিরত অনুরোধ সহ্য করতে না পেরে তিনি দাগ গ্রহণ করলেন। অতঃপর একদিন তিনি বললেন- 'দাগ গ্রহণের পূর্বে আমি এক প্রকার নূর দেখতে পেতাম এবং অদৃশ্য জগৎ থেকে একটি আওয়াযও শুনতে পেতাম এবং ফেরেশ্তাগণ আমাকে 'ছালামুন আলাইকা' বলে ছালাম করতেন। দাগ গ্রহণের পর থেকে আমার সে সমস্ত ব্যাপার একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা উপলব্ধি করতে পেরে আমি দারুন অনুতাপ ও অনুশোচনা সহকারে 'তওবা' করতঃ ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলাম। এই ব্যাপারটি তিনি মৃতরেফ ইবনে-আবদুল্লাহর নিকট প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, বহুদিন অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক তাঁকে পূর্ব কারামত পুনরায় প্রদান করেন।

রোগের অবস্থা বিশেষে ওষুধ ব্যবহার না করা উত্তম, সুন্নৎ বিরোধী নয়

প্রিয় পাঠক! জেনে লও, অধিকাংশ বুযুর্গ লোক পীড়িত হলে ওষুধ সেবন করতেন না। একথার প্রতিবাদে বলতে পারেন, ওষুধ ব্যবহার না করাই যদি পূর্ণ তাওয়াক্কুলের পরিচায়ক হত, তবে হযরত রছূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ওষুধ ব্যবহার করতেন না। প্রিয় পাঠক! ছয়টি কারণে মানুষ রোগে ওষুধ সেবনের প্রতি উদাসীন হয়ে

https://kitabbhubon.com

থাকে। তুমি সেই বড়বিধ কারণ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারলে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আপনা থেকেই প্রাপ্ত হবে।

ওষুধের প্রতি ঔদাসীন্যের ৬ টি কারণ

১. আসন্ন মৃত্যু প্রত্যক্ষ করণ। যে সমস্ত মহাপুরুষ দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পান তাঁদের মৃত্যু দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন আর তাঁদের ওষুধ সেবনের প্রবৃত্তি থাকে না। এই কারণেই হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হলে যখন লোকে চিকিৎসক ডাকাবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ চিকিৎসক আমাকে দেখে এ মন্তব্য করে ফেলেছেন-

إِنِّى أَفْعَلُ مَا أُرِيْدُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি।

২. পীড়িত ব্যক্তির পরলোকের ভয়ে বিহবল থাকা। কোন কোন বুযুর্গ লোক অন্তিমকালে পরলোকের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন, কিসে পরকালে মানঅপমান হ্রাস-বৃদ্ধি হবে তৎচিন্তায় ও ধ্যানে, ভীত ও সন্ত্রস্ত, হয়ে পড়েন, কাজেই ওষুধ সেবনের খেয়াল তাদের থাকে না। একবার হযরত আবুদারদা (রাঃ) পীড়িত হয়েছিলেন। তিনি দারুন ভাবনা ও চিন্তায় রোদন করতে লাগলেন। লোকে তাঁকে রোদনের কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বলেছিলেন- "আমি পাপের স্মরণে ক্রন্দন করছি। লোক জিজ্ঞেস করল- 'আপনার মনে এখন কিসের আকাঙ্খা হচ্ছে ? তিনি উত্তর করলেন- 'আল্লাহর রহমত কামনা করছি। লোকে আবার জিজ্ঞেস করল 'চিকিৎসক ডাকব কি ? তিনি বললেন- 'চিকিৎসকই তো আমাকে পীড়িত করেছেন। হযরত আবুযর (রাঃ)-এর চোখে ব্যথা হয়েছিল। লোকে বলল, আপনি চোখের চিকিৎসা করাচ্ছেন না কেন ? তিনি উত্তর করেছিলেন- 'আমি এখন ওষুধ সেবন অপেক্ষা বৃহত্তর কার্যে মশগুল আছি।' তাঁর এ কথায় প্রকাশ্যত বুঝা যায়, তিনি যেন ওষুধ সেবন কার্যের অবজ্ঞা বা বিরোধিতা লক্ষ্য করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। দেখ, কোন অপরাধীকে দন্ড

https://kitabbhubon.com

বিধানের নিমিত্ত বাদশাহের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে ব্যক্তি ভয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছে। এমন সময় কেউ তাকে ক্ষুধিত দেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি রুটি খাচ্ছ না কেন ? অপারাধী ব্যক্তি উত্তর করল, 'আমি ক্ষুধার পরোয়া করি না।' তার এই উক্তিতে এরূপ বুঝা অন্যায় হবে যে, সে রুটি ভক্ষণকারীদেরকে তিরস্কার করছে কিংবা রুটি ভক্ষণের বিরোধিতা করছে বরং তার উক্তি থেকে এই বুঝতে হবে যে, সে এখন বাদশাহের শাস্তির ভয়ে জড়সর হয়ে আছে। ক্ষুধার বিষয় চিন্তা করবার অবসর কিংবা ক্ষুধার অনুভূতিই তার নেই। নচেৎ ভক্ষণে তার অভ্যাস আছে, ইচ্ছাও আছে। তদ্রূপ হযরত আবূযর (রাঃ)-এর উক্তি থেকেও এই বুঝতে হবে যে, ওষুধ সেবন করাকে অপছন্দ করেন না; কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের পাপ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আল্লাহর কঠোর শাস্তির ভয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছেন। সুতরাং তাঁর ওষুধ সম্বন্ধে চিন্তা করবার অবসরই ছিল না। আত্মা ও পরকালের চিন্তায় বিভোর লোকেরা হযরত সাহাল তাস্তারীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। একদিন কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে হযরত সাহাল তাস্তারীর (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলে,- قوت অর্থাৎ খাদ্য কি ? তিনি উত্তর করলেন, 'চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহর যিকির। তারা আবার জিজ্ঞেস করল 'আমরা আপনাকে আত্মার খাদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছি না, আমরা বলছিলাম যে, মানবের দেহের قوام অর্থাৎ স্থিতি কিসের উপর নির্ভর করে ? তিনি বললেন, علم অর্থাৎ জ্ঞানের উপরই মানবের স্থিতি। তখন তারা আরও পরিস্কার করে বলল, 'কেমন খাদ্যের দ্বারা মানব দেহের পোষকতা হয়ে থাকে ?' তিনি উত্তর করলেন- 'তুমি দেহের চিন্তা করে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সে চিন্তা থেকে তুমি হাত গুটিয়ে নাও এবং দেহ রক্ষার ভার সৃষ্টি কর্তার হাতে সোপর্দ করে তুমি আত্মা ও পরকালের চিন্তায় নিমগ্ন হও।'

৩. রোগের দীর্ঘস্থিতি। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে রোগ ভোগ করছে, বহুকাল ধরে নানাবিধ ওষুধ সেবন করেও কোন ফল পাচ্ছে না। এখন সে ওষুধকে মন্ত্র-তন্ত্রের ন্যায় অকর্মণ্য ও নিষ্ফল মনে করছে। তদ্রূপ ব্যক্তি অবশেষে ওষুধের হিতকারিতা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে ওষুধ সেবনে ক্ষান্ত হয়।

https://kitabbhubon.com

যারা চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা অধিকাংশ সময় ওষুধ পত্রকে এরূপ নিষ্ফলই মনে করে থাকে। হযরত রাবী ইবনে খাসীম রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন- 'পীড়িত হয়ে আমি অনেকবারই ওষুধ সেবন করতে ইচ্ছা করেছিলাম। পরক্ষণেই প্রাচীন যুগের আদ, সামুদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা আমার স্মরণে উদিত হয় এবং আমি ভাবলাম, সে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিদ্যমান ছিল। এতৎসত্ত্বেও তারা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায়নি। চিকিৎসা বিদ্যা বা ওষুধ পত্র তাদের কোনই উপকার করতে পারেনি। হযরত রাবীর উক্তি থেকে প্রকাশ্যতঃ এই বুঝা যায় যে, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রকে বাহ্য উপকরনের অন্তর্গত বলে মনে করেননি।

৪. রোগ ভোগকে ছওয়াব লাভের কারণ বলে রোগ বিদূরণে অনিচ্ছা- কোন কোন বুযূর্গ লোক পীড়াগ্রস্থ হলে মনে করতেন, রোগ ব্যাধি মানবের জন্য অতীব কল্যাণকর। রোগ ভোগে প্রচুর ছওয়াব লাভ হয়। রোগের দ্বারা নিজের মধ্যস্থিত ছবরের মাত্রা পরীক্ষা করা যায়। কাজেই তাঁরা পীড়া থেকে মুক্ত হওয়ার কামনা না করে পীড়াকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখাই নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করতেন। এই কারণে তাঁরা ওষুধ সেবনে উদাসীন ছিলেন। হযরত সাহাল তাস্তারী রাহেমাহুল্লাহ মানুষকে পীড়ার ওষুধ সেবনের জন্য উপদেশ প্রদান করতেন। কিন্তু তিনি নিজে কোন এক বিশেষ রোগে ভূগছিলেন। তিনি ওষুধ সেবন করতেন না এবং বলতেন রোগ-ব্যধির যন্ত্রনায় ছবর করতঃ বসে বসে নামায পড়াকে আমি সুস্থ দেহে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম বলে মনে করি।

৫. রোগী ব্যক্তি নিজকে জঘন্য পাপী বলে মনে করে এবং এও বিশ্বাস করে যে, রোগ ভোগে পাপের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। সে আশা করে, দীর্ঘকাল রোগে ভুগতে পারলে তার সমস্ত পাপ রাশি মোচন হয়ে যাবে। এই আশায় সে ওষুধ সেবনপূর্বক রোগ দূর করতে অনিচ্ছুক থাকে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মানুষকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যের জ্বর ও অন্যান্য রোগ শোকে পতিত করা হয়। রোগ শোকের প্রভাবে পাপ এমন ভাবে পরিস্কার হয়ে যায়, যেমন বরফের ওপর থেকে ধুলাবালি পরিস্কার হয়ে যায়। হযরত ঈছা (আঃ) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি পাপ মুক্তির আশায়

https://kitabbhubon.com

শারীরিক রোগ ব্যধির যন্ত্রনা ও অর্থ কষ্ট সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য না করে সে ব্যক্তিকে আলেম বলা যায় না।' একদা হযরত মূছা (আঃ) কোন একজন পীড়িত ব্যক্তিকে পীড়ার যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে আল্লাহর দরবারে তার প্রতি দয়া বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর আসল "আর কোন প্রকারে আমি তার প্রতি দয়া করতে পারি ? আমি এই রোগ প্রদান করেই তার প্রতি যথেষ্ট দয়া করছি। কেননা রোগের দ্বারা আমি তার পাপ মোচনের এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা করছি। তা অপেক্ষা অধিক দয়া আর কিরূপে করা যায় ?

৬. কতক বুযুর্গ লোক মনে করেন যে, সুস্থ থাকলে হৃদয়ে সংসারের প্রতি মোহ, স্বাস্থ্যের জন্য গর্ব এবং আল্লাহর প্রতি অমনোযোগিতা প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হয় হৃদয়কে কলুষিত করে ফেলতে পারে এই কারণে রোগ-ব্যাধিকে আল্লাহর রহমত মনে করে সযত্নে তা পুষে রাখবার ব্যবস্থা করেন এবং ওষুধ সেবন থেকে বিরত থাকেন। সর্বদা শরীর পীড়াগ্রস্ত থাকলে পূর্বোক্ত মোহ, গর্ব এবং অমনোযোগিতা মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে সর্বদা রোগে শোকে ও আপদে-বিপদে নিমজ্জিত রেখেই পরকালের জন্য প্রস্তুত ও সতর্ক থাকার ব্যবস্থা করেন। এই কারণেই জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন- 'অভাব' রোগ ও লাঞ্ছনা-এই তিনটি দ্রব্য থেকে মুছলমান অব্যাহতি পায় নাই।'

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ বলেছেন– 'রোগ আমার 'কয়েদ' এবং অভাব আমার কয়েদ খানা, যাদেরকে আমি ভালবাসি তাদেরকে আমি আমার কয়েদ ও কয়েদ খানায় রেখে দেই।" যা হোক, সুস্থতা যখন মানুষকে নানাবিধ পাপের দিকে আকর্ষণ করে থাকে। এই কারণে পীড়িত থাকার মধ্যেই মানুষের মঙ্গল।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু একদিন কতিপয় লোককে সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন–"এই সাজ-সজ্জা কেন ?' পার্শ্ববর্তী লোকেরা উত্তর করল- 'আজ এদের ঈদের দিন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন- যেদিন আমরা কোন প্রকার পাপ কার্য না করি সেদিনই আমাদের জন্য ঈদের দিন।'

https://kitabbhubon.com

কোন একজন বুযূর্গ লোক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- 'কেমন আছ ?' সে উত্তর করল- ভালই আছি।' তখন বুযূর্গ লোকটি বললেন- 'যেদিন তুমি কোন পাপ কার্য না কর সেদিনই তুমি বাস্তবিক পক্ষে ভাল থাক, আর যেদিন তোমার দ্বারা কোন পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হয়, সেদিন তোমার গুরুতর পীড়ার দিন। প্রকৃত পক্ষে পাপের সমান গুরুতর পীড়া আর নেই। বুযূর্গ লোকেরা বলেছেন– 'ফেরআউন নিজকে খোদা বলে এই জন্য দাবী করেছিল যে সে চারশ' বছর জীবিত ছিল।' এই দীর্ঘকালের মধ্যে তার কোন দিন মাথা ব্যথাও হয়নি, কোন দিন সে কোন রোগে আক্রান্তও হয় নি। যদি মুহূর্ত কালের জন্য তার আধকপালী বেদানও হত, তবে কখনই সে এমন অবান্তর দাবী করে বসতনা বুযূর্গ লোকেরা আরও বলেছেন- 'লোকে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে তওবা না করে, তবে হযরত আযরাইল (আঃ) বলে থাকেন- 'ওহে মোহমত্ত! কয়েকবার আমি তোমার নিকট দূত পাঠিয়ে তোমাকে মৃত্যু- সংবাদ প্রদান করেছি, কিন্তু তোমার কোনই উপকার হল না। অপর কতিপয় বুযূর্গ লোক বলেছেন- 'মুমেন বান্দার পক্ষে ৪০ দিন ধরে মনঃকষ্ট, রোগ, ভয় এবং ক্ষতি থেকে নিষ্ক্রান্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।"

হযরত রছূলে মাকবুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একজন রমনীকে বিয়ে করতে মনস্থ করলে লোকে তার প্রশংসা করার মানসে বলেছিল- 'ইয়া রছূলুল্লাহ! এই রমনী কখনও পীড়াগ্রস্ত হয়নি, অর্থাৎ তার স্বাস্থ্য খুবই নীরোগ।' এ কথা শ্রবনে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'তবে এমন রমনীর আমার প্রয়োজন নেই।' একদিন হুযূর আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মাথা' ব্যাথায় ভুগছেন বলে উল্লেখ করলে উপস্থিত জনৈক বেদুইন ব্যক্তি বলেছিল- "ইয়া রছূলুল্লাহ ! শিরঃপীড়াতো তুচ্ছ কথা, আমার তো কখনও কোন রোগই হয়নি। তা শুনে হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- "তুমি আমার সম্মুখ থেকে দূর হও।" আরও বললেন –'তোমরা কেউ যদি দোযখী মানুষ দেখতে ইচ্ছা কর, তবে এই বেদুইন লোকটিকে দেখে লও।" উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) একদিন হুযুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ইয়া রছূলুল্লাহ ! ধর্মযুদ্ধে নিহত শহীদ লোকের সমতুল্য মর্যাদা কি অন্য কেউ লাভ করতে পারে ?

https://kitabbhubon.com

হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন- হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি পেতে পারে যে ব্যক্তি দিবসের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে (২০) বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে থাকে।" এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পীড়া গ্রস্ত লোক দিনের মধ্যে বিশ বারেরও অধিক মৃত্যুকে স্মরণ করে থাকে। এসমস্ত কারণেই কতিপয় বুযূর্গ লোক ওষুধ সেবন করতে বিরত রয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যেদুল মুরসালীন বা রছূলকুলের শিরোমনি ছিলেন। রোগ-শোকে ছবর করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করার কিংবা গুনাহের কাফ্ফারা করার প্রয়োজন তার ছিল না। সুতরাং তিনি রোগে ওষুধ সেবন করতেন। যা হোক, বিপদ-আপদের বাহ্য কারণ থেকে আত্মরক্ষা করা তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়।

মহামারীর স্থান থেকে পলায়ন বা তথায় গমন করা অনুচিত

আমীরুল মু'মেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একদিন শাম দেশে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জানতে পারলেন যে, তথায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ সংবাদ শুনে তাঁর সহগামীদের মধ্যে দ্বিমত উপস্থিত হল, কেউ কেউ বললেন- 'এমন মহামারীর স্থানে আমরা যাব না। অপর দল বলল- "আল্লাহর বিধানও ইচ্ছা থেকে পলায়ন করব না।' হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- "আমরা আল্লাহর নির্ধারিত এক অদৃষ্ট বিধান থেকে আর এক অদৃষ্ট বিধানের প্রতি পলায়ন করব।' তৎসঙ্গে এও বললেন যে, মনে কর তোমাদের মধ্যে কারও দুটি চারনভূমি আছে। তন্মধ্যে একটি নিতান্ত সতেজ ও সবুজ তৃণলতা ও ঘাস পাতায় পরিশোভিত। আর অপরটি তৃণলতা শুন্য শুষ্ক কঙ্করময়। এখন তার রাখাল বকরী পালকে এতদুভয়ের যে কোনটির দিকেই নিয়ে যায় তাই আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্ট বিধান বলে বুঝতে হবে। অতঃপর তিনি হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কে ডেকে এ সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলেন, "আপনার অভিমত কি ?" তিনি বললেন- 'আমি হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি-'তোমরা যদি শুনতে পাও যে, অমুক স্থানে মহামারী আরম্ভ হয়েছে, তবে তোমরা সেখানে যেও না, আর তোমরা যে

https://kitabbhubon.com

স্থানে বাস করছ, যদি সেখানে মহামারী আরম্ভ হয়ে যায়, তবে তথা থেকে পলায়ন কর না। তা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- আলহামদুলিল্লাহ, আমার অভিমত হুযূর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছের অনুরূপ হয়েছে। পরিশেষে কাফেলার সমুদয় ছাহাবী (রাঃ) একথায় ওপর একমত হয়ে মদীনা শরীফের দিকে ফিরে আসলেন।

দুই কারণে মহামারী স্থান থেকে সুস্থ লোকের পলায়ন নিষিদ্ধ

যে স্থানে মহামারী আরম্ভ হয়েছে তথা থেকে সুস্থ লোকের পলায়ন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, ১. সবল ও সুস্থ লোক সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে রোগাক্রান্ত লোকদের সেবা শুশ্রুষার অভাব ঘটে তারা চরম দুর্দশায় পতিত হবে। ২. মহামারী স্থানের দুষিত আবহাওয়া সুস্থ লোকের দেহে ও প্রবেশ করে থাকে। এমতাবস্থায় পালিয়ে পীড়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার আশা বৃথা। তদুপরি পলায়ন করে যে স্থানে যাবে তাদের দ্বারা তথাকার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কাও প্রবলভাবে রয়েছে। কোন কোন হাদীছে এরূপ উল্লেখ আছে যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে মহামারীর স্থান থেকে পলায়ন করা আর কাফেরদের ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা সমান কথা। এ সমতার কারণ এই যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে যুদ্ধরত অন্যান্য যোদ্ধা এবং যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের উৎসাহ ভেঙ্গে যায়। মহামারী আক্রান্ত স্থল থেকে সুস্থ লোকেরা পলায়ন করলে তথায় অবশিষ্ট সুস্থ লোকেরা সাহস হারা হয়ে পড়ে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ নিতান্ত অসহায় ও হতাশ হয়ে যায়। বিশেষতঃ সুস্থ লোকেরা সকলে পালিয়ে গেলে রোগাক্রান্ত লোকদেরকে পথ্য ও ওষুধ পত্র যুগিয়ে দেয়ার ও সেবা-শুশ্রুষা করার মত কেউ থাকবে না। কাজেই রুগ্ন ব্যক্তিদের দুর্গতি ভোগ ও ধ্বংস অনিবার্য। অপর পক্ষে যারা পলায়ন করবে তাদেরও রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া নিশ্চিত নয়; বরং সন্দেহমূলক। কেননা মহামারীস্থান থেকে তাদের শরীরে ক্রমে ক্রমে যে দূষিত আবহাওয়া ও রোগ জীবাণু প্রবেশ করেছে অন্যস্থানে গেলেও তারা উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

https://kitabbhubon.com

রোগাক্রমণের কথা প্রকাশ করা কখন সঙ্গত

প্রিয় পাঠক! জেন রেখ, রোগের কথা গোপন রাখাই তাওয়াক্কুলের লক্ষণ। আর রোগের কথা প্রকাশ করে বেড়ান এবং তজ্জন্য অভিযোগ করা মাকরূহ। কিন্তু তিন কারণে রোগের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা সঙ্গত। ১. রোগ নির্ণয় পূর্বক উপযুক্ত চিকিৎসা লাভের আশায় চিকিৎসকের নিকট রোগের কথা খুলে বলা সঙ্গত। হযরত বেশার হাফী (রহঃ) চিকিৎসকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের শরীরের রোগ ব্যাধির অবস্থা বর্ণনা করতেন। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে-হাম্বল (র) ও চিকিৎসকের নিকট নিজের রোগের অবস্থা অবস্থা ব্যক্ত করে বলতেন- "আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার নিদর্শন আমার দেহের মধ্যে নতুনভাবে যেটুকুই প্রবেশ করে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে, আমি কেবল সেটুকুই প্রবেশ করে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে, আমি কেবল সেটুকুই বর্ণনা করছি। ২. রোগ-ব্যাধি আল্লাহতা'আলার দয়ার লক্ষণ, তা বিশ্বাস করতঃ আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিপ্রায়ে রোগের কথা প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু এমনভাবে প্রকাশ করতে হয়, যাতে অপরের মনে বিপদ সহ্যকরবার ক্ষমতা বাড়তে পারে এবং রোগের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রবৃত্তিও হয়। হযরত হাছান বছরী বলেছেন- আল্লাহতা'আলার প্রশংসার সাথে শোকর গুযারী সহকারে রোগের কথা প্রকাশ করলে এবং মনে অসন্তোষের ভাব না রাখলে আল্লাহর নিন্দা করা হয় না; বরং তা শোকরগুযারী বলেই গণ্য হবে। ৩. আল্লাহতা'আলার নিকট নিজের অসহায়তা, দুর্বলতা ও অভাব অভিযোগ জ্ঞাপনার্থে রোগ প্রকাশ করা সঙ্গত। যারা সাহসে ও বীরত্বে প্রখ্যাত রোগ-ব্যাধির কথা প্রকাশ করা তাদের মুখেই শোভা পায়। তাদের নিজের বাহাদুরী ও বীরত্বের অহমিকা অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যায়। একদা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে লোকে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করে বলেছিল- 'আপনি তো আল্লাহর ফযলে ভালই আছেন, কুশলেই আছেন। তিনি বললেন, 'না'। তা শুনে উপস্থিত লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে হযরত আলী (রাঃ) বললেন- 'মহা ক্ষমতার অধিপতি আল্লাহতা'আলার সম্মুখে কি বাহাদুরী ও

https://kitabbhubon.com

ক্ষমতা গৌরব প্রকাশ করা যায় ? বরং অক্ষমতা, অসহায়তা ও দুর্বলতা প্রকাশ করা সঙ্গত।

এরূপ উক্তি সে সমস্ত লোকের মুখেই শোভা পায়, যাঁরা শক্তি সামর্থ্য এবং মান মর্যাদার অধিকারী হয়েও নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে থাকেন। এই কারণেই হযরত আলী (রাঃ) সর্বদা আল্লাহতা'আলার সমীপে প্রার্থনা করতেন 'ইয়া আল্লাহ্! আমাকে ছবর দান করুন।"

হযরত রছূলে করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'তোমরা আল্লাহতা'আলার নিকট মঙ্গল ও সুস্থতা প্রার্থনা করিও না। বালা-মুছিবতের প্রার্থনাও করিও না।'

রোগের কথা প্রকাশ করা কখন নিষিদ্ধ

কোন সঙ্গত কারণ বা ওযর থাকলেও যদি রোগের বিষয় অন্যের নিকট এমনভাবে প্রকাশ করা হয়, যাতে মনের দুঃখ প্রকাশ পায় এবং আল্লাহতা'আলার বা অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে বলেও বুঝা যায়, তবে তা হারাম হবে। অভিযোগ প্রকাশ না পেলে ওযর বশতঃ প্রকাশ করা জায়েয হবে, তথাপি রোগের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ না করাই উত্তম। কেননা প্রকাশ করতে গেলে, যে রোগের যতটুকু প্রকাশ দরকার তদপেক্ষা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে এবং তা শুনে লোকে মনে করতে পারে, এ ব্যক্তি অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে এবং আল্লাহতা'আলার বিধানের নিন্দা করছে। বুযুর্গগণ বলেছেন- 'রোগের সময় চীৎকার করে ক্রন্দন করা এবং হা-হুতাশ করা উচিত নয়। তাতে আল্লাহ্তা'আলার বিধানের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করছে বলে বুঝাবে। ইবলীস মালউন হযরত আইয়ূব নবী (আঃ) থেকে রোগের যন্ত্রনায় ক্রন্দন ভিন্ন অধৈর্য বা তাওয়াক্কুলহীনতার কিছুই পায়নি। হযরত ফুযাইল, ইয়ায, বেশারহাফী এবং ওয়াহ্হাব ইবনূল ওয়ার্দ রাহেমাহুমুল্লাহ রোগাক্রান্ত হলে নিজ নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখতেন যেন তাঁদের পীড়া সম্বন্ধে কেউ জানতে না পারে। তাঁরা বলতেন- 'পীড়িত হলে আমাদের পীড়ার সংবাদ সম্পূর্ণরূপে গোপন থাকুক যেন কেউ রোগের তত্ত্ব গ্রহণেরও সুযোগ না পায়, এই আমাদের ইচ্ছা।"

তাম্মাত বিল খাইর

https://kitabbhubon.com

চিশ্‌তীয়া ছাবেরীয়া তরীকার প্রথম ছবক

আমার প্রিয় বন্ধুগণ জানিয়া রাখিবেন জাহান্নামের আজাবের পথ বন্ধ করিয়া জান্নাতে যাইবার জন্য কিতাবে ১২৬ টি তরীকার বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে চিশ্‌তীয়া ছাবেরীয়া তরীকা একেবারে সহজ। এই তরীকার প্রথম ছবক খানা লিখিয়া এজাজত দিলাম। যে কোন নারী ও পুরুষ ভক্তির সাথে ইহা নিয়ম অনুসারে আদায় করিবেন, আল্লাহর ফজলে তাহার দেল আখেরাতের দিকে ঝুঁকিয়া যাইবে, আর এই তরীকার যত আউলিয়াগণ ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের রূহানী দোয়া পাইবেন। কাল কেয়ামতে তাঁহাদের সাথী হইয়া বেহেশতবাসী হইবার আশা রাখিবেন।

মাগরিবের ফরজ ও ছুন্নত পড়িয়া দুই দুই রাকাত করিয়া ছয় রাকাত আউয়াবীন নামাজ পড়িবেন। যে কোন ছূরা দিয়া ইচ্ছা পড়িবেন। নফল বা ছুন্নত উভয় রকম নিয়ত করা জায়েজ আছে। প্রথম দিন একবার ছূরা আলহামদু , তিনবার ছূরায়ে এখলাছ দিয়া দুই রাকাত শুকরানা নামাজ আদায় করিবেন। মহিলাগণ নামাজের কায়দায়, পুরুষগণ আসন করিয়া বা চারজানু হইয়া অর্থ্যাৎ ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার পাশের আঙ্গুলি দ্বারা বাম পায়ের হাটুর নিচে (কিমিয়াছ) মোটা চেপ্টা রগ চাপিয়া ধরিয়া বঁসিবেন। কারণ, শয়তান মরদুদ ঐ রগ দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া নানা রকম ওয়াছওয়াছা দিয়া থাকে। প্রথম মউতের মোরাকাবা এবং কবরের খেয়াল করিবেন, তাতে দিল নরম হইবে এবং জিকিরে তাছীর বেশী হইবে। নিজের মনকে বুঝাইবেন যে, এই কবরে মা'বূদ ছাড়া আমার আর কেহ সঙ্গী নাই। দুনিয়ার খেয়াল যেন না আসে, আসিলে আবার খেয়াল মউত ও কবরের দিকে ফিরাইয়া নিবেন। তারপর মহব্বতের সাথে ৫ বার দরূদ শরীফ পড়িবেন। খেয়াল করিবেন, হুযুরে আকরাম ছল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারায় শুয়ে আছেন, আমি তাঁর রওজা পাকে দরূদ শরীফ পাঠাইতেছি।

যে কোন দরূদ পড়া যাইবে কিন্তু যেহেতু আমাদের আকাবিরে দ্বীন নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ পড়িতেন সেহেতু আমরাও এই দরূদ পড়ি।

https://kitabbhubon.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

উচ্চারণ: আল্ল-হুম্মা ছল্লিআ'লা- ছাইয়্যিদিনা- ওয়া নাবিয়্যিনা- ওয়া শাফীয়ি'না- ওয়া হাবীবিনা- ওয়া মাওলা-না-মুহাম্মাদ, ছল্লাল্ল-হু আ'লাইহি ওয়া আ'লা-আলিহি ওয়া আছহা-বিহি ওয়া বা-রকা ওয়া ছাল্লাম।

তারপর اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আসতাগফিরুল্ল-হ) ১১ বার, খেয়াল করিবেন সমস্ত গুণাহ থেকে তওবা করিতেছি এবং ভবিষ্যতে আর গুণাহ না করিবার ওয়াদা করিতেছি। সাপ্তাহিক হালকায়ে জিকির ও তা'লীমে যে কোন এস্তেগফার পড়া যাইবে। তবে ৫বার নিম্নলিখিত এস্তেগফার পড়িবেন, যেহেতু আমাদের আকাবিরে দ্বীন নিম্নলিখিত এস্তেগফার পড়িতেন সেহেতু আমরাও এই এস্তেগফার পড়ি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِا للّٰهِ الْعَلِى الْعَظِيْمِ-

(আস্তাগফিরুল্ল-হাল্লাজি লা-ইলা-হা ইল্লা-হু-ওয়াল হাই-ইয়্যুল ক্বাই-ইয়্যু-ম ওয়া আতু-বু ইলাইহি লা-হাওলা ওয়ালা-কু-ওয়া-তা ইল্লা-বিল্লা-হিল আলিয়্যিল আযী-ম)

তারপর سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহা-নাল্ল-হ) ১০০ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহাম্দু লিল্লা-হ) ১০০ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্ল-হু আকবার) ১০০ বার পড়িবেন এবং খেয়াল করিবেন দুনিয়ায় যাহাকে ডাকি সে-ই ডাকের জবাব দেয়, আমিও মা'বূদকে সুবহা-নাল্ল-হ, আলহাম্দুলিল্লা-হ, আল্ল-হু আকবার বলিয়া ডাকিতেছি, মা'বূদ আমার ডাকের জবাব নিশ্চয়ই দিতেছেন যে, "বান্দা বোলাও ক্যা", এক্বিন করিবেন, মাওলারে যতবার ডাকি ততবার মা'বূদ জবাব দেন। পরে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) ৫০০ বার, বিশেষ ঠেকা বশত: কমপক্ষে ২০০ বার জিকির

https://kitabbhubon.com

করিবেন। লা বলার সময় মাথা ডান কাঁধের দিকে ঘুরাবেন, ইল্লাল্লাহ বলার সময় বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে ক্বলবে ধাক্কা লাগাবেন এবং দিলে দিলে খেয়াল করিবেন, আল্ল-হ বাদে কেহ মা'বূদ নাই। এর পরে ৫ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া মোনাজাত করিবেন। পুরুষগণ মধ্যম আওয়াজে জিকির করিবেন যেন অন্যের কথা কানে না আসে এবং স্ত্রীলোকগণ চুপে চুপে জিকির করিবেন, যেন নিজ কানে শুনেন। মোনাজাতে বাবা-মা, পীর-ওস্তাদ, ওলীআল্ল-হ ও বুজুর্গানেদ্বীনদের রূহের মাগফেরাতের জন্য, নিজের জন্য ও নিজের আহাল-পরিবারের জন্য দোয়া করিবেন। চেষ্টা করিবেন চোখে পানি আসে কিনা। চোখে পানি আসিলে বুঝিবেন, এই ছবকের তাছীর আল্ল-হ পাক দান করিয়াছেন। তখন জোড়া কার্ডে পত্র লিখিয়া অথবা সাক্ষাৎ করিয়া উপরের ছবক নিবেন।

ইহা ছাড়াও সকল মুরীদানের প্রতি আমার নির্দেশ :

(ক) সকাল-সন্ধ্যায় জিকির করা। (যার যার ছবক আদায় করা)

(খ) দৈনিক মাওয়ায়েযে কারীমিয়া, মুজাহিদ প্রকাশনীর, বাবাজানের লিখিত ২৭ খানা কিতাব ও অন্যান্য বুযুর্গানেদ্বীনের কিতাবসমূহ হইতে কিছু কিছু পাঠ করা, পাঠ করিতে না পারিলে অন্যের দ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করা।

(গ) সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন হালকায়ে জিকির ও তা'লীমে শরীক থাকা।

(ঘ) মাসিক ইজতিমা ও শবগুজারে শরীক থাকা।

(ঙ) চরমোনাইর বাৎসরিক মাহ্ফিলে (১২, ১৩ ও ১৪ অগ্রহায়ণ এবং ১২, ১৩ ও ১৪ ফাল্গুন) হাজির থাকা। বিনা ওজরে কামাই না দেওয়া।

(ছৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম)
পীর ছাহেব, চরমোনাই, বরিশাল

https://kitabbhubon.com

রূহের শান্তির জন্য পড়ুন ঃ

মুজাহিদ প্রকাশনীর প্রকাশিত কিতাব সমূহ

- কলকাতা টাইপের বড় কুরআন শরীফ
- হাফেজী কুরআন শরীফ
- কলকাতা টাইপের ডিডি কুরআন শরীফ এমপি/১৩
- মাওয়ায়েযে কারীমিয়া ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড
- পরজগতের ভয়াবহতা
- অসতী নারীর দূর্গতী
- সীরাতুল আউলিয়া বা আউলিয়া চরিত
- আকাবির জীবনের জিবন্ত নমুনা
- তাযকিরাতুল আওলিয়া ১ম ও ২য় খণ্ড
- মাসায়েলে আদাবুল মাসাজিদ
- জিকির সমস্যার সমাধান
- মসজিদে হালকায় জিকির
- ফাওয়ায়েদে হালকায় জিকির
- জিহাদ ও ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে
- ইমদাদুছছুলূক বা আত্মশুদ্ধির উপায়
- মাসনবীয়ে রূমীর ১০০ গল্প ১ম ও ২য় খন্ড
- গুলজারে সুন্নাত
- মাছায়েলে তাহারাতুন নিছা
- মাওলার পরিচয়
- মানুষ হওয়ার উপায়
- তা'আল্লুক মা'আল্লাহ
- ক্রোধ দমন
- আখেরাতের শান্তি
- চিশতিয়া ছাবেরীয়া তরিকার ২১ ছবক
- দাড়ি ও মোচের বিধান
- মানাযিলে আখেরাত
- জিহ্বার হেফাজত
- ছুরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফজীলত
- ইছলামে দারিদ্রতা
- ধুমপান বিষপান
- ওয়াজ ও বয়ানের নীতিমালা
- আলাউদ্দিন ছাবের (রঃ)-এর জীবনী
- রূহানী ফয়েজ
- ছোহবতে শায়েখ ও বায়আত
- নবীজির মন গলানো নছীহতমালা
- নেকীর ভান্ডার
- হায়াতে গাউছে আযম
- হায়াতে মুহাজেরে মক্কী
- নবীজির আমল ও ফাজায়েলে সুন্নাত
- আউলিয়া কাহিনী•
- মউতের মোরাকাবা
- হযরত পীর ছাহেব হুযুরের "অসিয়ত নামা"
- নামাজ শিক্ষা
- সঠিক পথের সন্ধানে
- তরীকার পাঁচ ঔষধের নীতিমালা
- মৃত্যু থেকে শিক্ষা
- রছূলুল্লাহ (ছঃ) এর মৌলিক ৪ কাজ
- লেবাছূর রছূল (সঃ)
- আউলিয়া কাহিনী
- সুন্নাতে রাসূল
- রূহানী অজিফা
- আখেরাতের মোরাকাবার ৫০টি ঘটনা
- তরবিয়াতুল মুজাহেদ্বীন
- কুয়েত সফর
- গুনাহে ছগীরা ও কবিরা
- গঠনতন্ত্র
- কবর আজাব গজল
- গজল হীরার খনি (পকেট)
- গজল শেষ বিদায়
- নামাজ রোজার স্থায়ী ক্যালেন্ডার

https://kitabbhubon.com

মুজাহিদ প্রকাশনী
আল-মদিনা প্লাজা (৩য় তলা)
৫/১/৩ সিমসন রোড
সদরঘাট, ঢাকা-১১০০

https://kitabbhubon.com